আচার্য জগদীশচন্দ্র

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মূল্য—আট টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

আচার্য জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

বৃক্ষ তার হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া নিজে হাতে লিখে না দেখালে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করতে সম্মত হলেন না। তাই তিনি গাছের হাতে কলম তুলে দিয়ে তাদের দিয়েই তাদের অন্তরের হর্ষ ও বিষাদ, শ্রান্তি ও অবসাদ, আকুঞ্চণ ও প্রসারণ, পেশীর উত্তেজনা ও হৃৎস্পন্দন, এলকোহল প্রয়োগে মত্ততা ও পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগে মৃত্যুর বিক্ষেপ সবই চোখের সামনে প্রমাণ করে দেখালেন। তখন ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর আবিষ্কার সমূহ মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র সমবেত বিদগ্ধ মণ্ডলীর সামনে একখণ্ড টিনকে বিষপ্রয়োগ করলেন। টিনের সঙ্গে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রের যোগ করে দিলেন। টিনের মৃত্যুযন্ত্রণা সেই যন্ত্রে আপনা আপনি লিপিবদ্ধ হতে লাগল।

তারপর একটা টবের ওপরের লতার দেহের সঙ্গে সেই যন্ত্র যোগ করে দিলেন। তারপর সেই গাছকে বিষ প্রয়োগ করলেন। গাছের মরণ যন্ত্রণা সেই যন্ত্রের প্লেটে লিপিবদ্ধ হতে লাগল।

তারপর জগদীশচন্দ্র একটা ব্যাঙকে ক্লোরোফর্ম্ দিয়ে অজ্ঞান করলেন। তার বুকে যে যন্ত্রণা হতে লাগল সেটাও সেই প্লেটে আপনি আপনি তার বুকের ভেতরের সেই তরঙ্গের দাগ পড়তে লাগল।

তিনটে কলই একসঙ্গে আপনি আপনি লিখে চলল।

শেষে তিনি সেই তিনটি বিভিন্ন লিপি সেই বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু কেউই সেই সাড়া লিপিগুলি চিনে বলতে পারলেন না যে কোন্‌টা টিনের, কোন্‌টা গাছের আর কোন্‌টা প্রাণীর মরণ যন্ত্রণার লিপি।

তখন জগদীশচন্দ্র আবার ওষুধ প্রয়োগ করে সেই তিনটি জীবনই ফিরিয়ে এনে সুস্থ করে তুললেন।

সমস্ত বিজ্ঞান জগৎ এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখের সামনে দেখে স্তম্ভিত হল।

বেতারযন্ত্রে মার্কনীর তারহীন সংবাদ প্রেরণ জগদীশচন্দ্রেরই আবিষ্কার। মার্কনীর পেটেণ্ট গ্রহণের ১২ বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র ইহা আবিষ্কার করেন।

কিন্তু তিনি তাঁর কোন আবিষ্কারকে পেটেণ্ট করে নিয়ে অর্থোপার্জন করাকে ঘৃণা করতেন।

জগদীশচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে বিরল। ভারতের সৌভাগ্য যে তাঁর মত বৈজ্ঞানিক ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। বিশেষ করে আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্ররা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না। তাই দেশবাসী জগদীশচন্দ্রের জীবনী পাঠ করে তাঁর মত মনীষীকে আবার স্মরণ করবেন সেই উদ্দেশ্যে "আচার্য জগদীশচন্দ্র" প্রকাশিত হল।

এই পুস্তক প্রণয়নে বহু স্থান থেকেই জগদীশচন্দ্রের জীবনের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাঁদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞার সীমা নেই।

এই পুস্তকখানি যদি মনীষী জগদীশচন্দ্রের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করতে সাহায্য করে তবেই এই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
জন্ম ও পরিবেশ	...	...	১
ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্র	...	...	২
হাকিমের ডাকাত চাকর	...	...	৫
জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যতের সূচনা	...	...	৮
বর্ধমানে জগদীশচন্দ্র	...	...	১০
বর্ধমানে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি শিক্ষা	...	...	১২
কলকাতায় জগদীশচন্দ্র	...	...	১৩
পিতার নিকট শিক্ষা	...	...	১৪
জগদীশচন্দ্রের পশুপ্রীতি	...	...	১৬
জগদীশচন্দ্রের যাত্রার উপর অনুরাগ	...	...	১৮
সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে জগদীশচন্দ্র	..	...	২১
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে	...	...	২৩
আসামে জগদীশচন্দ্র	...	...	২৫
জগদীশচন্দ্রের কালাজ্বর	...	...	২৭
লণ্ডন মেডিক্যাল কলেজে	...	...	২৭
কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্র	..	...	২৮
ভারতে প্রত্যাবর্তন	...	...	৩৩
পিতৃঋণ পরিশোধ	...	...	৩৭
প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্র	. .	...	৩৮
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ	...	...	৪৪
দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক	...	...	৪৫
মৌলিক গবেষণা	...	...	৪৮
অবলা দেবী	...	...	৫৩
বিনা তারে খবর পাঠান	...	...	৫৪
জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র আবিষ্কার	...	...	৬৫
জড় ও জীব	...	...	৬৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
জগদীশচন্দ্রের সহিত বাংলা গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার		…	৭৩
প্যারিসে জগদীশচন্দ্র	…	…	৭৪
লণ্ডনে জগদীশচন্দ্র	…	…	৭৬
রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে বক্তৃতা	…	…	৭৭
ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ গ্রহণের অনুরোধ		…	৮০
বৈজ্ঞানিকের নীচতা	…	…	৮৩
পুস্তক রচনা	…	…	৮৫
উদ্ভিদের জীবন	…	…	৮৮
ফরিদপুরে খেজুর গাছের ওঠানামা	…	…	৯২
কুমুদিনীর নিশিজাগরণ	…	…	৯৫
নির্বাক জীবন	…	…	৯৮
সাড়ার মাত্রা	…	…	৯৯
ইউরোপ যাত্রা	…	…	১০১
অক্সফোর্ডে বক্তৃতা	…	…	১০৪
রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে বক্তৃতা	…	…	১০৬
কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্র	…	…	১০৭
ভিয়েনা	…	…	১০৯
প্যারিসে জগদীশচন্দ্র	…	…	১১৬
ময়দাভেল পরীক্ষাগারে ক্রুক্‌স	…	…	১১৯
শারীরতত্ত্ববিদ্	…	…	১২০
ময়দাভেলে সাহিত্যিক সঙ্ঘ	…	…	১২১
মিঃ মাসিংহাম	…	…	১২২
জর্জ বার্নার্ড শ	…	…	১২৩
অধ্যাপক কার্ভেথ রীড	…	…	১২৩
ভারত সচিব লর্ড ক্রু	…	…	১২৪
আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র	…	…	১২৫
বোস্টনে জগদীশচন্দ্র	…	…	১৩২
ওয়াশিংটনে জগদীশচন্দ্র	…	…	১৩২
স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র	…	…	১৩৩

বিষয়			পৃষ্ঠা
চিকাগোয় জগদীশচন্দ্র	...	...	১৩৫
উনকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র	...	...	১৩৬
মিচিগান শহরে জগদীশচন্দ্র	...	...	১৩৬
ইলিনয় ও আয়োয়ায়	...	...	১৩৭
জাপানে জগদীশচন্দ্র	...	...	১৩৯
রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য বসুর সম্বর্ধনা		...	১৪৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আচার্যদেবের সম্বর্ধনা	...	...	১৪৯
চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ	...	...	১৫০
বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা	...	...	১৫১
জগদীশচন্দ্রের ইউরোপে সপ্তম অভিযান	...	...	১৬৫
বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর পত্র	...	...	১৬৭
বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দশম বার্ষিকী	...	...	১৬৮
ইউরোপে নবম অভিযান	...	...	১৬৯
দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য	...	...	১৭১
দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র	...	...	১৭৪
সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র	...	...	১৭৭
স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র	...	...	১৮০
আচার্যদেবের দেহাবসান	...	...	১৮৩
জগদীশচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলীর তালিকা	...	...	১৮৫

জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা

কুমুদিনীর নিশিজাগরণ	...	...	১৮৮
অদৃশ্য আলোক	...	...	১৯৪
বিজ্ঞানে সাহিত্য	...	...	১৯৮
বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী	..	...	২০৯
কচুরী পানা	...	...	২১৩
উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন	...	...	২২২
উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র	...	...	২২৯
কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য রচিত	...	...	২৩৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী	...	...	২৪১
Prof. Jagadis Chandra Bose in America by Dr. Sudhindranath Bose		...	২৫২
Dr. J. C. Bose at the Rammohan Library (The Modern Review)		...	২৬৩
বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ শ্রীঅবলা বসু	...	...	২৬৭
অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	...	২৭১
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার শ্রীজগদানন্দ রায়	..	...	২৮২
অব্যক্ত ও ব্যক্ত শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	...	২৯৬

আচার্য জগদীশচন্দ্র

জন্ম ও পরিবেশ

বীজের ভেতর লুকিয়ে থাকে কোরক। আলো তাকে ডাক দিয়ে বলে 'এসো'। বাতাস তার কানে কানে তার স্নেহের আহ্বান জানায়। বারিকণা তার মধুর স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তোলে। শিশুমন সে প্রলোভন রোধ করতে পারে না। সে চুপি চুপি বাইরে এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীর আঙিনায়। পৃথিবীর আলোয় সে চোখ মেলে চায়। এই হল বৃক্ষের জন্মকথা। তার জন্মরহস্য। শুধু বৃক্ষের কেন ? মানুষেরও সেই একই জন্মরহস্য।

তেমনি শিশুর ভেতর লুকিয়ে থাকে মানুষের পিতা। সেই শিশু কোন্ অবস্থার ভেতর মানুষ হয়, কার সংস্পর্শে আসে, কেমন সেই লোকের শিক্ষাদীক্ষা, কেমন তার মতিবুদ্ধি, কেমন তার প্রকৃতি—এই আদর্শ পরিবেশই শিশুকে পথ দেখিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মঙ্গলময় পরিবেশে, শিক্ষার মহান আদর্শে, সত্যের পবিত্র পথে যে জীবন উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয় সেই জীবনই পরে সার্থক হয়ে ওঠে।

মহৎ জীবন কি ? যৌবনের চিন্তা বার্ধক্যে রূপায়িত হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের মহান আদর্শ যে পিতা, মাতা বা পিতৃপুরুষের মধ্যে প্রতিবিম্বিত সেই আদর্শই শিশু গ্রহণ করে। সেই পরিবেশই শিশুকে কর্মে মহান, প্রতিভায় দীপ্ত, ত্যাগে মহীয়ান ও দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ, উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে।

শিশুর চিন্তাধারা, তার কার্যকলাপ, তার প্রবৃত্তি থেকেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গ আজ আমাদের বিদেশ। আজ থেকে একশ বছর আগেকার কথা। তখন এমন দিন ছিল না। পূর্ববঙ্গ ছিল আমাদের মাতৃভূমি। সেই পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা। যে ঢাকা মোগল যুগে বাংলার রাজধানী ছিল। সায়েস্তা খাঁর রাজধানী ছিল ঢাকা। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্মানের রাজধানীও ছিল ঢাকায়। তারপর মুর্শিদ কুলি রাজধানী নিয়ে এলেন মুর্শিদাবাদে। তখন ঢাকা হারাল তার পূর্ব গৌরব। তার প্রাচীন মহিমা।

সেই ঢাকার মধ্যে বিক্রমপুর। এক বিরাট পরগনা। উর্বর, শস্যশালী, নদীবহুল দেশ। মুসলমান-প্রধান। কিন্তু প্রাচীনকালে এখানে ছিল হিন্দুর ঐতিহ্য।

প্রাচীনকালে বিক্রমপুরের বিদ্যাকেন্দ্র বলে একটা খ্যাতি ছিল। এখানে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার টোল। শোনা যায় এখানে ছিল নাকি একটা মানমন্দির— নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ ও গণনার কেন্দ্র। বিক্রমপুর ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শের কেন্দ্র। এই বিক্রমপুরে সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মেছিলেন জ্ঞান ও ধর্মের মূর্তিমান প্রতীক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ—বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই যাঁর স্মরণীয় নাম।

এই বিক্রমপুরে রাঢ়ীখাল নামে এক গ্রাম। এই গ্রাম ঢাকা থেকে ৩৫ মাইল দূর। এই গ্রামে বাংলার মনীষী আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমন্দিরের একজন একনিষ্ঠ ভক্তসাধক। দেশপ্রেমের একজন শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক।

বিক্রমপুরের নিকটে ফরিদপুর। এই ফরিদপুর ছিল জগদীশচন্দ্রের শৈশবের লীলাভূমি। তাঁর পিতার কর্মস্থল। বনজঙ্গলে ভরা এই দেশ। এখানেই উপ্ত হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অঙ্কুর।

খাল, বিল আর নদীর দেশ এই ঢাকা আর ফরিদপুর। এখানে নৌকাই একমাত্র যানবাহন।

এখানে খাল আর নদী-ভরা মাছ। এই মাছের ব্যবসায়ই হল বহু ধীবরের উপজীবিকা।

এই মৎস্যবহুল স্থানে মাছই এখানকার অন্যতম প্রধান খাদ্য। একশ বছর আগে এখানকার বহু লোক ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল। এখানকার লোক নৌকা বাইত, মাছ ধরত অথবা ডাকাতি করত।

ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু এই ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সুতরাং এখানকার অশান্ত অধিবাসীদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের শৈশব কেটেছে। ভগবানচন্দ্রও এই ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

একদিন ভগবানচন্দ্র তাঁর বাড়ির কাছে একটি ডাকাতির কথা শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতির পিঠে চড়ে, থানায় যে কজন পুলিশ কনেস্টবল ছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতির স্থানে গিয়ে পড়লেন। ডাকাতরা এই রকম আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের কথা ভাবতেও পারে নি।

ডাকাতদের ওপর অকস্মাৎ এই আক্রমণের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হাতির পিঠ থেকে নেমে ডাকাতদলের সর্দারকে নিজ হাতে বন্দী করলেন। তারপর তাদের বিচারের জন্য নিয়ে গেলেন।

ডাকাতদের ওপর এইরকম আক্রমণে তারাও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। ভগবানচন্দ্র একবার এইরকম একদল ডাকাতকে বিচারে জেলে পাঠিয়েছেন।

তারা তো জেলে গেল। কিন্তু যাবার সময় শাসিয়ে গেল—আমরা ফিরে আসি, তারপর এর শোধ তুলব।

তিন-চার বৎসর কেটে গেল। তারা জেল থেকে ফিরে এসে তাদের কথা রেখেছিল।

একদিন গভীর রাত্রে ভগবানচন্দ্রের বাংলোর চালার তিন-চার কোণে একসঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। একটু দূরে খড়ের চালাও বাদ গেল না।

ফটাফট শব্দে বাঁশ ফাটতে লাগল। চারিদিক ধোঁয়ায় ভর্তি। ভগবানচন্দ্র হঠাৎ ঘুম ভেঙে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পরিবারবর্গের সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কোন জিনিসপত্তর উদ্ধার করতে পারা গেল না।

খুব নিকটের প্রতিবেশীরা—তাদের অধিকাংশই মুসলমান—সাহায্য করতে ছুটে এল। তাদের একজন জলন্ত আগুন আর ধোঁয়ার ভেতর দেখল একটা মূর্তি। তার মনে হল এটা বুঝি কোন ঠাকুরের মূর্তি। ভগবানচন্দ্রের কাছে সে ছুটে এসে বলল—আপনাদের বোধ হয় কোন ঠাকুরের মূর্তি এখনও উদ্ধার করা যায়। কিন্তু আমরা তো ছোঁব না।

ঠাকুরের মূর্তি? বল কি? আমাদের তো কোন ঠাকুর নেই। চলো তো দেখি!

ভগবানচন্দ্র গিয়ে দেখেন তাঁর তিন বছরের মেয়ে। তাকে তাঁরা গোলমালের ভেতর লক্ষ্য রাখেন নি। সে বিছানার ওপর বসে আছে। আগুনের লাল আভার দিকে সে কৌতূহলবশে তাকিয়ে আছে।

ভগবানচন্দ্র ছুটে গিয়ে কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তার এক মুহূর্ত পরেই চালা ভেঙে পড়ল।

কোন জিনিস উদ্ধার করা গেল না। সব পুড়ে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত হল। পরদিন লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল তার ভেতর গয়না, টাকা, সোনা, রুপো, তামা সব—গলে একটা তালে পরিণত হয়েছে।

বাইরের চালায় ঘোড়া-গোরুগুলোও পুড়ে মারা গিয়েছে।

তাঁরা তো নিরাশ্রয় হলেন। একজন প্রতিবেশী তাঁর বাড়ির একটা অংশ তাঁদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। কেউ দিলেন কাপড়চোপড়। কেউ দিলেন বাসনকোসন।

এইরকমে পরের ওপর নির্ভর করে তাঁদের একমাস কাটল। তারপর তাঁদের নিজের বাড়ি তৈরি হল। এইবার আর চালা নয়। একেবারে পাকা বাড়ী।

এই সময় জগদীশচন্দ্রের বয়স চার-পাঁচ বৎসর।

*   *   *   *

আর এক বৎসর পরের ঘটনা। জগদীশচন্দ্রের তখন বয়স ছ বৎসর।

ফরিদপুরে একটা মেলা বসেছে।

পুলিশদের ভেতর কুস্তির লড়াই হচ্ছে।

পুলিশরা সকলেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোক। বিরাট তাদের চেহারা। যেমন লম্বা তেমনি জোয়ান। তারা সকলেই অভ্যস্ত কুস্তিগীর।

দুজনে কুস্তির লড়াই আরম্ভ হল। সকলেই অধীর আগ্রহে দেখতে লাগল। একজন পুলিশের জয় হল।

দর্শকদের ভেতর ছিল একজন গ্রাম্য কৃষক। সে বলল, যে জিতেছে আমাকে যদি তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে দেয়, আমি রাজী আছি।

তার কথা শুনে ভগবানচন্দ্র সেই জয়ী কুস্তিগীরের সঙ্গে কৃষককে লড়তে দিতে রাজী হলেন।

কুস্তির লড়াই আরম্ভ হল।

যে দর্শক জয়ী হবার গর্ব করেছিল তারই জয় হল।

আর যে পুলিশ এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করল, সে অগণিত দর্শকদের সামনে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সেই পুলিশ তার সহযোগীর গলায় দুই পা দিয়ে ভীষণ চাপ দিতে লাগল। এই অন্যায় ও বে-আইনী চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

সব দর্শক এই অ-খেলোয়াড়-সূচক মনোভাবের প্রতিবাদ করতে লাগল। কিন্তু সেই পরাজিত পুলিশ কারও কথা গ্রাহ্যও করল না। ভগবানচন্দ্রের কথাও শুনল না। অবশেষে ভগবানচন্দ্র সেই পুলিশের পায়ে আঘাত করে

পিতা ভগবানচন্দ্র

জননী বামাসুন্দরী দেবী

তাকে পা ছাড়তে বাধ্য করলেন। তখন সেই নিরীহ দর্শক, যে জয়ী হয়েছে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে অর্ধমৃত অবস্থা।

সন্ধ্যাবেলা মেলায় যাত্রা হবে। ভগবানচন্দ্র সন্ধ্যায় যাত্রার আসরে আসবেন। সেই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ পুলিশ প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে অন্ধকারে রাস্তার মোড়ের এক কোণে ভগবানচন্দ্রকে হত্যা করবার মতলবে ওঁত পেতে লুকিয়ে রইল। কিন্তু তার মতলব সফল হল না। কারণ ঘটনাচক্রে ভগবানচন্দ্র সে পথে গেলেন না।

কিন্তু প্রতিশোধ নেবার মতলবে যে বিরাট সামিয়ানার মধ্যে যাত্রা হবার কথা, সেখানে গিয়ে সে ছুতো করে গোলমাল ও মারামারির সৃষ্টি করল। অপর পুলিশরাও তাদের সঙ্গীর অপমানে অপদস্থ বোধ করেছিল। তারাও এই গোলমাল সৃষ্টিতে যোগ দিল।

ভগবানচন্দ্র গণ্ডগোল শুনে সেখানে এসে পুলিশদের বিনা প্ররোচনায় এই কীর্তি দেখে তাদের মনের মতলব সব বুঝতে পারলেন।

তিনি সব পুলিশকে তাদের হাতের লাঠি তাঁর কাছে জমা দিতে বললেন। আর নিজেও একগাছা লাঠি নিলেন।

সেই ক্রুদ্ধ ও পরাজিত পুলিশ হাতের লাঠি ফেলবে না। ভগবানচন্দ্র তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিলেন। সেটা লাঠি নয়। সেটা গুপ্তি। লাঠি কাড়তে গিয়ে তার ভেতর থেকে একখানা তরোয়াল বেরিয়ে পড়ল।

তখন সকলের সামনে তার ভগবানচন্দ্রকে হত্যা করার মতলব ধরা পড়ে গেল।

ভগবানচন্দ্রের পায়ে পড়ে সেই পুলিশ তখন নিজের অসৎ মতলবের কথা স্বীকার করল। ভগানচন্দ্র ছিলেন মহৎ। তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে ক্ষমা করলেন।

হাকিমের ডাকাত চাকর

আর-এক দিনের ঘটনা।

একটা দুর্ধর্ষ ও বিখ্যাত ডাকাত। ডাকাতি করে ধরা পড়েছে। ডাকাতিতে তার যোগাযোগ প্রমাণ হয়ে গেল।

ভগবানচন্দ্র তাকে কঠোর সাজা দিলেন।

ডাকাত জেল খেটে বেরিয়ে এল। তারপর সে নিজের গ্রামে গিয়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করল। জেল-খাটা আসামী। তার উপর দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত। কে তাকে কাজ দেবে?

কেউ তার সঙ্গে মিশতেও চায় না। তার সম্পর্কেও আসতে চায় না। সুতরাং হয় উপবাস আর না হয় আবার ডাকাতি—এ ছাড়া তার আর কোন উপায় রইল না।

সে ঠিক করল—যিনি তাকে জেলে দিয়ে তার এই দুরবস্থা করেছেন তাঁর কাছে গিয়ে অবস্থা জানাই। দেখি তিনি কি বলেন।

ডাকাত সেই হাকিমের কাছে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তার অবস্থার কথা জানাল। বলল, আমি এখন কি করব বলুন।

হাকিম ভগবানচন্দ্র ছিলেন করুণার অবতার। তিনি তাকে বললেন—আচ্ছা, তুমি আমার কাছে চাকরি কর। আমার এই ছেলেকে রোজ স্কুলে নিয়ে যাবে। আবার ছুটি হলে বাড়ি নিয়ে আসবে।

সেইদিন থেকেই ডাকাত চাকরিতে বহাল হল।

পরদিন থেকেই বালক জগদীশচন্দ্র ডাকাতের কাঁধে চড়ে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন।

ডাকাতের গায়ে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। তার কাঁধে বসে বালক জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন—তোমার গায়ে এসব দাগ কেন?

ডাকাত বলে—জান দাদাবাবু, আমি আগে ডাকাতি করতাম। আমার একটা ডাকাতের দল ছিল। আমি ছিলাম তাদের সর্দার।

একদিন গভীর রাতে এক গ্রামে দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছি। এক বাড়িতে ডাকাতি করছি—আমার লোকজন সব লুটপাট করছে। বাড়ির লোক 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার করতে লাগল। সেই শব্দ শুনে গ্রামের লোকজন সব সেখানে ছুটে এল। আমার লোকজনও লুটপাটের মাল নিয়ে সরে পড়ল। তারা যাতে পালাতে সময় পায়—কেউ ধরা না পড়ে—সেইজন্য আমি একলা গ্রামের লোকের সঙ্গে লড়তে লাগলাম। সেই লড়াইয়ে একজন লোক আমাকে একটা বর্শা ছুঁড়ে মারল। ঝর ঝর করে আমার গা থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। তখন আমি সেখান থেকে পালালাম।

জান দাদাবাবু, এই ঘায়ে আমি দু'মাস শুয়ে ছিলাম।

এই রকম করে প্রতিদিন চলতে লাগল এক-একটা আঘাতের ইতিহাসের কাহিনী। বালক জগদীশচন্দ্র অবাক হয়ে শুনতেন। লোকেরা বই পড়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী জানে। আর বালক এখানে প্রতিদিন ডাকাতের নিজের মুখে শোনেন এক-একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত কাহিনী। কোন ছেলেভোলানো কাল্পনিক কাহিনী নয়। নিজের জীবনে ঘটা প্রত্যক্ষ বিবরণ।

তার পরদিন আর-এক কাহিনী। ডাকাতের দল হঠাৎ জ্বলন্ত মশাল নিয়ে গ্রামে ঢুকে 'হা রে রে রে' বলে কি চিৎকার! তারা সকলকে ভয় দেখিয়ে ডাকাতি করতে লাগল। গ্রামের লোকও তৈরি থাকত। ডাকাতরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকত। ঘরে ঢুকে এক দল লুটপাট করত। আর-এক দল পাহারা দিত। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে তাদের বাধত লড়াই। সেই লড়াইয়ে কখনও কখনও দুই-একজন খুনজখমও হত। কখনও বা গ্রামবাসী খুন হত, কখনও বা তাদের দলের লোকও খুন হত।

এই রকম করে বালকের সঙ্গে চাকরের দিন দিন অন্তরঙ্গতা বেড়ে চলে।

* * * *

ভগবানচন্দ্রের অন্তরে দরিদ্রের প্রতি ছিল গভীর সমবেদনা।

ফরিদপুরে একটি মাত্র জেলা স্কুল। আর কোন বিদ্যালয় তখন ছিল না। সেই জেলা স্কুলে নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা। তার বেশি ছাত্র ভর্তি হবার স্থান নেই। স্থানীয় অপর ছেলেদের শিক্ষা বন্ধ হবার উপক্রম। সুতরাং দেশের সাধারণ লোক দেশে তাদের জন্য একটা বাংলা বিদ্যালয় খুলবার জন্য ভগবানচন্দ্রকে ধরল।

ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে একটা বাংলা বিদ্যালয় খুললেন।

জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী জীব-জন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।"

মুসলমান চাপরাসীর ছেলে ও জেলেদের ছেলের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে লেখাপড়া* শিখতে লাগলেন। কৃষক, জেলে, বাগ্দীর ছেলেরাই ছিল তাঁর পড়ার সঙ্গী। তাঁর খেলার সাথী। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে হয়েও তিনি

তাদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশুনো করেছেন। খেলাধুলো করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্যবোধ করতে শেখেন নি। দীনহীনতার গ্লানিকর ভাব কোন দিন তাঁর মনে জন্মায় নি।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন ধনীর দুলাল। তাঁর সঙ্গীরা ছিল দরিদ্র। তারা ছিল জগদীশচন্দ্রের খেলার সাথী। বিদ্যালয়ের ছুটির পর তাঁর সাথীদের নিয়ে তিনি বাড়ি যেতেন। পথে তাদের সঙ্গে কত মাছ ধরার গল্প করতেন। যে পরিবেশে তারা মানুষ সেইসব কথা জগদীশচন্দ্র তাদের কাছে শুনতেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। সাথীদের সঙ্গে বাড়ি গেলে তাঁর মা তাঁর সঙ্গে তার সাথীদেরও খাবার দিতেন। তাঁরা একসঙ্গে খেতেন। তাঁর মা বাপ অভিজাত ঘরের লোক হয়েও তাঁদের ছেলের খেলার বা পড়ার সঙ্গীদের, জেলে বাগদীদের, হিন্দু মুসলমানের ছেলেদের কোন পার্থক্য করতে শেখান নি। এই সাহচর্যের ফলে বালক জগদীশচন্দ্রের পরিবেশের মধ্যে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নি। পরিণত বয়সেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য তাঁর মনে কোন দিন উদয় হয় নি।

জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যতের সূচনা

বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথের ধারে গাছপালা। বন জঙ্গল।

জগদীশচন্দ্র যখন সহপাঠীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতেন তখন একদিন তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে গাছের 'ম্যাজিক' দেখাল।

পথের ধারে লজ্জাবতী লতার বন। এক সহপাঠী একদিন একটা লজ্জাবতী লতাকে ছুঁয়ে দিল। দেখতে দেখতে গাছের পাতা কুঁকড়ে গেল। সব পাতা নুয়ে পড়ল। গাছ যেন সত্যি সত্যি পরের ছোঁয়া পেয়ে লজ্জায় মরেই গেল।

এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। কই, আর কোন গাছ তো ছুঁলে নুয়ে পড়ে না। বালক জগদীশচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন। বাড়ি গিয়ে পিতার কাছে গাছের লজ্জায় মরে যাওয়ার কথাটা বললেন।

তার পরদিনই বিদ্যালয়ে যাবার সময় বালক সেই গাছটি দেখলেন। সেটা আবার বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। গাছের পাতা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। যেন কত স্ফূর্তি। আগের দিনের ঘটনার কথা যেন তার আর মনেই নেই।

সেদিনও তিনি সেইরকম আবার একটা লজ্জাবতী লতার পাতা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। গাছের পাতা মরার মতো আবার ডালসুদ্ধ নুয়ে পড়ল।

স্পর্শকাতর এই গাছ নিয়ে এই খেলা দিনের পর দিন চলতে লাগল। এই খেলা বালক জগদীশচন্দ্রের মনে একটা দোলা দিল। একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করল। তখন তিনি বালক। সেদিন তিনি এর কোন কারণ বুঝে উঠতে পারেন নি। বড় হয়ে তিনি এর কার্যকারণ বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বাল্যের সে কৌতূহল তাঁর মনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল।

জগদীশচন্দ্র বাহনের কাঁধে এক বছর বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করলেন। তারপর তাঁর পিতা তাঁকে একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন। এই টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ তাঁর বাহনের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। বাহনের পরিবর্তন হল। তবে পূর্বের বাহনও সঙ্গী হিসেবে বজায় থাকল। সে চার-পাঁচ বছর ভগবানচন্দ্রের কাছে ছিল। আর সে যতদিন ছিল অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী হয়েই কাজ করেছে। একবার সে সমস্ত পরিবারবর্গকে একটা ভীষণ বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

একবার ভগবানচন্দ্র সমস্ত পরিবারবর্গ নিয়ে নৌকো করে তাঁর নিজের গ্রাম রাঢ়ীখালে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ দিন তাঁদের নৌকোয় কাটাতে হবে। পথে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

কয়েকদিন নৌকাপথে ভগবানচন্দ্র পরিবারবর্গসমেত বেশ আনন্দেই চলতে লাগলেন। একদিন একখানা সন্দেহজনক নৌকো হঠাৎ একটা খালের ভেতর থেকে বেরিয়ে তাঁদের নৌকোর দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে লাগল। তাতে অনেক মাঝিমাল্লা। স্পষ্ট বোঝা গেল সেখানা ডাকাতের নৌকো। তাঁদের পেছনে ধাওয়া করেছে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে বলে মনে হল না।

নৌকোয় ভগবানচন্দ্রের পোষা ডাকাতও তাঁর সঙ্গে দেশে চলেছে। সে পেছনের নৌকো দেখেই অবস্থাটা বুঝতে পারল।

সে তৎক্ষণাৎ নৌকোর ছাদের ওপর লাফিয়ে উঠল। তাকে যাতে পেছনের নৌকোর লোকেরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পায় সেইভাবে সে নৌকোর ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সে একটা বেশ অর্থবোধক লম্বা শিস দিল। সেই শিস হল ডাকাতদের একটা ইঙ্গিত।

নৌকোর ডাকাতরা এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তাদের নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। এ যাত্রা তার জন্যই ভগবানচন্দ্রের পরিবারের সকলের ধন প্রাণ রক্ষা পেল।

পোষা ডাকাত ভগবানচন্দ্রের কাছে পাঁচ-ছ বৎসর ছিল। তারপর ভগবানচন্দ্র যখন চাকরিতে উন্নতি করে বর্ধমানে বদলী হলেন তখন সে বাধ্য হয়ে তার গ্রামে ফিরে গেল।

এখন সে আর জেল-খাটা আসামী নয়। এখন সে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির পুরানো ও বিশ্বাসী চাকর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পুরানো বিশ্বাসী চাকর শুনলে কে তার সম্বন্ধে আর খোঁজ-খবর নিতে যাবে? তার মনিব বদলী হয়ে গেলেন। সুতরাং সে তাঁর কাছ থেকে বাধ্য হয়ে চলে এল।

ভগবানচন্দ্র জেল-খাটা ডাকাতকে বিশ্বাস করে বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন। এর থেকে তাঁর মনের উদারতার কথা বুঝতে পারা যায়। শুধু তাই নয়। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি যেখানেই বদলী হয়ে যেতেন সেখানেই একটা মেলার ব্যবস্থা করতেন। সেই মেলায় কৃষকদের উৎসাহ দেবার জন্য সেই জেলায় উৎপন্ন ফলমূল, তরিতরকারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকত। আর থাকত সেই জেলায় উৎপন্ন কোন শিল্পদ্রব্য। মেলায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হত। যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা প্রভৃতি আমোদ ও লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকত।

একবার এই রকম এক মেলায় ভগবানচন্দ্র এক অপূর্ব যাত্রার দল আনিয়ে ছিলেন। এই যাত্রা অভিনয় দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। বসু পবিবারের সকলেরও এই অভিনয় এত অপূর্ব লেগেছিল যে অনেক দিন এই যাত্রা-অভিনয়ের স্মৃতি তাঁদের মনে স্মরণীয় হয়ে ছিল।

দর্শকের মধ্যে সেদিন জেলার প্রধান ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই অভিনয়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর নিকটে যা অর্থ ছিল তিনি তা যাত্রাওয়ালাদের পকেট উপুড় করে তো দিলেনই, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি আরও অর্থ আনতে বাড়ী ছুটলেন। বাড়ি থেকে টাকা এনে দিয়ে তবে তিনি তৃপ্ত হলেন।

বর্ধমানে জগদীশচন্দ্র

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্রের বয়স দশ বৎসর। এই সময় জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদ পেয়ে ফরিদপুর থেকে বর্ধমানে বদলি হয়ে এলেন। এখানে ভগবানচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন।

প্রথম প্রথম এখানে ভগবানচন্দ্রের চাকরি খুব পরিশ্রমসাধ্য ছিল না বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল।

তখন বর্ধমান খুব স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলকাতা থেকে যারা কয়েক দিনের জন্য বর্ধমান যেতেন তাঁরা বর্ধমানের স্বাস্থ্যের খুব প্রশংসা করতেন। এখানে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধও ছিল না।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বর্ধমান বিদ্ধস্ত হয়ে উঠল। বাংলার ইতিহাসে এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি আর বড় দেখা যায় নি। হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ল। কত পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হল। তাদের কিশোর ও শিশু পুত্রেরা অসহায় হয়ে পড়ল। তাদের এই দুঃখদুর্দশা ভগবানচন্দ্রের অন্তরকে ব্যথিত করে তুলল।

এই সাংঘাতিক অবস্থার ভার নিলেন অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনার ভগবানচন্দ্র। রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের অসহায় পোষ্যদের ভার নেওয়া, নিরাশ্রয়দের সাহায্য দেওয়া প্রভৃতি কাজে ভগবানচন্দ্র আত্মনিয়োগ করলেন।

তিনি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরনির্ভরশীল হয়ে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে না। কোন কাজ পেলে তারা উপার্জনক্ষম হয়। যাতে কিশোর বালকেরা কোন শিল্পকাজ শিখে উপার্জনক্ষম হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তিনি তারই জন্য কুটীরশিল্পের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তারই জন্য তিনি একটা বাড়ির অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু কোথাও বাড়ি পাওয়া গেল না। কিন্তু অদম্য উৎসাহী ভগবানচন্দ্র কোন কাজে নিরুৎসাহ হবার লোক ছিলেন না। তাঁর বাড়ি ছিল খুব বড়। আর তাতে খুব বিস্তৃত প্রাঙ্গনও ছিল। তিনি নিজের বাড়ির একটা অংশ ছেড়ে দিলেন। সেখানেই খুললেন ছুতোরের কাজ শিখবার একটা কারখানা। একটা তামা-পিতলের দ্রব্যাদি তৈরির কারখানাও খোলা হল। তার যন্ত্রপাতিও বসল। আর বসল একটা তাঁতবস্ত্রের কারখানা।

জগদীশচন্দ্র তখন বারো বছরের বালক। তাঁদেরই বাড়িতে তামা-পিতলের জিনিসপত্র তৈরির কারখানায় মিস্ত্রীদের কাছে বসে বালক জগদীশচন্দ্র একাগ্রচিত্তে তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করেন। কোন্ জিনিস কি করে যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হয় আগ্রহভরে দেখেন।

একদিন মার নিকট থেকে সংসারের পুরানো অকেজো কতকগুলি তামার বাসন চেয়ে নিয়ে এসে মিস্ত্রীকে দিয়ে তিনি একটা ছোট কামান তৈরি করালেন। কামান যখন তৈরি হল তখন বালক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যখন তখন বালক কামানটা সশব্দে ছুড়তে লাগলেন।

বর্ধমানে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি শিক্ষা

বর্ধমানে জগদীশচন্দ্র ছ বছর ছিলেন। তখন তিনি ১৫-১৬ বছরের বালক। যারা এইসব কুটীরশিল্পের কাজ শিখত তারাও ছিল তাঁর সমবয়সী। এই পাঁচ বছরে শিক্ষানবীশ ছেলেদের সঙ্গে তিনিও সমানভাবে এই তামা-পিতলের সূক্ষ্ম কারুকার্যে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এই শিক্ষা তাঁর নিষ্ফল হয় নি। এই পরিবেশ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে সফল করে তুলেছিল।

বাল্যকালের শিক্ষা যৌবনে রূপায়িত হয়।

ফরিদপুরে ছেলেদের কাছে জগদীশচন্দ্র শিখলেন লজ্জাবতী লতার রহস্যজনক লজ্জাশীলতা। দেখলেন ভূমি আমলা ও বনচাঁড়ালের প্রাণস্পন্দন। লজ্জাবতী লতা, বনচাঁড়াল, ভূমি আমলা প্রভৃতি লতাগুল্মের সঙ্গে তাঁর বাল্যের পরিচয় তাঁর জীবনের সাধনায় পরিণত হয়েছিল। মানুষের মতো, প্রাণীদের মত লতাগুল্মেরও যে প্রাণ আছে, তারাও যে আঘাতে ব্যথা অনুভব করে, অ্যালকোহল খাইয়ে দিলে তারাও যে মাতাল হয়ে ওঠে, ক্লোরোফরম্ দিলে তারা যে অচৈতন্য হয়ে যায়—এই বিভিন্ন অনুভূতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে ভবিষ্যতে জগদীশচন্দ্র সারা জগৎকে মুগ্ধ করেছেন।

আর তিনি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির দক্ষতা অর্জন করলেন বধমানে যন্ত্র-শিল্পীদের কাছে। এই শিল্পকৌশল শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে পরম সম্পদে পরিণত হয়েছিল। লতাগুল্মের প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি প্রমাণ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে দেশীয় মিস্ত্রীর সাহায্যে নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিজের হাতে তৈরি করেছেন। তাদের একটার নাম শোষণগ্রাফ। একটার নাম স্টেরিয়োস্কোপ। আরও বহু যন্ত্রপাতি তিনি তৈরি করেছিলেন। বিশ্বকর্মাও তো যন্ত্রী। আমরা তাঁরই হাতের যন্ত্র। স্বর্গের এই সেরা যন্ত্রীর হাতেই তো গোটা দুনিয়াটা তৈরি। এই ছেলেটির হাতের তৈরি যন্ত্র দেখে বিশ্বকর্মাও একদিন স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগবানচন্দ্র কাটোয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। পাঁচ বৎসরে পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভগবানচন্দ্রের বয়স তখন যৌবন অতিক্রম করেছে। তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন। অথচ এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য তিনি এই সময় অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। তাদের দুঃখ দেখে তাঁর কোমল প্রাণে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি স্থির থাকতে পারেন নি।

দুর্ভিক্ষ দূর করবার জন্য তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। দেশবাসী অন্নাভাবে অনাহারে রয়েছে। তাদের মুখে তিনি এক মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারছেন না। আর তিনি নিজে কোন লজ্জায় পেটভরে খাবেন? তাঁর মনুষ্যত্বে বাধত। তিনি সমস্ত দিন ঘোড়ায় চড়ে বহু দূর অতিক্রম করে জনসাধারণের সেবায় অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় তাঁর তাঁবুতে ফিরে এসে দুই-এক মুঠো ছাতু জলে গুলে খেয়ে কাটিয়েছেন।

দিনের পর দিন, এই অনাহার ও কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে দু বছর ছুটি নিতে বাধ্য হলেন।

কলকাতায় জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র এই সময় কলকাতায় থাকতেন।

ভগবানচন্দ্র ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকলেন বটে কিন্তু তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। সারা জীবন তিনি চাকরিতে যা সঞ্চয় করেছেন তাই দিয়ে তরাই অঞ্চলে বহু জমি কিনলেন। সেই জমি পরিষ্কার করে সেখানে চাষ করতে তাঁর প্রচুর অর্থব্যয় হল। সেখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। কিন্তু সেই জমি বাজার থেকে অনেক দূর। তার ওপর সেই স্থানটি হল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং সে ব্যবসায় লোকসান হয়ে গেল।

দেশবাসীর মধ্যে ভগবানচন্দ্রই প্রথম চায়ের বাগান করেন। সেই জমির চাষবাস সম্পর্কে ভগবানচন্দ্রকে তরাই অঞ্চলে যেতে হত। তিনি আসামে তরাই অঞ্চলে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে চায়ের চাষ আরম্ভ হচ্ছে। সেখানে চায়ের বাগান করবার ইচ্ছায় তিনি দু হাজার একর অর্থাৎ ছ হাজার বিঘা চায়ের বাগান করবার জমি সংগ্রহ করলেন। তাঁর সঞ্চিত সমুদয় অর্থ লোকসান হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এবার তাঁকে বেশী সুদে টাকা ধার করতে হল।

চা বাগান করলেই তখনই ত টাকা আসে না। চা-গাছ বড় হতে সময় লাগে। তারপর গাছের আগা থেকে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি সংগ্রহ করতে হয়। সেই পাতা থেকে চা প্রস্তুত হয়। তার পর ঝাড়া বাছা হলে ভাল, মাঝারি ও মন্দ তিন রকম চায়ের ভাগ করতে হয়। তারপর সেই চা বাইরে চালান যায়। সুতরাং টাকা পেতে দেরি হয়। কিন্তু ধার-করা টাকা তিনি শোধ দিতে তো পারছেনই না, বরং ঋণের টাকার সুদ বাড়ছে। সুতরাং ভগবানচন্দ্রের দুশ্চিন্তার আর অন্ত রইল না। বৎসরের পর বৎসর লোকসান, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এই চা বাগান ভবিষ্যতে লাভজনক হয়েছিল। কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

তাঁর অবর্তমানে একজন ম্যানেজার রাখা হয়েছিল। তারপর ভগবানচন্দ্রের দৌহিত্ররা এই বাগান দেখাশুনো করেছেন। তখন এই বাগান থেকে প্রচুর আয় হয়েছে।

ভগবানচন্দ্রের দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয় নি। তখন স্বদেশী যুগ। অনেক নেতা ভগবানচন্দ্রকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেমের সহায়তায় বোম্বাইয়ে একটা তাঁতের ব্যবসায় নামালেন। তাঁর যা শেষ সম্বল ছিল এই ব্যবসায় তিনি তাও দিলেন। তারপর ডিরেক্টররা সেই টাকা নিয়ে সরে পড়ল। ভগবানচন্দ্রের দেনার দায়ে সব বিক্রি হয়ে গেল।

ভগবানচন্দ্র কিন্তু এতেও নিরাশ হলেন না। তাঁর ছুটির দু বছর কেটে গেল। তিনি গিয়ে পাবনায় চাকরিতে যোগ দিলেন। তখন জগদীশচন্দ্রকে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের হস্টেলে থাকতে হল। পাবনা গিয়ে ভগবানচন্দ্র চার-পাঁচ বৎসর চাকরি করেন। তারপর সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

পিতার নিকট শিক্ষা

এইবার জগদীশচন্দ্রের বাল্যের শিক্ষার কথায় ফিরে আসা যাক। ভগবানচন্দ্র সব সময়েই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর সময়ও ছিল অল্প। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যখন তিনি বাড়ি ফিরতেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তা সত্ত্বেও তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার আর কারও ওপর দেন নি। নিজেই তাঁর পড়াশুনো দেখাশোনা করতেন।

বাড়ি ফিরে কিছু খেয়ে নিয়ে ভগবানচন্দ্র শুয়ে শুয়ে জগদীশচন্দ্রকে পড়াশুনো বলে দিতেন। বালক জগদীশচন্দ্রের ভেতর তিনি প্রতিভার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

সমস্ত দিনে বালক জগদীশচন্দ্র যা কিছু দেখেছেন, যে সমস্ত জিনিস জানবার জন্য তাঁর মনে কৌতূহল জেগেছে, যে সমস্ত প্রশ্ন তাঁর মনে উদয় হয়েছে, এই সময় তিনি পিতার কাছে সেই সব সমস্যার কথা প্রকাশ করে তার সমাধান করে নেবার চেষ্টা করতেন। ভগবানচন্দ্রকে যখন বালক জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করতেন, "বাবা, বনচাঁড়াল আর লজ্জাবতী গাছের পাতা ছুঁয়ে দিলে নুয়ে পড়ে। তাদের ডালপালা সব নিচু হয়ে পড়ে কিন্তু আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি গাছকে ছুঁয়ে দিলে কই সে সব গাছ তো নুয়ে পড়ে না। কেন?"

ভগবানচন্দ্র তার উত্তরে বলতেন—আম, জাম, কাঁঠাল, নারকোলও সাড়া দেয় কিনা তা আমরা বুঝতে পারি না। হয়তো সব গাছের সাড়া দেবার নিয়ম এক রকম নয়। আর প্রকৃতির সব রহস্য তো আমরা জানিনে। আমাদের মুনিঋষিরা বলে গিয়েছেন যে মানুষ বা পশুপক্ষীর যেমন প্রাণ আছে গাছপালারও তেমনি প্রাণ আছে। মানুষকে আঘাত করলে তার যেমন লাগে, তার কষ্ট হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, গাছপালারও তেমনি আঘাত পেলে লাগে। তাদেরও কষ্ট হয়। আম গাছ, শজনে গাছ, জিবলী গাছের গায়ে দা দিয়ে দু কোপ বসিয়ে দাও, দেখবে সেই আহত স্থান থেকে আটা বেরুচ্ছে। সেইটেই তাদের কান্না। আঘাত করলে সকলেরই লাগে—তা মানুষেরই হোক, পশু-পক্ষীরই হোক আর গাছপালারই হোক। আমরা হিন্দু। মুনি ঋষিদের কথা থেকে এইটুকু আমরা জানি। কোন হিন্দু ফলন্ত গাছকে কাটে না।

এইসব কথায় বালক জগদীশচন্দ্রের মনে কৌতূহল জেগে উঠত। আরও জানবার আগ্রহ হত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কর্মক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত পিতাকে তিনি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। পিতারও যতদূর জানা আছে তিনি ছেলেকে বলতেন। আর জানা না থাকলে তিনি বলতেন প্রকৃতির সব কথা তো আমরা জানি না। তুমি বড় হয়ে এইসব জানবার চেষ্টা করবে। পুত্রের মনে তিনি কৌতূহল জাগিয়ে দিতেন। তাকে কখনও নিরুৎসাহ করতেন না।

কিন্তু ক্লান্ত পিতাকে বালক জগদীশচন্দ্র এই রকম বিরক্ত করতেন বলে জগদীশচন্দ্রের পিতামহী বালককে মারবার জন্য লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন। তিনি বলতেন, "আমার ছেলেকে মারবি নাকি তুই। ঘুমো, নাহলে এই লাঠি দিয়ে তোকে মারব।"

শিশুর মনে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়াই তাকে শিক্ষা দেবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। শিক্ষিত পরিবারে যে শিশু জন্মায় তাকে কেউ নিরুৎসাহ করে না। তাকে শিক্ষিত পিতামাতা অথবা শিক্ষক কখনও বলেন না যে "বোকার মত এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।" অথবা "আমার সময় নেই।" এইখানেই শিক্ষিত পরিবেশ আর অশিক্ষিত পরিবেশের পার্থক্য।

জগদীশচন্দ্রের পশুপ্রীতি

শিশুমনের সংগোপনে বাল্যের স্মৃতি লুকিয়ে থাকে। কৈশোরে আর যৌবনে সেইসব স্মৃতি মনের ভেতর থেকে উঁকি মারতে থাকে। কিশোর আর যুবকের মনে সেইসব স্মৃতি জেগে ওঠে। সেই পথ ধরে সে আরও এগিয়ে চলে।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বাল্যে জীবজন্তুর সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। পথের ধারে ডোবায় বসে তিনি সহপাঠী-বালকদের সঙ্গে মাছ ধরতেন। বসে বসে মাছ কেমন করে সাঁতার দেয়, কেন তাদের কানকো বার বার খোলে আর বন্ধ করে, কেন তাদের চোখের পাতা বোঁজে না, শীতকালে অন্য জীবের শীত লাগে আর সেই বরফ জলে দিন রাত থেকেও কেন মাছের নিউমোনিয়া হয় না—এই সব কথা তিনি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি পশুপক্ষী সম্বন্ধে বাল্যে এত কৌতূহলী ছিলেন যে বড় হয়ে হয়ত তিনি পশুবিজ্ঞানী হতেন।

তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। সেই ঘোড়া তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চড়তে শিখেছিলেন। তাঁর চড়বার কৌশল দেখে সকলে বললে, "মেলায় যে ঘোড়দৌড় হবে, খোকা, তোমাকেও তাতে রেস (race) দিতে হবে।"

এই কথায় তিনি এতই উৎসাহিত হলেন যে বড় বড় ঘোড়ার রেসের পেছনে তিনিও তাঁর টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তাঁর ঘোড়ার ওপর জিন আর লাগাম ছিল। কিন্তু রেকাব ছিল না। তার ওপর তিনি ছোট্ট বালক মাত্র। তিনি প্রাণপণ বলে সেই জিন ধরে সকলের সঙ্গে রেস শেষ করলেন। মাত্র ৫।৬ বৎসরের বালক বড় ঘোড়ার ওপর বড় বড় লোকদের সঙ্গে তাঁর টাট্টু

ঘোড়ায় রেস দিলেন। তাঁর ঘোড়া সকলের পিছনে ঠিক এসে পৌছল। সকলেই বালকের এই কৃতিত্বে খুব খুশী হল। কিন্তু জিনে তাঁর পা কেটে রক্ত বেরুতে লাগল। কিন্তু তাঁর যে আঘাত লেগেছিল, তিনি কারও কাছে তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু যখন রক্ত বেরুল তখন তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তখন তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

অতি শৈশবে একদিন তিনি দেখলেন একটি লোককে আখের খেতে বাঘে ধরেছে। বাঘে কামড়ে দিয়েছে। সেই লোকটিকে সকলে মিলে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে আসে।

সাতদিন পরে একদিন জগদীশচন্দ্রের মা বালক জগদীশচন্দ্রকে তিরস্কার করলেন।

বালক রাগে, অভিমানে সেই আখের খেত যেখানে লোকটিকে বাঘে ধরেছিল, মায়ের ওপর অভিমানে বালক জগদীশচন্দ্র সেই আখের খেতের ভেতর গিয়ে লুকুলেন। থাক, তাঁকেও সেই বাঘ খাক। দেখি মা কি করে!

বালক আখের ক্ষেতে তো গেলেন। কিন্তু সেই আখের ক্ষেতে একটা কিসের খস্ খস্ শব্দ শুনে বালকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে এলেন। তখন মা তাঁকে কোলে করে আদর করতে লাগলেন। এই রকম করে বালক জগদীশচন্দ্র স্নেহময়ী জননীর কাছে মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন।

আজকাল ক্রিকেট খেলা ছেলেদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছেলেরা প্রায় সকলেই খেলে। আর এর নিয়মকানুন সকলেই জানে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন বালক অর্থাৎ প্রায় একশ বছর আগে এই খেলাকে তাঁদের শিক্ষকমশাই ভাল চোখে দেখতেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন বিকেলবেলার ঘণ্টা দুই সময় পড়াশুনো করলে কাজ হবে। তা না করে খেলা করে সময় নষ্ট করাটা তাঁরা সময়ের অপব্যয় বলেই মনে করতেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি তখনকার দিনের ছেলেদেরও খেলাধুলোর খুব শখ ছিল। আর ক্রিকেট আর বল কোথায় পাওয়া যাবে? এখনকার মত তখন ক্রিকেট খেলার ব্যাট আর বল যেখানে সেখানে পাওয়া যেত না। আর তার দামও কম ছিল না।

বালকেরা গ্রামের ছুতোরকে দিয়ে কাঠ কেটে ব্যাট তৈরি করালেন। আর রবার গাছ থেকে একটু একটু করে আটা সংগ্রহ করে বেশ গোল করে বড় একটা বল তৈরি হল।

কিন্তু খেলা হবে কোথায়? গ্রামের চৌমাথা রাস্তা বল খেলার মাঠ হল। আর কঠোর প্রকৃতির খেলার-ওপর-বীতরাগ শিক্ষকমশাই পাছে তাঁদের খেলা দেখে ফেলেন সেইজন্য তাঁর বাড়ির দিক থেকে আসবার পথে একজন ছেলেকে দাঁড় করান হল। তাকে বলা হল—তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। শিক্ষকমশাইকে দূর থেকে আসতে দেখলে ইঙ্গিত দিবি।

পাছে শিক্ষকমশাই এসে পড়ে তাঁদের দেখে ফেলেন সেইজন্য গার্ড তো দাঁড় করান হল। কিন্তু তখন তখনই লুকোন যাবে কোথায়?

পথের ধারে খানা-ডোবায় অনেক গাছের ডালপালা সংগ্রহ করে স্তূপাকার করে রাখা হল। আর শিক্ষকমশাইকে দূর থেকে আসতে দেখলেই ব্যাট, স্টাম্প আর বল সমেত তার ভেতর গিয়ে লুকানো হবে। আর বিপদ কেটে গেলেই আবার খেলা শুরু করা হবে।

* * * *

জগদীশচন্দ্রের যাত্রার ওপর অনুরাগ

ছেলেবেলায় জগদীশচন্দ্র যে যাত্রা শুনতেন—তার বিষয়বস্তু থাকত রামায়ণ আর মহাভারত। যাত্রা দেখে দেখে তাঁর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বেশ শেখা হয়ে গিয়েছিল। রামচন্দ্রই তাঁর আদর্শ চরিত্র ছিলেন। বিপদে আপদে সব সময়ে তাঁর অনুগামী লক্ষ্মণকে তাঁর বড় ভাল লাগত। ভাই হতে হয় তো এমনই যেন প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হয়। ভাইয়ের প্রতি এত প্রাণ দিয়ে ভালবাসা আর কোথাও তিনি দেখেন নি।

আর মহাভারতের ভেতর তাঁর ভাল লাগত কর্ণকে। এত বড় বীর সমস্ত মহাভারতে আর নেই। দশ বছর বয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত কর্ণের বীর চরিত্র জগদীশচন্দ্রের আদর্শ হয়ে ছিল। গ্রামের অভিনয়ের পাদপীঠে তিনি কর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। কর্ণের চরিত্র তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে প্রৌঢ় বয়সে ও বার্ধক্যেও তাঁর জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিকের সাধনার ভূমিকা সত্ত্বেও তিনি কর্ণের ভূমিকা গড় গড় করে বলে যেতে পারতেন। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ! তাঁর জীবনে বীরত্বের আদর্শ।

পাণ্ডবদের সকলের বড় ভাই কর্ণ। তাঁর তো রাজা হওয়ার কথা। শুধু কি তাই? তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবতার সন্তান—সূর্যদেবের পুত্র! আর তাঁরই কিনা জীবনে এত দুর্গতি! এত বিড়ম্বনা!

জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে দিলেন নদীতে ভাসিয়ে। একজন সারথির স্ত্রী তাঁকে জল থেকে তুলে এনে মানুষ করলেন। বীরত্বের আদর্শে তাকে মানুষ করে তুললেন। এই নীচ জাতের ঘরে মানুষ হয়ে তাঁকে জীবনে যত বিড়ম্বনা, যত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে এত আর কারও ভাগ্যে হয় না। তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও সকলের কাছে হেয় হয়ে রইলেন। তাঁর বীরত্ব ম্লান হয়ে রইল। ফুটে উঠতে পারল না। কারণ তিনি সূতপুত্র। রাজপুত্রদের সঙ্গে বীরত্ব দেখাতে গেলেন। সকলে বললে, যা যা তুই সরে যা। তুই সূতপুত্র। রাজপুত্রদের সঙ্গে মিশতে আসিস কোন্ লজ্জায়? কথাটা শুনে তাঁর মাথা কাটা গেল। কি লজ্জার কথা! তাঁর অপরাজেয় বীরত্বটা কিছু নয়? শুধু জাতটাই এত বড়! জাতের জন্য তিনি অস্পৃশ্য হয়ে থাকবেন? তিনি বললেন— দৈবায়ত্তং হি কুলে জন্ম

মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

আমি কোন্ বংশে জন্মেছি—তাতে তো আমার কোন হাত ছিল না। আমি যে বীরত্ব, যে পুরুষকার অর্জন করেছি—তার কি কোন দাম নেই? বিশাল প্রবাহিনী গঙ্গা, সে যে ক্ষুদ্রকায়া কয়েকটি শাখানদীর জল সংগ্রহ করে তার বিরাটত্ব লাভ করেছে—সেই হীনতা কি তার যথার্থ পরিচয়?

দুর্যোধন প্রভৃতি ভাইদের চিরকাল হিংসা অর্জুনের ওপর। আর এত বড় একজন দুর্ধর্ষ বীর—একে দলে রাখতে পারলে তো একে দিয়েই অর্জুনকে হারান যাবে!

দুর্যোধন বললেন—কর্ণ, তোমাকে আজ থেকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করলাম। তুমি আর হেয় নও। কারও অপেক্ষা হীন নও। তুমি রাজপুত্র। সূতপুত্র বলে তোমার যে হীন পরিচয়, আজ থেকে তা দূর হয়ে গেল। রাজপুত্র হয়ে এখন থেকে তুমি তোমার বীরত্বের উপযুক্ত মর্যাদা পাবে।

দুর্যোধনের অনুগ্রহে কর্ণের হীন পরিচয় ঢেকে গেল। তিনি দুর্যোধনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন। তিনি সারা জীবনের হীন পরিচয় থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। জননী কুন্তী দেবী যখন তাঁকে আপন সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার দিতে চাইলেন তখন কর্ণের মনুষ্যত্বে ও কৃতজ্ঞতায় বাধল। তিনি জননীকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি দুর্যোধনের কাছে অকৃতজ্ঞ হতে পারলেন না। তবে কুন্তীদেবীকে বলে দিলেন—অর্জুন ছাড়া তিনি তাঁর আর কোন ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।

পৃথিবীতে হয় অর্জুন থাকবে—না হয় কর্ণ থাকবে। যেই থাক, তিনি পঞ্চপুত্রের জননী হয়েই থাকবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে গেলেন। সেই তীরেই তিনি অর্জুনকে ভূতলশায়ী করতেন। কিন্তু অর্জুনের সাহায্যকারী এক দেবতা কর্ণের পদতলের মাটি কাঁপিয়ে দিলেন। কর্ণের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। কিন্তু কর্ণ জানতেন না—সেই তীর ছিল মন্ত্রপূত। সেই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কর্ণের হাতেই ফিরে গেল। তীর কর্ণকে বললে—অর্জুনকে বিদ্ধ করবার জন্যই আমার জন্ম। আমি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি, আর তোমার অব্যর্থ লক্ষ্য—এই দুয়ে মিলে আমি অজেয়। অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাকে আর একবার ছোড়।

বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ বললেন, অপরের শক্তির সাহায্য নিয়ে আমি শত্রুবধ করি না। আমি আপন শক্তিতে যুদ্ধ করি। এই বলে তিনি সেই মন্ত্রপূত তীর ঘৃণাভরে ফেলে দিয়ে অপর একটা তীর গ্রহণ করলেন।

এবার সেই বিরুদ্ধ দেবতা মেদিনী বিদীর্ণ করে দিলেন। সেই বিদীর্ণ মেদিনী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করল। রথের চাকা তুলবার জন্য কর্ণ মাটিতে নামলেন। সেই সুযোগে অর্জুন কাপুরুষের মত এই নিরস্ত্র বীরকে খড়্গাঘাতে হত্যা করলেন। তবুও কর্ণ ভাগ্যকে মানলেন না। কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিলেন না।

কর্ণের মহত্ব আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

কর্ণের আদর্শই জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতার ভিতর দেখতে পেয়েছেন। জনসাধারণকে উন্নত করবার আদর্শই ভগবানচন্দ্র অনুসরণ করে এসেছেন। কৃতকার্য হতে পারেন নি হয়ত। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কর্ণের মহত্ত্ব, কর্ণের পুরুষকার, কর্ণের পরহিতব্রত অনুসরণ করতে বিরত হননি। এই বীরত্ব, এই পুরুষকারের ভেতরেই পিতার অনুসরণে জগদীশচন্দ্র তাঁর আদর্শকে স্থির লক্ষ্যে সারা জীবন জয় পরাজয়ে, বিপদে সম্পদে, বিজ্ঞানের অনুসরণে তাঁর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অস্বীকৃতিতে তাঁর স্থির ভাবে অনুসরণ করে এসেছেন। কলকাতা, লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি ডিগ্রী নিয়েও তিনি এদেশে প্রথমে একটা অধ্যাপকের চাকরি সংগ্রহ করতে পারেননি।

অসম্মানকে বরণ করব না আর পুরুষকারকে অনুসরণ করব—কর্ণের এই আদর্শে জগদীশচন্দ্র নিজের জীবনে কোন অসম্মানকেই কোন দিন বরণ

করেন নি। কর্ণের আদর্শ তাঁর জীবনকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি যুদ্ধ করে চলেছেন। কোন দিন তিনি পরাজয় বরণ করেন নি।

জগদীশচন্দ্র বলেছেন—ভারতের প্রাচীন বীরত্ব ও ঐতিহ্যের যুগের আদর্শ এই চলমান যাত্রাদলের মাধ্যমেই প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্বোচ্চ জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বীরত্বের আদর্শ চিরদিন এই যাত্রার মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে ও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করেছে। দেশে যাত্রার দল আজ লুপ্ত হতে বসেছে। সেই যাত্রার দলের আবার প্রবর্তন হওয়া দরকার। কিংবা এর সময়োপযোগী কোন সংস্কৃত সংস্করণের প্রচলন হওয়া উচিত। এই যাত্রার দলের ভারতীয় সংস্করণ করে আমাদের প্রাচীন আর্যজাতি, তাদের অরণ্যময় পরিবেশে সেই মুনি ঋষিদের ধারা ও আদর্শ, ভারতীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত, ভরতের আদর্শ চরিত্র, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামচন্দ্রের প্রজাবাৎসল্য, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি উপদেশ, কর্ণ ও অর্জুনের বীরত্ব, ভীষ্মের ত্যাগ ও মহিমাময় চরিত্রের কথা ভারতবাসীকে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রাচীন পাটলিপুত্রের পবিত্র বারাণসী থেকে আধুনিক বোম্বাই পর্যন্ত দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য. প্রাচীন অনার্য থেকে আধুনিক বাংলা, কলকাতার বর্তমান অধিবাসীর জীবনের পরিবর্তনের ধারা, তাদের কবি—প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পরীতি, গ্রাম্য কুমার কামারের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পরীতি সবই যাত্রা বা তার আধুনিক সংস্করণের মাধ্যমে ভারতবাসীর জীবনের সামনে তুলে ধরা দরকার। মুনিঋষিদের আশ্রমে গুরুগৃহে বসে প্রাচীন শিক্ষার ধারা, টোলের শিক্ষা, বর্তমান ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর জীবনের পরিবর্তনের ধারা সবই এই নব সংস্কৃত যাত্রার নাচগানের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে পরিবেশন করা উচিত।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে জগদীশচন্দ্র

বর্ধমানে শিক্ষার পর জগদীশচন্দ্র কলকাতায় আসেন। এখানে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। হেয়ার স্কুলে তিন মাস পড়ার পর ভগবানচন্দ্র জগদীশচন্দ্রকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এখানে প্রায় সব

বালকই ছিল ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়। তারা কেউই বাংলা বলতে বা পড়তে জানতো না। আর বালক জগদীশচন্দ্র তখন ইংরাজী সবে শিখতে আরম্ভ করেছেন। ইংরাজীতে কথা বলতে পারেন না। শুধু সামান্য সামান্য পড়তে শিখেছেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সব ছেলেই শহরবাসী। আর জগদীশচন্দ্র এতদিন মানুষ হয়েছেন ফরিদপুর ও বর্ধমানে। তিনি ছিলেন পল্লীবাসী। শহরের আদব কায়দা, রীতিনীতি, চাল চলন তিনি কিছুই জানতেন না। শহরের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। তাঁর পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা এখানে কোন কাজেই লাগল না। সে সব অভিজ্ঞতা কেবল স্মৃতিমাত্রেই পর্যবসিত হল।

নতুন ছেলে স্কুলে ভর্তি হলে, তাকে সকলেই খেপায়, ভেঙায়, উপহাস করে। বালক জগদীশচন্দ্রকেও সেই সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হল। ক্লাসের চ্যাম্পিয়ানের হাতে একদিন বালক জগদীশচন্দ্রকে গাঁট্টা খেতে হল। নাক দিয়ে রক্ত আর চোখ দিয়ে জলও বেরুল।

এখানে আরও অসুবিধা জগদীশচন্দ্রকে ভোগ করতে হল। যে হোস্টেলে তিনি থাকতেন সেখানে কোন স্কুলের ছেলে থাকত না। থাকত বিভিন্ন কলেজের ছেলেরা। সুতরাং তাঁর সঙ্গে তাদের বয়সের একটু পার্থক্য ছিল বলে জগদীশচন্দ্র এখানে খেলাধুলায় বেশী অংশ গ্রহণ করতেন না। তাঁর পূর্বের যে অভ্যাস ছিল তিনি সেই অভ্যাসেই মন দিলেন। তিনি হাতখরচের যে টাকা পেতেন, সেই টাকা দিয়ে খরগোশ, পায়রা, ভেড়া ইত্যাদি কিনতেন। তাদের শুধু খেতে দিলেই হবে না। তাদের বসবাসের জন্য ঘর বাড়িও তৈরি করে দিতে হবে। তাদের দেখাশুনোও করতে হবে। পড়াশুনোর পর তাঁর যেটুকু অবসর থাকত, এই কাজেই কাটত।

তাঁদের উঠোনের এক কোণে তিনি ছোট একটু বাগান করেছিলেন। কয়েকটা জলের পাইপ (নল) যোগাড় করে জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোট্ট একটু খাল তৈরি হয়েছিল। তার উপর আবার একটা সেতু।

প্রৌঢ় বয়সে জগদীশচন্দ্র তাঁর দার্জিলিং এর বাড়ীর বাগানে বাল্যের অনুকরণে সেই রকম নল বসিয়ে জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই রকম ছোট্ট একটু খাল। আবার তার উপর একটা সেতু। বোস ইনষ্টিটিউটের পাশে কলকাতায় নিজের বাড়ীতেও তিনি ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে

জগদীশচন্দ্র ষোল বৎসর বয়সে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজেই পড়তে লাগলেন।

এতদিন পর্যন্ত ছাত্র হিসাবে জগদীশচন্দ্রের কোন বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নি। সাধারণ ভাবেই তিনি পাস করেছেন। কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ফাদার লাফোঁ (Father Lafont)। তাঁর অধ্যাপনায় ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি যেমন সুন্দর ও বিশদ করে পদার্থবিদ্যার বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতেন তেমনি সুন্দর করে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখাতেন। ছাত্ররা ফাদার লাফোঁর পড়ান ও পরীক্ষা দেখানোর গুণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত। সমস্ত কলেজে তাঁর মত উপযুক্ত অধ্যাপক আর কেউ ছিলেন না। প্রত্যেক ছাত্র যে ফাদার লাফোঁর কাছে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে, সে জীবনে তাঁর পড়ান কখনও ভুলতে পারে নি।

জগদীশচন্দ্র তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর মনে তখন গোধূলির স্বর্ণাভা। চোখের সামনে কল্পনার রঙীন ফানুস। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙীন আলো তখনও তাঁর জীবনের দিক্‌চক্রবালকে আলোকিত করে নি।

পরীক্ষা তিনি অবহেলায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা-জীবনকে কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল করে তোলবার জন্য বিলেতে যাবেন।

এই সময় পিতা ভগবানচন্দ্র যত কিছু কাজে হাত দিয়েছেন সব কিছুতেই অকৃতকার্য হয়েছেন। এই সময় তিনি নানাভাবে ঋণের দায়ে জড়িত হন, উচ্চ সুদ দিয়ে তাঁর সংসার চলা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তার ওপর অসুস্থতার জন্য ভগবানচন্দ্র অল্প বেতনে ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং তখন পুত্রকে বিলেতে পাঠাবার মত সচ্ছলতা ভগবানচন্দ্রের ছিল না।

জগদীশচন্দ্র বুঝেছিলেন যে লেখাপড়া শিখে তাঁর প্রথম কর্তব্য হল পিতার ঋণভার লাঘব করা। আর তার শ্রেষ্ঠ উপায় হল বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। পিতা ভগবানচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের চাকরি করে কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করেও দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে ঢুকলে

দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা পুত্রের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হবে। সুতরাং পুত্রের সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব তিনি একেবারে বাতিল করে দিলেন। তিনি বরং অধ্যাপকের বৃত্তি নিন অথবা ভারতবাসী কৃষি শিক্ষায় যাতে অগ্রসর হতে পারে সে শিক্ষাও তিনি নিতে পারেন।

জগদীশচন্দ্র যখন বি. এ. পড়েন তখন কোন বিষয়ে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। সেই জন্য তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি ডাক্তারি পড়বেন। কিন্তু চার বৎসর লণ্ডনে পড়বার অর্থ কোথা হতে আসবে? পিতা যদি সুস্থ হয়ে চাকরিতে যোগদান করতে পারেন তাহলে তিনি পুরা বেতন পাবেন। কিন্তু এই অনিশ্চিত অবস্থার ওপর নির্ভর করে কি করে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে যাবেন?

তার ওপর জগদীশচন্দ্রকে ছেড়ে তাঁর মা চার বৎসর কি করে থাকবেন? বিশেষতঃ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দশ বৎসর বয়সে মারা যায়। এখন জগদীশচন্দ্রই তাঁর একমাত্র পুত্র। সেই পুত্রের ওপর স্নেহময়ী জননীর যাবতীয় স্নেহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আর মা এই দীর্ঘ বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন?

পিতার আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে জগদীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য লণ্ডনে যাওয়া সম্ভব কি না বিবেচনা করবার জন্য একদিন একটা পারিবারিক সভা বসল। সভায় স্থির হল যে তাদের বর্তমান অবস্থায় লণ্ডনে গিয়ে চার বৎসর জগদীশচন্দ্রের খরচ চালান অসম্ভব। তিনি নিজেও তাঁর অন্তরের একান্ত বাসনা সত্বেও লণ্ডনে না যাওয়াই স্থির করলেন। কারণ সেটা খুব স্বার্থপরের মত কাজ হবে। সুতরাং তিনি স্থির করলেন এদেশেই যা লেখাপড়া সম্ভব তিনি তাই করবেন।

বিলেতে শিক্ষা লাভের আশায় বঞ্চিত হওয়ায় জগদীশচন্দ্রের মনে একটা আঘাত লাগল। তিনি সমস্ত দিন বিমর্ষ হয়ে রইলেন। মা সেটা লক্ষ্য করলেন। সন্তানবৎসল জননীর প্রাণে কিন্তু সেটা সহ্য হল না। বিলেতে শিক্ষা লাভের আশায় নিরাশ হয়ে ছেলের প্রাণে যে কত বড় একটা আঘাত লেগেছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

সন্ধ্যার পর স্নেহময়ী জননী বামাসুন্দরী দেবী ছেলের মাথাটি কোলে নিয়ে বসলেন। মা যেমন তার ছোট্ট ছেলেটিকে আদর করে ঠিক সেইরকম করে

তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর বললেন বিলেতে না যেতে পেরে তোর মনে একটা আঘাত লেগেছে। তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মনকে আমি ঠিক করে ফেলেছি। তোকে আমি কষ্ট পেতে দেব না। তোর বাবার টাকা নেই। কিন্তু আমার গায়ে তো অনেক গহনা আছে। আর আমার নিজের কিছু টাকাও আছে। আমার গহনাগুলো বেচে তোকে টাকা দেব। তুই ভাবিস নে। তুই বিলাতে যাবার সব ঠিকঠাক কর।

পিতা এ কথা শুনলেন। তিনি এতে কোন আপত্তি করলেন না। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাওয়াই স্থির হল।

জগদীশচন্দ্র তখন পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে লণ্ডন যাওয়াই স্থির করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ডাক্তারি পড়বেন। কারণ বিজ্ঞান পড়ে কোন চাকরি পাওয়ার কথা তখনকার দিনে কেউ চিন্তাও করত না।

ভগবানচন্দ্রের শরীরের ইতিমধ্যে উন্নতি হল। তিনি পাবনায় গিয়ে পুরা বেতনে চাকরিতে যোগ দিলেন। সুতরাং অর্থের জন্য আর মায়ের অলঙ্কার বিক্রি করতে হল না।

জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ঘোড়ার দেখাশুনা করত একজন বৃদ্ধ রাজপুত সেপাই। সে জগদীশচন্দ্রকে বন্দুক ছুড়তে শিখিয়েছিল। তারপর তিনি মাঝে মাঝে শিকার করতে যেতেন। একবার কলেজের ছুটিতে তিনি তরাই অঞ্চলের জঙ্গলে বন্য জন্তু শিকার করতে গিয়েছিলেন।

আসামে জগদীশচন্দ্র

ছ' মাস পরে আসামের এক জমিদার বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে আসামের জঙ্গলে বন্য জন্তু শিকারের নিমন্ত্রণ জানালেন। সেই জমিদার নিজেও একজন ভাল শিকারী। তাঁরই জঙ্গলে বুনো মোষ ছিল। আর ছিল গণ্ডার।

জগদীশচন্দ্র আসাম যাত্রা করলেন। সন্ধ্যাবেলা সেই বন্ধুর দেশের নিকটবর্তী স্টেশনে গিয়ে নামলেন। সেখান থেকে একুশ মাইল পথ সেই রাত্রে গেলে তবে তিনি বন্ধুর বাড়িতে পৌছবেন। বন্ধু তাঁর জন্য একখানি পাল্কি পাঠিয়ে ছিলেন। সেই পাল্কিতে দীর্ঘ একুশ মাইল পথ অতিক্রম করে জগদীশচন্দ্র বন্ধুর বাড়িতে পৌছলেন।

দুই বন্ধুতে শিকারে বেরুলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা জগদীশচন্দ্রের থর থর করে কেঁপে জ্বর এল। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন,

জ্বরের প্রকোপ আরও বাড়বার আগেই অর্থাৎ তিনি শয্যাগত হয়ে পড়বার আগেই তাঁকে সে দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় পৌছতে হবে। কিন্তু তখন আর পাল্কি পাওয়া গেল না।

তাড়াতাড়ি আসাম ত্যাগ করবার আগ্রহে জগদীশচন্দ্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—একটা ঘোড়া পাওয়া যায় কিনা?

বন্ধু বললেন—একটি মাত্র রেসের ঘোড়া আছে। সে ঘোড়ায় চড়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেউ তার পিঠে চড়তে পারে না। তার আগের সওয়ারকে ফেলে দিয়ে সে প্রায় মেরে ফেলেছিল আর কি। তার দোষ অনেক। সেই থেকে আর কেউ তার পিঠে চড়ে নি।

জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ একুশ মাইল পথ যাবার আর কোন উপায় না দেখে বললেন,—ঘোড়া আনতে বল, দেখি তোমার কেমন ঘোড়া।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া আনা হল।

জগদীশচন্দ্র যখন ঘোড়ার পিঠে চড়তে গেলেন তখন সেই ঘোড়া চার পা তুলে দাঁড়াল। আবার তাঁকে কামড়াতেও গেল।

তার আক্রমণ বাঁচিয়ে জগদীশচন্দ্র ঘোড়ার পিঠে তো উঠলেন। উঠতেই তৎক্ষণাৎ ঘোড়া একেবারে দ্রুত বেগে ছুটল।

বন্ধুর কাছে তাঁর বিদায় নেবারও সুযোগ হল না। তিনি বন্ধুকে একটা কথাও বলবার সময় পেলেন না। ঘোড়া সেই যে ছুটল লাগাম টানলেও আর থামে না। পথে একটা নদী পড়ল। আসবার সময় তিনি পালকির ভেতর ঘুমিয়ে এই নদী পার হয়ে এসে ছিলেন।

তিনি দ্রুত গতিতে লাগাম টেনে ঘোড়াকে এক পাশ দিয়ে নিয়ে গেলেন। দেখলেন যে সেতুর মাঝখানটা বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। তাঁর বুদ্ধিবলে তিনি এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। নচেৎ তিনি ঘোড়া সুদ্ধ নদীতে পড়ে বন্যার জলে ভেসে যেতেন।

আর একটু গিয়ে পথে একটা বাঁশের সেতু পড়ল। আসল সেতুটা মেরামত হচ্ছে। তার জায়গায় এই বাঁশের সেতু দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে।

সেই ভীষণ ঘোড়া দুই লাফে সেই সেতুও পার হয়ে গেল। তাতে সেই সেতু প্রায় মচ্ মচ করে ভাঙ্গবার উপক্রম হয়েছিল।

চোদ্দ মাইল পথ গিয়ে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর অবশিষ্ট সাত মাইল পথ ক্লান্ত ঘোড়া বেশ ধীরভাবেই গেল।

স্টেশনে পৌঁছে জ্বরে আক্রান্ত জগদীশচন্দ্র আরও ক্লান্ত হয়ে কলকাতার দীর্ঘ পথে ট্রেনে উঠে শুয়ে পড়লেন।

জগদীশচন্দ্রের কালাজ্বর

জগদীশচন্দ্র জ্বরগায়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন।

কুইনাইনে সে জ্বর ছাড়লনা। সব চিকিৎসাই করা হল। কিন্তু জ্বর ছাড়ে। আবার আসে। এই রকমে কোন প্রকারে জগদীশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইংলণ্ড যাত্রা করবার সময় পর্যন্ত জ্বর সারল না। সকলেই আশা করল যে সমুদ্রযাত্রায় হয়ত জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় জ্বরের উপকার হওয়া দূরে থাক, জ্বর আরও বাড়ল। একদিন তিনি জাহাজে ডাক্তারের কাছে দেখাতে গিয়েছেন এমন সময় জগদীশচন্দ্র অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ডাক্তার কোলে করে তাঁকে তাঁর বার্থে রেখে এল।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় কোন উপকার হল না। রোগাক্রান্ত জগদীশচন্দ্রের কানে গেল লোকে বলাবলি করছে—ছেলেটা বোধ হয় আর ইংলণ্ডে পৌঁছতে পারবে না। তাঁর এই বিদেশযাত্রায় দুজন মহিলা সাউদমটন থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত তাঁকে মিষ্টি সম্ভাষণ করে সহানুভূতি দেখিয়েছিল। সেইটুকু তাঁর স্মৃতিতে চিরদিনের মত জাগরূক ছিল।

জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে পৌঁছলেন। তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ সার্টিফিকেট বিলেতের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট বলে গণ্য হল।

লণ্ডন মেডিক্যাল কলেজে

জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এই শ্রেণীতে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা যা পড়ান হতে লাগল, তিনি সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে যা পড়ে গিয়েছেন সেই একই স্তরের। অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেস্টার (Ray Lankester) প্রাণিবিদ্যা যা পড়াতে লাগলেন তা জগদীশচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত চমকপ্রদ লাগল। আর সব নতুন। তিনি প্রাণিবিদ্যা তো আগে কখনও পড়েন নি। সুতরাং এটা তাঁর কাছে খুব শিক্ষণীয় হল। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রাণিবিদ্যা পড়ানর কোন ব্যবস্থা ছিল না।

গ্রীষ্মের টার্মে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পড়ান হল। সেটা জগদীশচন্দ্রের খুব ভাল লাগল। সুতরাং প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তিনি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

তার পরের শরৎকালের টার্মে শারীরবিদ্যা দিয়ে ঠিক ডাক্তারি পড়া আরম্ভ হল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের জ্বর তখনও ছাড়ে নি। শব ব্যবচ্ছেদের ঘরের দুর্গন্ধে জ্বরের প্রকোপ আরও বাড়তে লাগল। শেষে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের পক্ষে ডাক্তারি পড়া সম্ভব নয় বলে তাঁকে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিতে বললেন।

লণ্ডন হাসপাতালের সবচেয়ে বড় ডাক্তার রিঙ্গার (Dr. Ringer), এক জন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক এবং অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। রিঙ্গার জগদীশ-চন্দ্রকে আর্সেনিক ইনজেকশন দিলেন। অন্য ইনজেকশনও দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর জ্বর ছাড়ল না। তখন তিনিও জগদীশচন্দ্রের পক্ষে ডাক্তারি পড়া সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করলেন।

জগদীশচন্দ্রকে ডাক্তারি পড়া ছাড়তে হল। কিন্তু লণ্ডনে এই এক বৎসর ডাক্তারি পড়ায় তাঁর জীবনের প্রস্তুতির পথে তাঁকে অনেকটা অগ্রসর করে দিল। তিনি মেডিক্যাল কলেজের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের নিকট প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ভাল করেই শিখলেন। নচেৎ কেবল পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যায় তিনি পরবর্তী জীবনে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা কখনই দেখাতে পারতেন না।

কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্র

এবার জগদীশচন্দ্র জ্বরের জন্য ডাক্তারি পড়া ছাড়তে বাধ্য হলেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁকে লণ্ডন ছেড়ে কেম্ব্রিজে গিয়ে বিজ্ঞান পড়তে হল। এই ম্যালেরিয়া একটা ভাল কাজ করল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে পদার্থ বিজ্ঞানের পথে ঠেলে দিল। এসেছিল ক্ষতি করতে, হয়ে গেল লাভ। এই পদার্থবিজ্ঞানের পথেই জগদীশচন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের সার্থকতা। ভারতমাতার মলিন মুখ উজ্জ্বল করতে পেরেছিলেন। এইবার শুরু হল তাঁর সাধনার পর্ব।

জ্বর তাঁর ভবিষ্যৎ পাঠ্যক্রম স্থির করে দিল। তিনি ল্যাটিন মুখস্থ করতে বাধ্য হলেন। গ্রীক ভাষার পরিবর্তে নিলেন সংস্কৃত।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্রাইস্ট কলেজে তিনি বিজ্ঞানে একটা বৃত্তি পেলেন।

এখন থেকে জগদীশচন্দ্রের জীবনপ্রবাহ ভিন্ন খাতে বইতে লাগল। জর মাঝে মাঝে হতে লাগল। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ওষুধ খাওয়া ত্যাগ করলেন। তার পরিবর্তে তিনি নৌকা বাইতে আরম্ভ করলেন। তাতে তাঁর প্রচুর পরিশ্রম হতে লাগল। তার জন্য ক্ষুধাও বাড়ল। শরীর সবল হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও জর কিছুতেই যায় না।

প্রথম প্রথম সপ্তাহে একবার জর হতে লাগল। তারপর দু সপ্তাহে একবার। জগদীশচন্দ্রের ইংলণ্ড প্রবাসের দ্বিতীয় বৎসরে তবে তাঁর শরীর সুস্থ হল। তিনি তাঁর পূর্ণ কর্মশক্তি ফিরে পেলেন।

এতদিনে তিনি রোগ-জীবাণু মুক্ত হলেন। কিন্তু নিদ্রাল্পতা রোগ দেখা দিল।

তিন বৎসর জগদীশচন্দ্র যে জরে ভুগলেন এটা সাধারণ জর নয়। এটা আসামের কালাজর। সে কালে এর কোন ওষুধ ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেকালে কালাজরে রোগীর মৃত্যু হত। কিন্তু এই রোগভোগের মধ্যেও আমরা ভগবানের মঙ্গল হস্তের ইঙ্গিত দেখতে পাই। প্রথমত তিনি ডাক্তারি পড়তে গিয়ে প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট খুব ভাল করেই শিখেছিলেন।

প্রথম বৎসর কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁর অসুস্থতার জন্য ধীরে ধীরে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই সময় তিনি কারও সঙ্গে মিশতেন না।

দ্বিতীয় বৎসরে তাঁর দেহের পূর্ণ শক্তি ফিরে এল। এখন থেকে তিনি কলেজে অপর ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। কলেজ জীবনের আনন্দ-কোলাহল, কলেজ হলের ভোজসভায় যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব হল। কলেজের বাইরেও তাঁর পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হল। একটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্লাবে তিনি যোগ দিলেন। সেখানে সভার অধিবেশনে প্রবন্ধ পড়া ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। এই রকমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব খুব ভালভাবেই চলতে লাগল।

এই সময়ে তাঁর বন্ধুদের স্মৃতি তাঁর মনে দীর্ঘকাল উজ্জ্বল হয়ে ছিল। সেই সময়ের কথা বলতে তিনি মুখর হয়ে উঠতেন। বিলাত প্রবাসের ৪০ বৎসর

পরেও তাঁর সেই সব সুখস্মৃতি মন্থনে তিনি আনন্দ পেতেন। এদের মধ্যে ছিলেন থিয়োডোর বেক (Theodcre Beck)। পরে তিনি আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ডি' আরসি টমসন (D' Arcy Thomson)। সিপলে (Shiply) পরে ক্রাইস্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আর ছিলেন ফিটুজপ্যাট্রিক (Fitzpatrick)। তিনি পরে বৈজ্ঞানিক হয়ে এমানুয়েল কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। আর এক তাঁর সহপাঠী ছিলেন রেনল্ডস গ্রীন। তিনি ছিলেন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ।

জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে কলেজে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি কাটালেন আইল অব ওয়াইটে (Isle of Weight)। কিন্তু স্যাঙ্কলিন উপসাগরের বাইরে গিয়ে তিনি একলা একদিন নৌকা চড়ে দাঁড় টানতে গিয়ে হঠাৎ ঝড়ের মুখে পড়ে গেলেন। তিন ঘণ্টা তিনি একলা দাঁড় টেনে ঝড়ের মুখ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে কতবার যে নৌকো উলটে যাবার উপক্রম হয়েছে তার ঠিক নেই। খাল, বিল, নদী ও জলের দেশের দুর্ধর্ষ ছেলে বলেই সে যাত্রা তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে তাঁকে কয়েকদিন জ্বর ভোগ করতে হল। কিন্তু তাঁর সহৃদয় গৃহকর্ত্রী তাঁকে সেবা করে সুস্থ করে তুললেন।

পরের বৎসর জগদীশচন্দ্র গ্রীষ্মের ছুটির দু' মাস তাঁর কলেজের সহপাঠীদের একটি ছোট্ট দলের সঙ্গে গেলেন স্কটল্যাণ্ডে। পাহাড়ে পাহাড়ে আর হ্রদের তীরে অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে ছুটি কাটালেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর শেষ গ্রীষ্মের ছুটি কাটালেন কেম্ব্রিজে বি. এ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতিপর্বে; স্তূপাকার বইয়ের মধ্যে, বিজ্ঞানের গবেষণার ভেতর, আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে। তার জন্য তিনি তখনি নিজেকে যথাসাধ্য প্রস্তুত করতে লাগলেন।

কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান পড়া আরম্ভের সময় জগদীশচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয় তাঁর পাঠ্য করে নেবেন সেইটে তাঁর সামনে এক সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তাঁর কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বেশী, তাও তিনি নিজে ঠিক বুঝতে পারলেন না। সব বিষয়ই তো তাঁর সমান ভাল লাগে। তবে?

তিনি স্থির করলেন বিজ্ঞানের সব বিষয়ই সব অধ্যাপকের ক্লাসে তিনি যোগ দেবেন। আর যতগুলি সম্ভব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করবেন। সব

বিষয়ের অধ্যাপকের ক্লাসে শুধু যোগ দিলেই তো হবে না। সব বিষয়গুলিই তাঁকে প্রাণপণে অধ্যয়ন করতে হবে। সুতরাং এই সময় তাঁর স্বেচ্ছাকৃত সব বিজ্ঞান বিষয়গুলি পাঠ্য নির্বাচনে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। দিনরাত তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। আর পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন। একমাত্র আশুতোষ ছাড়া এরকম অধ্যয়ন করতে আর কারও কথা আমরা জানি না। আশুতোষও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। জগদীশচন্দ্রও বিজ্ঞানের ছাত্র। আশুতোষকে তাঁর আদর্শ পিতামাতা দিনরাত অধ্যয়ন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। অবশেষে একদিন তাঁকে একটা ঘরের ভেতর চাবি দিয়ে রাখা হল। সেখানে কোন পড়ার বই, খাতা পেন্সিল ছিল না। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে আশুতোষের ঘরের দুয়ার খুলে দেখা গেল, আশুতোষ কাগজ-কলমের অভাবে ঘরের মেঝেয় কয়লা দিয়ে অঙ্ক কষছেন। জ্যামিতির বিষয় গবেষণা করছেন।

ইংরাজ কবি পোপের নাম আমরা সকলেই জানি। তিনি বাল্যকালেও কবিতায় কথা কইতেন। পোপের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। একদিন তাঁর পিতা তার কবিতা বলার অভ্যাস সারাবার জন্য একটি ঘরে তাঁকে চাবি দিয়ে রাখলেন। সেই বন্ধ-করা ঘরের ভেতর থেকে খুলে দেবার জন্য বালক পোপ কাঁদতে কাঁদতে পিতাকে অনুরোধ করতে লাগলেন—

Pappa, pappa, pity take,
No more verses shall I make.

পোপ বলছেন কবিতা লিখব না। কিন্তু কবিতাটা তাঁর এমনি স্বাভাবিক ভাবে আসত যে তিনি কবিতাতেই বলেছেন—বাবা, তুমি আমার ওপর সদয় হও। আমি আর কবিতা লিখব না।

এক ইংরাজ লেখক বলেছেন ভগবদ্দত্ত প্রতিভা হল শতকরা দশ ভাগ ইনস্‌পিরেশান অর্থাৎ ভগবদ্দত্ত শক্তির অনুভূতি, আর নব্বই ভাগ পারস্‌পিরেশন অর্থাৎ পরিশ্রম। প্রতিভা হল ভগবানের দান। যারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয় প্রতিভা তাদের সহজাত। কিন্তু তার পরিমাণ অল্প। অঙ্কুর মাত্র। প্রাণপণ পরিশ্রমে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। প্রতিভা আপনি আপনি ফুটে ওঠে না।

জগদীশচন্দ্রও ভগবদ্দত্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি যতদিন শিক্ষালাভ করেছেন ততদিন তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয় নি। তিনি

যে প্রতিভার অধিকারী, তাও বোঝা যায় নি। কিন্তু লণ্ডন মেডিক্যাল কলেজে, কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান কলেজে সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়গুলি তিনি যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পড়েছেন তাতেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সূর্যোদয়ের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছিল। তাঁর জীবন সফলতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইংলণ্ড ও কেম্ব্রিজের শিক্ষা ব্যতীত কখনই জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ হত না।

শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপক মাইকেল ফসটার (Michael Foster) ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক ফ্রান্সিস বালফুর (বালফুর নামীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাই) তখন যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন। তিনি ছিলেন 'এমব্রাইয়োলজির (Embryologyর) অধ্যাপক। জগদীশচন্দ্র ধাতুবিদ্যা (Geology) শিখতেন অধ্যাপক হিউয়েস (Hughes) ও তাঁর স্ত্রীর নিকট। এই রকম কেম্ব্রিজে আরও অনেক জ্ঞানী গুণী অধ্যাপক ছিলেন।

কেম্ব্রিজে দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি তাঁর পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে নিলেন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। অধ্যাপক লেভিংসের (Liveings) রসায়নের শ্রেণীতে স্পেক্ট্রসকোপ যন্ত্রের উত্তেজনার বিষয় জগদীশচন্দ্র চিরদিন মনে রেখেছিলেন। অধ্যাপক ভাইন্‌সের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ক্লাসে জগদীশচন্দ্র যে বিশদ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা তার জীবনের সম্বল হয়েছিল। অধ্যাপক ফ্রান্সিস ডারউইনের উদ্ভিদের শারীরবিদ্যার জ্ঞান তাঁর জীবন সফল করেছিল। আর অধ্যাপক লর্ড র‍্যালের (Lord Rayleigh) রসায়নাগারে ধীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলি জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে মূলধন হয়েছিল।

ফাদার লাফোঁ জগদীশচন্দ্রের মনে বিজ্ঞানের যে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তাঁর অন্তরে বিজ্ঞানের যে রসধারার সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল বিজ্ঞানের বিরাট ও বিশাল গগনস্পর্শী দেবদেউল। নিঃশব্দে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপনার সঙ্গে মিলিত হল জগদীশচন্দ্রের অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। বৃক্ষ-শিশু আলো, বাতাস ও জল পেয়ে ভবিষ্যৎ মহীরুহের সূচনা করল।

কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান কলেজে জগদীশচন্দ্র যে রকম পরিশ্রম সহকারে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাতে তাঁর অধ্যাপকগণ তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এখানে তাঁর প্রতিভার কোন পরিচয় অবশ্য এত অল্প বয়সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি।

কেম্ব্রিজে ন্যাচারল সায়েন্সে তিনি ট্রাইপস পেলেন। একই সঙ্গে লণ্ডন থেকেও তিনি বি. এস. সি. ডিগ্রী পেলেন। তার জন্য তাঁকে আর কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় নি।

এখানে অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে, অধ্যাপক ভাইনস, অধ্যাপক ফ্রান্সিস, ডারউইন প্রভৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ চিরদিনই ছিল। সে হৃদ্যতা কোন দিন ম্লান হয় নি।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

কেম্ব্রিজে বিজ্ঞানে ট্রাইপস, লণ্ডনের বি. এস. সি (কলকাতার বি. এ তো তিনি ছিলেনই) হয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। দীর্ঘ চার বৎসর তিনি বিলাতবাস করেছেন। পিতামাতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি অধীর হয়ে পড়লেন।

এখন জগদীশচন্দ্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। পিতার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এইবার সংসারের আর্থিক অবস্থার চিন্তার কিছু লাঘব করা দরকার—এটা তিনি অনুভব করলেন।

আনন্দমোহন বসু ছিলেন জগদীশচন্দ্রের বড় ভগিনীপতি। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, অঙ্কে), পি. আর. এস। তিনি ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার। তার ওপর ব্যারিস্টার।

আনন্দমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ফসেট। তিনি ছিলেন লণ্ডনের পোস্টমাস্টার জেনারেল। জগদীশচন্দ্রকে তিনি চিনতেন। আবার ফসেটের বিশেষ বন্ধু ছিলেন লর্ড কিম্বারলি। তিনি ছিলেন ভারতসচিব। ফসেট লর্ড কিম্বারলিকে বললেন, ভারতে শিক্ষা বিভাগে কোন চাকরি খালি আছে কিনা? লর্ড কিম্বারলি এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রকে কোন সংবাদ দিতে পারলেন না। তিনি বললেন—ভারতবর্ষে গিয়ে খবর নাও।

অধ্যাপক ফসেট তখনকার ভারতের গবর্নর-জেনারেল লর্ড রিপনকে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি পত্র দিলেন।

ভারতে এসে জগদীশচন্দ্র সিমলায় গিয়ে লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করলেন। লর্ড রিপন জগদীশচন্দ্রকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। আর বললেন তিনি শিক্ষা বিভাগে তাঁর একটা চাকরির জন্য লিখবেন। কিন্তু

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা কইবার সময় তাঁর জীবনে হতাশায় তিক্ততার কথা প্রকাশ করে ফেললেন।

লর্ড রিপন বললেন—আমার জীবনটা এখানে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। আমি ভারতের সেবা করতে চেয়েছিলাম। ভারতবাসীকে অধিক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করব মনে করেছিলাম। তারপর ইলবার্ট ব্যাপারটা ঘটল। আমি কখনও মনে করিনি যে ইংরাজের উদারতার ভাব এই রকমে পরিত্যক্ত হবে।

জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই বাংলা গবর্নমেণ্টের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগে চাকরি দেবার জন্য আদেশপত্র পেয়েছেন।

শিক্ষা অধিকর্তা লর্ড রিপনের আদেশপত্র পেয়ে সন্তুষ্ট তো হনই নি, বরং অসন্তুষ্টই হয়েছেন। তিনি বললেন, আমার কাছে চাকরির জন্য যে অনুরোধপত্র আসে তা নিচে থেকেই আসে। ওপর থেকে আসে না। ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে উচ্চ গ্রেডের কোন চাকরি এখন খালি নেই। আমি তোমাকে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে একটা চাকরি দিতে পারি। পরে তুমি সেই চাকরি থেকে প্রমোশন পেতে পাব।

জগদীশচন্দ্র প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসেব চাকবি নিলেন না। তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

ভাইসরয় লর্ড রিপন দেখলেন তিনি যাকে চাকবি দেবার কথা বললেন তার চাকরি পাবার কথা তো গেজেটে কিছু প্রকাশিত হল না। তিনি চাকরি দিতে দেরি দেখে এই দেরির জন্য বাংলা গবর্নমেণ্টের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালেন।

ওপর থেকে শিক্ষা অধিকর্তার ওপর এইরকম চাপ আসাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ওপর থেকে আমার ওপর চাকরি দেবার জন্য তাগাদা আসছে। তিনি তাঁকে ওপরের গ্রেডে একটা অস্থায়ী চাকরি দিতে পারেন। কিন্তু তাঁকে ভবিষ্যতে চাকরিতে স্থায়ী করবার কিছু আশা দিতে পারেন না। যদি তিনি চাকরিতে সন্তুষ্ট করতে পারেন তবেই তিনি তাঁর চাকরিতে স্থায়িত্বের কথা চিন্তা করবেন।

শিক্ষা অধিকর্তার মনে ভারতবাসীর বিজ্ঞান বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার শক্তি-

সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল। দর্শন ও ভাষার বিষয়ে ভারতবাসী উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীদের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভের শক্তি ছিল না। অতএব বিজ্ঞানের শিক্ষক সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। গবর্নমেণ্ট এই মত পোষণ করতেন। শিক্ষাবিভাগও কঠোরভাবে এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষও এই নিয়োগে আপত্তি করলেন।

জগদীশচন্দ্রের জীবনে একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। সিভিল সার্ভিসে যারা পাস হত, ইউরোপীয়ই হোক আর ভারতবাসীই হোক, তাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠত না। পাস হলেই তারা চাকরি পেত। তাদের বেতন ও পদমর্যাদার কোন পার্থক্য করা হত না। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদে বিলেত থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এলেও যাকে তাকে নেওয়া হত না। কোন ভারতবাসীকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদে কখনও নিয়োগ করা হয়নি। ভারতীয় অধ্যাপক বিলেতী ডিগ্রি নিয়ে এলেও নিম্ন বেতনে প্রভিন্সিয়েল সার্ভিসে চাকরি পেতেন। তাঁরা একই কাজ করতেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল একই। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সময় পর্যন্ত ইংরাজের আমলে এই ছিল প্রচলিত রীতি। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস থেকে কোন ভারতবাসী উচ্চস্তরে ইংরেজের গ্রেডে চাকরি পেয়েছে, সে রকম ঘটনা কখনও দেখা যায় নি।

এই একই ঘটনা হয়েছিল বিখ্যাত রাসায়নিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি উপাধি নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে চাকরি পেলেন না। তখন এক প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া আর কোন কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি বেকার অবস্থায় বসে রইলেন। তিনি দার্জিলিং গিয়ে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ক্রফট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খোলা আছে। কেউ আপনাকে এই চাকরি নিতে বাধ্য করছে না।......এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডি. এস. সি কখনও প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে চাকরির জন্য লালায়িত হয় না।"

ইংরেজরা এইরকম করে আমাদের দেশের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের অপমান করে গিয়েছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তার তিন মাস পরেই প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব চলে যান। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কোন ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাড়াই কলেজের কাজ চালাতে হয়েছে। পরে তিনি রসায়নে নূতন আবিষ্কারে ইউরোপীয় খ্যাতি লাভ করেও ইউরোপীয় অধ্যাপকের গ্রেড পান নি।

সিভিল সার্ভিসে, জজিয়তীতে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় এক সঙ্গেই কাজ করেছেন। একমাত্র অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই এই পার্থক্যের ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে বিলেত থেকে অল্পবয়স্ক ইউরোপীয় অধ্যাপকদের এদেশে পাঠান হত। তাঁরা আগে মফস্বঃলের কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তারপর অভিজ্ঞ হয়ে উঠলে, যাঁদের চাকরি অনুমোদিত হত তাঁদের প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি করে আনা হত। কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ বলে বিবেচিত হত।

এই কলেজের ছাত্রদের ভাল মানুষ অথবা শান্ত শিষ্ট বলে কোন সুনাম ছিল না। তারা অধ্যাপকদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে সমালোচনা করত। উদ্ধত বলে তাদের দুর্নাম ছিল। একবার দুইজন ইংরেজ অধ্যাপক ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক এরকম আকার ধারণ করেছিল যে গবর্নমেণ্ট ব্যাপারটি অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিল। এই অবস্থায় অন্য অধ্যাপক হলে ভীত হতেন কিন্তু জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন। তিনি একটুও ভীত হন নি। এবং তাঁর ভীত হবার কোন কারণও ঘটে নি।

জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিলেন তখন একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক যে বেতন পেতেন তিনি তার দুই-তৃতীয়াংশ বেতন পেলেন। তার ওপর তিনি অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর বেতন ছিল তারও অর্ধেক। অর্থাৎ এই পদের যা বেতন জগদীশচন্দ্র তার এক-তৃতীয়াংশ পেলেন।

প্রথম থেকেই জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন যে তাঁকে যে কাজ করতে বলা হবে সে কাজ তো তিনি করবেনই, তার ওপর তিনি বেশীও করবেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি স্থির করলেন যে যতদিন তিনি এই চাকরিতে থাকবেন ততদিন ভারতীয় অধ্যাপকগণের মর্যাদা যাতে উন্নত হয় তিনি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। দেশবাসী সহকর্মীদের প্রতি কর্তব্য ও ব্যক্তিগত সম্মানবোধ

একত্র করে তিনি কাজ করে যাবেন। গভর্নমেণ্ট যখন তাঁকে ইউরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ দিতে লাগলেন তখন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। এবিষয়ে তাঁর প্রতিবাদে যখন কোন ফল হল না তখন তিনি স্থির করলেন যে তাঁর বেতনের একটি কপর্দকও তিনি স্পর্শ করবেন না। চাকরির প্রথম তিন বৎসর তিনি বেতন নেন নি। তার জন্য তিনি যে আর্থিক কষ্ট সহ্য করেছেন তা বর্ণনা করা অসম্ভব। কেবল তাঁর স্ত্রীর সহানুভূতি ও উৎসাহেই তিনি এই দুঃখ ও দারিদ্র্যের তাড়না সহ্য করতে পেরেছেন।

পিতৃ ঋণ পরিশোধ

জগদীশচন্দ্রের দুঃখ ও বিড়ম্বনার এইখানেই শেষ নয়। তাঁর পিতা যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি কাজ আরম্ভ থেকেই লাভজনক হয়ে উঠেছিল। তার একটি হল পিপলস ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কই কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রথম পদক্ষেপ। পিপলস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অধিকাংশ শেয়ার ভগবানচন্দ্রকেই কিনতে হয়েছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। পরে এই ব্যাঙ্ক একটা বেশ উন্নত ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছিল। ভগবানচন্দ্র যদি এই শেয়ারগুলি রাখতেন তাহলে এর আয় থেকে তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর অন্তরের অত্যধিক উদারতাই তাঁর দোষে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাঁর শেয়ারগুলি তাঁর স্বল্পবিত্ত বন্ধুদের সুবিধার জন্য বিক্রি করে দেন।

ভগবানচন্দ্রের স্থাপিত শিল্প ও কৃষি বিষয়ক যে প্রতিষ্ঠানগুলি আরম্ভ থেকেই লাভজনক হয়ে ওঠেনি সেইগুলিই তাঁর ঘাড়ে পড়ে। তা ছাড়া ভগবানচন্দ্র তাঁরই মত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিলেন—এমন কয়েকজন ব্যক্তির জামিন হয়েছিলেন। সেই অর্থের দায়িত্বও ভগবানচন্দ্রের ওপরই পড়ে। অতএব জগদীশচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে তাঁর পিতাকে ঋণভার থেকে মুক্ত করা তাঁর একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়টি তিনি নিজের হাতে নিলেন।

তিনি দেশে চলে গেলেন। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত যে সমস্ত পৈতৃক বিষয় ছিল তিনি সব বিক্রি করে দিলেন। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সমস্ত বিষয় হস্তান্তরিত করা যে কতদূর দুঃখ ও বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁদের আত্মীয়স্বজন সকলেই জগদীশচন্দ্রকে এ

কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দিলেন। তাতে যে টাকা পেলেন তাই দিয়ে পিতার ঋণ শোধ করলেন। এই টাকায় সমস্ত ঋণের অর্ধেক শোধ হল।

বাকী অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করবার জন্য তিনি তাঁর জননীর আশ্রয় নিলেন। তাঁকে অর্থ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কারণ স্ত্রীধন স্বামী অথবা কোন উত্তমর্ণ স্পর্শ করতে পারে না। জননীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে উত্তমর্ণের আরও সিকি ভাগ ঋণ পরিশোধ হল। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর জননীর এই ত্যাগ ও মহত্ত্বে উত্তমর্ণগণ একান্ত অভিভূত হলেন। তাঁরা এই অর্থ পেয়েই সমস্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হল বলে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র এ কথা শুনলেন না। তিনি এর পর ন' বৎসর কঠোরভাবে দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে নিজের আয় থেকে বাকী ঋণ শোধ দিয়ে পিতৃঋণমুক্ত হলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন সেইদিন হতেই তাঁর অধ্যাপনার শক্তি প্রতিষ্ঠায় ও ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন অসুবিধা হয়নি। নিয়মিতভাবে ক্লাসে উপস্থিত থাকবার জন্য ছাত্রদের নাম ডেকে উপস্থিত বা অনুপস্থিত লেখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন হত না। কারণ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের পরীক্ষা দেখবার জন্য ছাত্রদের মনে একান্ত বাসনা জেগে উঠত। তার জন্য ক্লাসের সামনে বসবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যও সেই অবস্থা হত। তাঁর পড়াবার গুণে ছাত্রদের পড়া মুখস্থ করবার কোন প্রয়োজন হত না। জগদীশচন্দ্র এত সুন্দর ও বিশদ করে বিজ্ঞান বুঝিয়ে দিতেন ও পরীক্ষা দেখাতেন যে বিষয়টি ছাত্রদের মনে গেঁথে যেত। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তাঁর প্রথম যুগের ছাত্রদের মুখে শুনেছি যে তিনি কোন বিষয় বিশদ করে বুঝিয়ে দিয়ে সেই বিষয়টি পরীক্ষা করে যখন চোখের সামনে দেখিয়ে দিতেন সেই জিনিসটি তাঁদের মনের মধ্যে ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে যেত। সে জিনিস তাঁরা আর কোনদিন ভুলতে পারেন নি। অতএব পরীক্ষার সময় সে বিষয়গুলি ছাত্রদের আর রাত জেগে পড়তে হত না।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বৎসর অস্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন। এই তিন বৎসর তাঁর অধ্যাপনার পর কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি ও শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট তাঁর অধ্যাপনার কাজের মূল্য বুঝতে পারলেন। তাঁর প্রকৃতিও বুঝতে পারলেন। এর পর থেকে তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বন্ধু বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা বুঝেছিলেন যে জগদীশচন্দ্র তাঁর রীতিনীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আর জগদীশচন্দ্রও বুঝেছিলেন যে কোন ইউরোপীয়ের সঙ্গে চলতে হলে তাদের সামনে সমান তালেই পা ফেলে চলতে হবে। তাহলেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শিক্ষা অধিকর্তা ক্রফটের এই মত পরিবর্তনের ফলে গবর্নমেণ্ট বিশেষ আদেশ দিয়ে তিন বৎসর পরে জগদীশচন্দ্রের চাকরি স্থায়ী করলেন। আর গবর্নমেণ্ট তাঁকে তিন বৎসরের পুরা বেতন দিলেন। এই তিন বৎসর তিনি কোন বেতন নেন নি। সুতরাং এই তিন বৎসরের পুরা বেতন তিনি এক সঙ্গে পেলেন। সমস্ত টাকাটা তিনি পিতার উত্তমর্ণদের দিয়ে দিলেন। বাকী ঋণ তিনি এর পর ছ' বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করেন।

এই ঋণ পরিশোধের পর তাঁর পিতা আর এক বৎসর জীবিত ছিলেন। আর তাঁর স্নেহময়ী জননী আর দু'বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁরা কেউই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কিছুই দেখে যান নি।

বহুকাল পরে ফরিদপুরে যে মেলা তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে ফরিদপুরবাসিগণ জগদীশচন্দ্রকে সভাপতির ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। জগদীশচন্দ্র সেখানে যে ভাষণ দেন তার নাম দেন "অকৃতকার্যতার মহত্ত্ব"।

ফরিদপুরের মেলায় সভাপতির বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন—

"অকৃতকার্যতা? হ্যাঁ, কিন্তু হীন নয়, নিষ্ফলও নয়। এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে তাঁর পুত্র এই শিক্ষালাভ করেছে যে কৃতকার্যতা বা বিফলতা একই। আর বুঝেছে যে কোন কোন বিফলতা কৃতকার্যতা অপেক্ষাও মহত্তর। আমার কাছে তাঁর জীবন আশীর্বাদস্বরূপ। আর তার জন্য তাঁকে আমি প্রতিদিন প্রণাম করি।" প্রত্যেকেই বলেছেন যে জীবনে তিনি উন্নত হতে পারতেন কিন্তু তাঁর জীবন তিনি ধ্বংস করেছেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই বোঝেন যে

অসংখ্য জীবনের কঙ্কাল থেকেই বিরাটত্ব গড়ে উঠেছে। এই রকম একটা জীবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে বহু জীবন গড়ে উঠবে—যা ভবিষ্যৎ ভারত গঠন করবে। এটা কেন ঘটে তা আমরা জানি না। কিন্তু এটা জানি যে ধরিত্রী চান ত্যাগের মহত্ত্ব।"

যাঁদের স্নেহ, ভালবাসা তাঁর জীবন পূর্ণ করে রেখেছিল, যাঁদের স্নেহ ভালবাসা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল ছিল তাঁদেরই নিকট থেকে তিনি তাঁর জীবনে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর জনক জননী তো ছিলেনই, তা ছাড়া তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও হিতকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁকে ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁর নূতন আবিষ্কারের কথা প্রচার করবার জন্য যথেষ্ট অর্থও সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্রকে তাঁর জীবন-সংগ্রামে যে কঠোরভাবে লিপ্ত হতে হয়েছিল তা তিনি তাঁর অধ্যাপক জীবনকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য অথবা তাঁর পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য করেন নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর, জগদীশচন্দ্র পঞ্চত্রিংশ জন্মদিনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর জীবন নব নব জ্ঞান অন্বেষণে উৎসর্গ করবেন।

এই প্রতিজ্ঞা করার তিন মাসের মধ্যে তিনি বৈদ্যুতিক আলোকবিকিরণ (electric radiation) সম্বন্ধে প্রথম নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তখন তাঁর কোন পরীক্ষাগার ছিল না। শুধু একজন অশিক্ষিত টিনের মিস্ত্রীকে সম্বল করে, তাঁর নিজের বর্ধমানে অর্জিত সূক্ষ্ম কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে তাকে নির্দেশ দিয়ে তিনি এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা যখন প্রচার হল তখন চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এক বৎসরের মধ্যে বিলেতের রয়াল সোসাইটি তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী প্রকাশের ভার নিলেন। শুধু তাই নয়; তাঁর এই নূতন আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য বিলেতের পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্জুর অর্থ থেকে তাঁকে সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। আর এই নূতন আবিষ্কারের জন্য কোন পরীক্ষা না করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টর অফ সায়ান্স" উপাধিতে ভূষিত করলেন।

STATIONS.
HATFIELD PEVEREL STN.
WITHAM STN.

Nov 11/95

TERLING PLACE,
WITHAM, ESSEX.

Dear Prof Bose,

I communicated your last paper to the Roy. Soc., & I hope ~~that it~~ it may soon be read.

You speak of being much hampered for ~~other~~ want of funds. It seems

to me that
possibly some
help might
be given you
for apparatus
from the "Govern-
ment Grant
Fund" admin-
istered by the
Royal Society,
or if only a
small sum
(under £20)
were needed
from the "Don-

ation Fund".
I will ask
Mr. Rix to send
you a form of
application
in case you
are disposed
to try.
yrs faithfully
Rayleigh

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে রয়্যাল সোসাইটিতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধাদি
প্রেরণ করার পর তাঁকে যে চিঠি লেখেন তার প্রতিলিপি

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কেলভিন তাঁকে একখানা চিঠিতে তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁর অভিনন্দন জানালেন।

"আমার অন্তর সত্যকার বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি যে সমস্ত কঠিন ও অদ্ভুত বিষয় সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন আর তাতে যে পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছেন তার জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।*

জগদীশচন্দ্রের এই বৈদ্যুতিক আলোকের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কর্ন্যু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে লিখেছিলেন—

"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। দু হাজার বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষেরা মানবসভ্যতায় অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগতের সামনে প্রজ্জলিত করেছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের গৌরবকীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করুন।"

কর্ন্যু জগদীশচন্দ্রকে আর একখানা চিঠি লিখে তাঁর মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।†

* "I am literally filled with wonder and admiraton : allow me to ask you to accept my congratulations for so much success in the difficult and novel experimental problems which you have attacked". Lord Kelvin.

† M. Cornu, the President of the French Academy of Science and a veteran leader in this field of physics wrote ;—

"The very first results of your researches testify to your power of furthering the progress of science. For my own part, I hope to take full advantage of the perfection to which you have brought your apparatus, for the benefit of Ecole Polytechnique and for the sake of further researches I wish to complete,"

বিদ্যুৎ তরঙ্গ

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে জগদীশচন্দ্র দেখলেন, ঈথরের যে ঢেউ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি হয়, সেই ঈথরের ভেতর দিয়েই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিচালিত হতে পারে। এই বিষয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা না করেই বিজ্ঞানকে গণিতের গণ্ডির মধ্যে ফেলে ম্যাক্সওয়েল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে হার্জ যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাক্সওয়েলের তথ্য অনুসারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন। তাতে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এর দু' বছর আগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি কলেজে তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের হার্জের এই সব পরীক্ষা দেখাতে লাগলেন।

পৃথিবীর ওপর বাতাস অল্প দূর গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরে যে সব সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ রয়েছে তাদের কাছ থেকে তো আমরা আলো পাচ্ছি। কি করে আমরা এই আলো পাই ?

বিজ্ঞানীরা কল্পনা করলেন যে স্থান জল, স্থল, বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আর যেখানে জল, স্থল, বাতাস নেই সেই মহান শূন্য স্থানও ব্যেপে একটা কিছু আছে। এই যে একটা কিছু, এর নাম দেওয়া হল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না। শুধু এইটুকু ধরে নেওয়া হল যে ঈথর কাঁপে। তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলে এবং এই তরঙ্গ আমাদের চোখে পড়ে আমাদের আলোকের অনুভূতি জাগায়। কিন্তু এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেমন বায়ুর কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলে তবেই সেটা আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি জাগায়, তেমনি সকল কম্পন চোখে আলো রূপে দেখা যায় না। কম্পনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমায় থাকলে তবেই সেটা আমাদের কাছে আলো বলে মনে হয়। সেকেণ্ডে চার শ' লক্ষ কোটি কম্পন লাল আলো বলে মনে হয়। তার দ্বিগুণ সংখ্যার অর্থাৎ আটশ লক্ষ কোটি কম্পন বেগুনী আলো বলে মনে হয়। অন্যান্য রঙের আলোর কম্পনসংখ্যা এই দুই সীমার মধ্যে।

কম্পনসংখ্যার বদলে যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করা যায় তা হলে লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল একটা ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। আর বেগুনী রঙের হল এরও অর্ধেক।

হার্জ তড়িতের সাহায্যে ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন করলেন। সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েকশ গজ। কিন্তু এ তরঙ্গ তো চোখে দেখা যাবে না। এই অদৃশ্য আলোর অস্তিত্ব তবে জানা যাবে কি করে? হার্জ তারও একটা ব্যবস্থা করলেন। হার্জ বিজ্ঞানের এক নতুন দিক খুলে দিলেন। কিন্তু খুলে দিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। এর পরের অধ্যায় আরম্ভ করলেন জগদীশচন্দ্র।

দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক

হার্মোনিয়াম থেকে 'সা' স্বর শুনতে পেলাম। তারপর বেরুল 'রে'। দুই স্বরই বাতাস-তরঙ্গ থেকে উঠল। প্রথমটার কম্পন-সংখ্যা কম। দ্বিতীয়টার বেশী। তেমনি হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন আর সাধারণ আলোক উভয়ের গোত্র এক। উভয়ই ঈথর-তরঙ্গ। তবে তাদের রং আলাদা। প্রথমটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশি। দ্বিতীয়টার কম। কিন্তু দুই যে এক গোত্রীয় সে কথা প্রমান হবে কি করে?

আলোর কতকগুলো ধর্ম আছে।

প্রথম হল—আলো সোজা পথে চলে। সোজা পথে চলে বলে আলো অনচ্ছ পদার্থের ছায়া ফেলে।

দ্বিতীয়—আলো প্রতিফলিত হয়।

তৃতীয়—আলোর প্রতিসরণ আছে। অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ পদার্থের ভেতর প্রবেশ করে আলো বেঁকে চলে।

চতুর্থ—আলোক তরঙ্গের কোন শৃঙ্খলা নেই। এই তরঙ্গগুলো কতক ওপর-নীচে, কতক ডাইনে-বামে এলোমেলো ভাবে কম্পিত হয়ে চলে। কিন্তু কতকগুলি স্ফটিক আছে যার মধ্য দিয়ে আলো গেলে এই বহুমুখ কম্পন একমুখ হয়ে দাঁড়ায়।

হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করলেন সেটা যদি দৃশ্য আলোকের এক-গোত্রীয় হয় তবে দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক দুয়েরই ধর্ম এক হবে। দৃশ্য আলোকেরই কয়েকটা ধর্মের কথা তো দেখা গেল। এই ধর্ম অদৃশ্য আলোকে

আছে কি না হার্জ পরীক্ষায় মীমাংসা করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হার্জের পরীক্ষায় অনেক বাধা দেখা দিল।

প্রথম বাধা হল—আলো সোজা পথে অনচ্ছ পদার্থের যে ছায়া ফেলে হার্জের পরীক্ষায় তা দেখান সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কেন?

তার কারণ হল এই যে, যে ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড়, তার ছায়া পড়ে না। যেমন জলের ঢেউয়ের সামনে একখানা ছোট পাথর ধরলে, পাথরের পেছনেও ঢেউ দেখা দেয়। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে ছায়া পড়ে। হার্জের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়। সুতরাং এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা কোন কোন অনচ্ছ পদার্থের পেছনে ছায়াপাত পরীক্ষা সম্ভব নয়। প্রতিফলন, প্রতিসরণ পরীক্ষা হার্জ দেখালেন বটে, কিন্তু এই সব পরীক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক হতে পারল না। হার্জের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশী—এই হল প্রথম কারণ।

আর দ্বিতীয় কারণ হল—যে যন্ত্র এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবে, তা সূক্ষ্ম ধরনের নয়। একটু দূরে রাখলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরা যায় না। জগদীশচন্দ্র হার্জের প্রবর্তিত যন্ত্রের দুই ভাবে উন্নতি সাধন করলেন। হার্জের বৈদ্যুতিক উর্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক গজ। আর জগদীশচন্দ্রের তৈরি যন্ত্র থেকে যে বৈদ্যুতিক উর্মি বেরিয়ে এল তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম—এক ইঞ্চির ছ' ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এই তরঙ্গ ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র এক নূতন ধরনের উপায় অবলম্বন করলেন। এক খণ্ড গ্যালিনার (galena) ওপর একটা সরু তার এসে ঠেকেছে আর কিছু নয়। এই হল ধরবার যন্ত্র। এখানে বলা যেতে পারে যে বর্তমান যুগে বিনা তারে বার্তা ধরবার যুগান্তর এসেছে তার মধ্যে ক্রিস্টাল সেটে (crystal set) তরঙ্গ ধরবার ব্যবস্থায় জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত গ্যালিনা ডিটেকটর (galena detcetor) ঠিক এইভাবে কাজ করেছে।

এইবার জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। যে লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছিল তার মুখে একটা নল লাগিয়ে সেই নলের সামনে সোজা লাইনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার তাঁর নূতন ধরনের যন্ত্র, কৃত্রিম চোখ লাগিয়ে জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে ঐ চোখের ভেতর কাঁটা নড়ে উঠল। এই কৃত্রিম চোখ তিনি এক পাশে ধরলেন। তাতে কোন্ উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল না। অতএব অদৃশ্য আলো যে সরল পথে যায় তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল।

তারপর আলো যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিফলিত রশ্মি কয়েকটা নিয়ম পালন করে, জগদীশচন্দ্র দেখালেন অদৃশ্য আলোও ঠিক সেই রকম করে। কাঁচের ভেতর দিয়ে যেতে দৃশ্য আলো যেমন বেঁকে যায়, অদৃশ্য আলোও ঠিক তাই করল। কিন্তু এইসব পরীক্ষা করতে করতে তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ। জল স্বচ্ছ। ইটপাটকেল অনচ্ছ। আলকাতরাও অনচ্ছ। এই অদৃশ্য আলো কিন্তু জলের ভেতর দিয়ে যায় না। অথচ ইটপাটকেল, আলকাতরার ভেতর দিয়ে অবাধে চলে যায়।

দৃশ্য আলো কাচের ভেতর ঢুকে বেঁকে যায়। হীরের মধ্যে দৃশ্য আলো আরও বেশী বাঁকে। আর এই জন্য আলো ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কাঁচের চেয়ে হীরের বেশী। এই জন্যই হীরে এত উজ্জ্বল দেখায়। তাই হীরের এত দাম।

জগদীশচন্দ্র দেখলেন যে দৃশ্য আলো সম্বন্ধে হীরের যে ক্ষমতা, অদৃশ্য আলো সম্বন্ধে চীনামাটির ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী। কল্পনায় মনে করা যাক যে এই অদৃশ্য আলো একদিন মানুষের চোখের দৃষ্টিগোচর হল। তখন মানুষের কাছে চীনামাটির বাসন হীরের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল দেখাবে।

জগদীশচন্দ্র এর পর যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে বৈজ্ঞানিক জগৎ আরও বিস্মিত হয়ে গেল। সাধারণ আলোক-তরঙ্গ সর্বমুখ। তবে টুর্মালিন (Taurmaline) প্রভৃতি স্ফটিকের ভেতর দিয়ে গেলে আলোকতরঙ্গ একমুখ হয়ে বেরিয়ে আসে। এই আলোর সামনে যদি আর একখানি টুর্মালিন আগের মত ধরা যায় তাহলে এর মধ্য দিয়ে ঐ আলো যাবে। কিন্তু টুর্মালিন যদি আড় করে ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়ে ধরা যায়, তাহলে আলো ওর ভেতর দিয়ে যাবে না।

আলোর এই ধর্মটা বোঝাবার জন্য জগদীশচন্দ্র একটা উপমা দিতেন। মনে করা যাক, একটা ঘরে কতকগুলো বক ও কচ্ছপ আছে। বকগুলোর দেহ উপর নিচে লম্বা। আর কচ্ছপের দেহ আড়াআড়ি লম্বা।

ঘরের দরজা বন্ধ। জানালার গরাদেগুলি উপর নিচে লম্বা। জন্তুগুলোকে তাড়া দিলে বকগুলো লম্বা গরাদেগুলোর ভেতর দিয়ে বার হয়ে আসবে। কচ্ছপগুলো আটকা পড়বে।

বকগুলো বাইরে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরের গরাদেগুলি যদি আগের ঘরের মত খাড়াভাবে থাকে তাহলে এ ঘর থেকে বকগুলো বেরিয়ে আসবে। আর তা না হলে গরাদগুলি যদি আড়াআড়িভাবে থাকে তা হলে

বকগুলো এ ঘরে আটকা পড়বে। টুর্মালিন (taurmaline) দ্বারা আলোয় যে ব্যাপার ঘটে দৃশ্য আলো আর অদৃশ্য আলো যদি একজাতীয় হয় তাহলে অদৃশ্য আলোতেও ঐ রকম ঘটনা দেখা যাবে। জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রেও এই দেখালেন। দৃশ্য আলো সম্বন্ধে টুর্মালিন যা করে, তিনি দেখালেন যে অদৃশ্য আলো সম্বন্ধে তার বেশী কিছু নয়। অনেক পাতার একখানা মোটা বই ঠিক তাই করে থাকে। যে লণ্ঠন থেকে অদৃশ্য আলো বেরুচ্ছিল তার সামনে একখানা মোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ধরা হল—ক্যালেণ্ডারখানা ধরা হল লম্বালম্বি। ওদিকে কৃত্রিম চোখের সামনেও আর একখানি ক্যালেণ্ডার ঠিক একই ভাবে ধরা হল। কৃত্রিম চোখের কাঁটা ঘুরল। কিন্তু প্রথম ক্যালেণ্ডারটি ঠিক রেখে যেই দ্বিতীয় ক্যালেণ্ডারটি ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়ে আড়াআড়িভাবে ধরা হল, অমনি কৃত্রিম চোখ আর সাড়া দিল না। এখন দ্বিতীয় ক্যালেণ্ডার থেকে কোন তরঙ্গ আর বার হয়ে এল না। দৃশ্য আলো সম্বন্ধে টুর্মালিনে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

দৃশ্য আলো ও অদৃশ্য আলো যে এক জাতীয়, জগদীশচন্দ্র তা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করলেন। জগদীশচন্দ্রের এই মৌলিক আবিষ্কারের অসাধারণ প্রতিভায় সকলেই মুগ্ধ হলেন।

মৌলিক গবেষণা

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কার তিনি ব্যক্তিগত আনন্দ হিসাবে নেননি। কাজের পুরস্কার হিসাবে নিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রাচ্যবাসীরা বিজ্ঞানে অপারগ নয়। তিনি পাশ্চাত্য জগতের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্যের এই কলঙ্ক মোচন করতে চেয়েছিলেন।

এই সময় তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবেন যেখান থেকে এ দেশবাসী বিজ্ঞানে সর্ববিষয়ে মৌলিক গবেষণা দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করবে। তিনি বিজ্ঞানে গবেষণা করতে গিয়ে যে সব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি চেয়েছিলেন যে অপরের সেইসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু এজন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাতে তিনি অপমানিত বোধ করতেন। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রী শ্রীমতী অবলা বসু এখন থেকেই সাংসারিক

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

প্রথম যৌবনে জগদীশচন্দ্র

সহধর্মিণী অবলাদেবী

আর্থিক কষ্ট সহ্য করেও এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যকে আবার গড়ে তুলতে চাইলেন। তাঁরা উভয়ে পঁচিশ বৎসর ধরে একটা গবেষণাগার গড়ে তোলবার জন্য ধীরে ধীরে কাজ করে গিয়েছেন।

তদানীন্তন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এদেশে এদেশবাসীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষা বিভাগের ধারণা ছিল যে প্রাচ্য জগতে বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণা এদেশবাসীর দ্বারা সম্ভব নয়।

জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণা করে শিক্ষাবিভাগে তাঁর দুজন বন্ধু পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর গবেষণায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একজন হলেন কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি। আর দ্বিতীয় হলেন শিক্ষা অধিকর্তা স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট্। কিন্তু তাঁরা উভয়েই কাজ থেকে অবসর নিয়ে যাচ্ছেন। অপরে ছিলেন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরোধী। শিক্ষা বিভাগের ধারণা ছিল যে কলেজের অধ্যাপকের প্রধান ও একমাত্র কাজ হল ছাত্রদের ক্লাসে পড়ান। এ ছাড়া অধ্যাপকের আর অন্য কাজ থাকতে পারে না। সুতরাং অধ্যাপকের পক্ষে মৌলিক গবেষণা করতে যাওয়ার অর্থই হল অধ্যাপনার কাজের ক্ষতি। আর সময়ের অপব্যয়।

কলেজে জগদীশচন্দ্রকে সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘণ্টা অধ্যাপনা করতে হত। অন্য অধ্যাপকদের এর চেয়ে কম সময় অধ্যাপনা করতে হত। অধাপনার কাজ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে করেও তিনি কলেজের ছুটির পরে গবেষণা করতেন। গবেষণার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট কোন অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না। জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের বেতন থেকে তাঁর সহকারীর বেতন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতেন।

জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা যে পাশ্চাত্য জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে— এ বিষয় তখনকার ছোটলাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের কথা জানতেন। এদেশে অধ্যাপকগণের শুধু অধ্যাপনা ব্যতীত আর কিছু করবার ছিল না। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অসুবিধার কথা বুঝেছিলেন। সুতরাং তিনি উচ্চবেতনে জগদীশচন্দ্রের জন্য একটি নূতন পদ সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাতে তাঁর গবেষণা করবার জন্য তিনি যথেষ্ট অবসর পাবেন। এই পদে নিযুক্ত হলে তিনি গবর্নমেণ্ট কলেজসমূহে পরীক্ষাগার সৃষ্টি করবেন এবং মৌলিক গবেষণাকারী ছাত্রগণকে সাহায্য

করবেন। এই পদ সৃষ্টি হল। জগদীশচন্দ্রকে জানান হল যে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে এই পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

কিন্তু এই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে তাঁর সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। গবর্নমেণ্ট তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছিলেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন ফেলোই ছিলেন গবর্নমেণ্টের নির্বাচিত। সুতরাং গবর্নমেণ্ট মনে করতেন, যাঁরা তাদের নির্বাচিত ফেলো তাঁরা তাঁদের মতই অনুসরণ করবেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। যখন তাঁর নূতন পদ সৃষ্টি হয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে সেই সময় একটা বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিবেচনার জন্য উঠল। গবর্নমেণ্ট সে বিষয় একটা নির্দিষ্ট মত পোষণ করছিলেন। গবর্নমেণ্ট নির্বাচিত অধিকাংশ সভ্যই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সেনেটের সভায় উপস্থিত থেকেও গবর্নমেণ্টের দিকে ভোট দিলেন না। তার ফলে তাঁর জন্য সৃষ্ট অধিক বেতনের নূতন পদ তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে গেল। সে পদ তিনি আর পেলেন না।

পরে আর একটা ঘটনা ঘটে। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি তাঁকে জানান যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সভায় একটা বিষয় আলোচ্য সূচীতে বিবেচনার জন্য আসছে। সে বিষয় গবর্নমেণ্ট একটা বিশেষ মত পোষণ করেন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় উপস্থিত হন নি। তার জন্য গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালেন।

জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে একখানা চিঠিতে জানতে চাইলেন যে গবর্নমেণ্ট কি মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় উপস্থিত হয়ে গবর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাঁকে যে বিষয়ে যে ভাবে ভোট দিতে বলবেন, তাঁর সুনির্বাচিত মত যাই হোক না কেন, তাঁকে সেই দিকে ভোট দিতে হবে? যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করলে, গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো হিসাবে কর্তব্য করা হচ্ছে না, তাহলে তাঁকে এই ফেলো পদ ত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হোক।

ছোটলাটের বিবেচনার জন্য এ বিষয়টি তাঁর কাছে উপস্থাপিত করা হল। তিনি জগদীশচন্দ্রের মত অনুমোদন করলেন। কিন্তু ছোটলাট শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাদের জগদীশচন্দ্রকে নূতন পদে নিয়োগের বিরুদ্ধতাকে জয় করতে

পারলেন না। তিনি কিন্তু স্থির করলেন যে জগদীশচন্দ্র মৌলিক গবেষণা করে ভারত গবর্নমেণ্টেরই সম্মান বাড়িয়েছেন। সুতরাং এই গবেষণায় তিনি নিজে থেকে যে অর্থ ব্যয় করেছেন সে অর্থ গবর্নমেণ্টেরই দেওয়া উচিত। জগদীশচন্দ্রকে জানান হল যে তিনি তাঁর গবেষণায় যে অর্থ ব্যয় করেছেন, গবর্নমেণ্ট সেটা তাঁকে দিতে চান। কিন্তু তার উত্তরে জগদীশচন্দ্র গবর্নমেণ্টকে জানালেন যে গবর্নমেণ্টের এই বিবেচনার জন্য তিনি গবর্নমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি অতীতে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তার জন্য কোন অর্থ নিতে সম্মত নন। তখন গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভবিষ্যতে যে গবেষণা করবেন, তার জন্য তাঁকে বার্ষিক ২৫০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে।

গবর্নমেণ্ট তাঁকে মৌলিক গবেষণায় অর্থ সাহায্য দিয়ে উৎসাহ দিলেন বটে কিন্তু তিনি কলেজে সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘণ্টা পড়িয়ে গবেষণা করবেন কখন? কলেজে অধ্যাপনার পর তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামের সময় গবেষণা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

গবর্নমেণ্ট তাঁর কর্মের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন বটে কিন্তু যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের সুবিবেচিত মতের বিরুদ্ধে গবর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আদেশ অনুসরণ করতে পারেন নি বলে তাঁর জন্য উচ্চ পদ সৃষ্টি করেও তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলেন। এ জন্য জগদীশচন্দ্র অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন।

* * * *

জগদীশচন্দ্র একদিন ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজে খুব উৎসাহী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। জগদীশচন্দ্রের এক বৎসরের ফার্লো পাওনা হয়েছে। তিনি ছোটলাটের কাছে ইউরোপ গিয়ে পাশ্চাত্য জগতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এক বৎসরের ফার্লো চাইলেন।

তার উত্তরে ছোটলাট বললেন, পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে আপনার গবেষণার সুবিধা হবে বটে কিন্তু এই পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণে আপনার যে অর্থব্যয় হবে সেটা খরচ করা কি সুবিবেচনার কাজ হবে?

জগদীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করলেন, গবর্নমেণ্ট কি তাঁকে ইউরোপে বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ডেপুটেশনে পাঠাতে পারেন না ?

ছোটলাট বললেন, ভারত গবর্নমেণ্ট কেবলমাত্র শিক্ষা বিষয়ে ডেপুটেশনে পাঠানর ব্যয়ভার বহন করবেন না।

সিমলায় শিক্ষাবোর্ড সম্প্রতি একটা প্রস্তাব করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে গবর্নমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারত বিজ্ঞান শিক্ষা বা আলোচনায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করে নি।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা পাশ্চাত্ত্য জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তার ফলে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যে গবেষণা করছেন ভারতে তার যথেষ্ট প্রচার হয়েছে। তা সত্ত্বেও গবর্নমেণ্ট যে তাঁর বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার ওপর অবিচার করেছেন এবং তার কোন মূল্য দিতে চান না সে কথা জগদীশচন্দ্র লাটসাহেবকে বললেন। শিক্ষা বোর্ড মুখে ভারতবাসীকে বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বলেছেন বটে কিন্তু অন্তরে এর ওপর তাঁদের বিদ্বেষ রয়েছে।

লাটসাহেব একজন স্বাধীনচেতা ভারতবাসীর মুখ থেকে এরকম স্পষ্ট কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব তিনি এইখানেই তাঁর আলোচনা বন্ধ করলেন। সুতরাং এই আলাপে কোন ফল হল না।

জগদীশচন্দ্র লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন। বিফল হয়ে পরদিন তিনি দার্জিলিং থেকে ফিরে আসছেন। দার্জিলিং স্টেশনে জগদীশচন্দ্র ট্রেনে উঠতে যাচ্ছেন। শিক্ষা অধিকর্তার একজন চাপরাশী সেই সময় তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিল। তাতে লেখা ছিল—লাটসাহেব নিজের দায়িত্বে জগদীশচন্দ্রকে ছ'মাসের জন্য ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের ডেপুটেশনে পাঠাতে স্থির করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর সুবিধামত যে কোন দিন ইংলণ্ড যাত্রা করতে পারেন। লাটসাহেব এ বিষয়ে ভারত গবর্নমেণ্ট ও লণ্ডনে ভারত-সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

শিক্ষা অধিকর্তা বিলেতে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে যে চিঠি লিখলেন, তাতে লেখা হল—"ডাঃ বসু যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাদান করেন তাই নয় তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যথেষ্ট কাজ করেছেন। তাঁকে সাহায্য করলে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানসাধনাকে সাহায্য করা হবে। আমার মনে হয় তাঁকে সাহায্য করা গবর্নমেণ্টের কর্তব্য।"

আর লাটসাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করে লিখলেন—"ডাঃ বসুর মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা সম্বন্ধে তাঁর দ্বারা যতদূর সম্ভব তিনি করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে তাঁকে সাহায্য করা মহান গবর্নমেণ্টের কর্তব্য, বিশেষ করে যখন এত বড় একজন গুণী লোক গবর্নমেণ্টের চাকরিতে রয়েছেন। ডাঃ বসুর ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণার সঙ্গে যোগাযোগ করা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।"

একাদিক্রমে মৌলিক গবেষণা ও নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা এতদিনে জগদীশচন্দ্র গবর্নমেণ্টের নিকট হতে সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করলেন।

অবলা দেবী

জগদীশচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ পান। তিন বৎসর পরে যখন তাঁর পদ পাকা হল তখন (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) জগদীশচন্দ্রের সহিত অবলা দেবীর বিবাহ হয়। অবলা দেবী ছিলেন এস. আর-দাসের ভগিনী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেঠামহাশয় দুর্গামোহন দাসের কন্যা।

অবলা দেবী জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তাঁর ধৈর্য ও সাহস, জগদীশচন্দ্রের জীবনে ছিল এক পরম সম্বল। তাঁর মত সহধর্মিণী না পেলে জগদীশচন্দ্র হয়তো জীবনে কৃতকার্য হতে পারতেন না। তিনি নিজে অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও জগদীশচন্দ্র যখন কর্মজীবনের প্রথম তিন বৎসর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বহু দুঃখ ও কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন তখন অবলা দেবীই তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে নিজে ধৈর্য ধরে সুশৃঙ্খলে সংসার চালিয়ে এসেছেন।

তিনি স্বামীর সেবা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সেবাযত্ন করেছেন। নিজে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কখনও দাসদাসীর ওপর নির্ভর করেন নি। স্বামীকে সব সময় অর্থাভাবের চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছেন। স্বামীর সাধনায় উৎসাহ দিয়েছেন। হিমালয়ের দুর্গম তীর্থ কেদার বদরীর পথেই হোক, কিংবা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে তাঁর বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথেই হোক তিনিই ছিলেন জগদীশচন্দ্রের একনিষ্ঠ সঙ্গিনী।

বিনা তারে খবর পাঠান

জগদীশচন্দ্র কৃত্রিম চোখ তৈরি করেছেন। তাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়লে একটা বিদ্যুৎস্রোত বয়ে যায়। তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরে যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎপ্রবাহ আবার কাঁটা না ঘুরিয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাতে পারে। বারুদের স্তূপে আগুন ধরাতে পারে। এমন কি ইটপাটকেলের ভেতর দিয়ে যখন এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন ভেতরের দেওয়াল ফুঁড়ে পাশের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটতে পারে।

জগদীশচন্দ্র যে কৃত্রিম চোখ তৈরি করলেন তা খুবই কার্যকর। বহু দূরে থেকেও তা সাড়া দেয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি হল। ভেতরের দরজা বন্ধ। সেই দরজা রক্ষা করছেন জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন অধ্যাপক সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ। পাশের ঘরে রয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক পেডলার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি হল সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অধ্যাপক পেডলারের ঘরে পৌছে একটা পিস্তল ছুড়ল।

পৃথিবীতে বিনা তারে খবর পৌছনর এই হল সূচনা। মার্কনির আগে জগদীশচন্দ্র যে বিনা তারে খবর পাঠাতে কৃতকার্য হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির আয়োজন করে ফাদার লাফোঁ জগদীশচন্দ্রকে একখানি চিঠি* লিখেছিলেন। সেই চিঠি থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

"প্রিয় জগদীশ,

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে "বিনা তারে সংবাদ পাঠান" বিষয়ে সাধারণের জন্য আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই। কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে যে

*My dear Jagadish,

I would like to give a public lecture at St. Xavier College Hall on "Telegraphy without wires," but as the instruments you so kindly gave me are not in working order and as I would like to take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi, would you assist me in my lecture with your presence and work your own instruments. Let me know as soon as possible as I intend inviting Lieutenant Governor.

Very sincerely yours
(Sd) E. Lafont S. G.

যন্ত্রগুলি দিয়েছিলে, সেগুলি কাজ করছে না। মার্কনির আগে তুমি যে এই সত্য আবিষ্কার করেছ সেই বিষয়ে আমি তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তুমি কি আমার এই বক্তৃতায় নিজে উপস্থিত থেকে এবং তোমার যন্ত্রগুলির পরীক্ষা দেখিয়ে সাহায্য করতে পার? যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে জানাবে, কারণ আমি এই সভায় ছোটলাটকে নিমন্ত্রণ করতে চাই।

একান্ত তোমার

(স্বাঃ) ই, লাফোঁ এস. জে"

জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের সংবাদ সারা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত হল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির সামনে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে দুটো বন্ধ ঘর ভেদ করে বিদ্যুতের তরঙ্গ ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয় ঘরে পৌঁছল। সেখানে একটা লোহার গোলা ছুড়ল। পিস্তল আওয়াজ করল। বারুদের স্তূপ উড়িয়ে দিল। ৭৫ ফুট দূরে পাঠাতে তিনি তাঁর যন্ত্রের সঙ্গে একটা উঁচু স্ট্যাণ্ড সংযুক্ত করে দিলেন। সেই দণ্ডের ওপর একখানা টিনের চাকতি আটকে দিলেন। আজকাল এর পরিবর্তে এরিয়ালে (aerial) এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইবার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এক মাইল দূরে তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু এই সময় তাঁকে বিদেশে যেতে হল। তাই এ ব্যবস্থা আর হয়ে ওঠে নি।

হার্জের পর পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার নানা রকম যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র হয়েছিল সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রিসিয়ান পত্রিকায় লিখল—

"বর্তমান সময়ে বিনা তারে খবর পাঠাবার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত যন্ত্র তাদের সকলকে হটিয়ে দিল।"

এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এই সময় ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্যার হেনরি জ্যাকসন। তিনি অনেক দিন থেকে ভাবছিলেন কি করে বিনা তারে এক জাহাজ থেকে আর এক জাহাজে খবর পাঠান যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার কথা শুনলেন। তিনি সেটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজের এক ধার থেকে আর এক ধারে খবর পাঠালেন। মার্কনি যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটা ঘটে এই ঘটনার পর।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হল :—

"যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বন করে অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, সেই যুক্তি এবং সব যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক বসুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেই সত্য অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোন দিন লুকিয়ে রাখেন নি, এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র কাজে লাগাতে এবং তা থেকে অর্থ উপার্জন করতে কোন বাধা নেই।"

জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক লণ্ডনে গিয়ে পৌছলেন। তাঁর মৌলিক আবিষ্কার বিলেতে পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তার ফলে রয়াল ইনস্টিটিউশন শুক্রবার সান্ধ্য আলোচনায় তিনি তাঁর নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। লণ্ডন রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা শুনে লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওপরে মেয়েদের গ্যালারিতে যেখানে আচার্যদেবের স্ত্রী বসেছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁর দুহাত ধরে তাঁর স্বামীর এই মৌলিক আবিষ্কারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

তারপর এই বক্তৃতার বিবরণ লণ্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তারা স্বীকার করল যে ভারতবাসীদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রই প্রথম বিজ্ঞানে এই অপূর্ব আবিষ্কার করেছেন।

জগদীশচন্দ্র স্থির করেছিলেন যে তিনি তার আবিষ্কৃত ফল থেকে কোন লাভ করবেন না।

বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবসায় লাভজনক একটা ব্যবস্থা করবার জন্য একজন বিলাতী ব্যবসায়ী তাঁর সঙ্গে একবার একটা লেখাপড়া করতে চায়। কিন্তু সে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল যে জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক আবিষ্কার থেকে কোন লাভ করতে চান না। কারণ ভারতবাসীর আদর্শ তা নয়। মুনি-ঋষিদের কোন অর্থলালসা ছিল না।

জগদীশচন্দ্রের একজন আমেরিকান বন্ধু জগদীশচন্দ্রের বিনা তারে সংবাদ পাঠাবার যন্ত্রের তাঁর নামে আমেরিকায় পেটেণ্ট করবার দরখাস্ত করে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র পেটেণ্ট করলেন না। পেটেণ্টটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না করার জন্য বাতিল হয়ে গেল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের ইংলণ্ডে অবস্থানের শেষের দিকে প্যারিতে ফিজিক্যাল সোসাইটি ও বার্লিনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রকে তাঁদের দেশে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করলেন।

প্যারিসে সোসাইটি ডি ফিজিক সভায় অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভাপতি এম. কর্ন্যু সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। কর্ন্যু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। সেই সভায় লিপম্যান (Lippman) নামে রঙীন ফটোগ্রাফীর বিখ্যাত আবিষ্কর্তা কয়েলিটেট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত ছিলেন।

লিপম্যান ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় এতই মুগ্ধ হলেন যে তাঁকে সরবোনে (Sorbonne) আর একদিন বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলেন। তার পরই জগদীশচন্দ্রকে সোসাইটি ডি ফিজিকের অবৈতনিক সভ্য নির্বাচন করা হল।

বার্লিনে অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করলেন। এই প্রতিষ্ঠান জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার মুদ্রিত করে প্রকাশ করলেন। হিডেলবার্গে (Heidelberg) বিখ্যাত অধ্যাপক কুইঙ্কি (Quincke) এই বিষয়েই গবেষণা করতেন। তিনি হিডেলবার্গ থেকে বার্লিনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য এই সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে হিডেলবার্গে তাঁর পরীক্ষাগার দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিল (Kiel) বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বক্তৃতা করবার আহ্বান এল। কিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে এবং ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজমের গবেষক এবার্ট (Ebert) সঙ্গে আলোচনা করে কুইঙ্কি, লেনার্ড প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে জগদীশচন্দ্র এবারের মতো তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করলেন। তারপর জগদীশচন্দ্র মার্সেলিস হয়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন।

এতদিন পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে একাধিপত্য ছিল। জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভারতবাসী যিনি তাঁর দেশবাসীকে এই আবিষ্কারের পথ খুলে দিলেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার হেনরি রস্কো (Sir Henry Roscoe) স্বীকার করলেন প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতের পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সমান কৃতী।

রাজনৈতিকগণের পক্ষ থেকে বম্বের প্রাক্তন গভর্নর লর্ড রিয়ে (Lord Reay) ভারতবাসী যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে দক্ষ এ কথা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞানে সর্বজাতির সমান অধিকার। ভারতবাসী জগদীশচন্দ্র

বিজ্ঞানে যে আবিষ্কার করেছেন আমরা তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিলাম।

লণ্ডনের স্পেক্টেটর (Spectator) পত্রিকা বরাবর ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। এই পত্রিকার সম্পাদক কৌতূহলবশত রয়াল ইনষ্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পরের সপ্তাহের স্পেক্টেটারে এই কথাগুলি প্রকাশিত হল :—

"There is however, to our thinking, something of rare interest in the spectacle there presented, of a Bengalee of the purest descent lecturing in London to an audience of appreciative European savants upon one of the most recondite branches of modern physical science. It suggests at least the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by accurate observation and patient experiment to wring from nature some of her most jealously guarded secrets. The people of the East have just the burning imagination which could extort a truth out of a mass of apparently disconnected facts ; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself, such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers ; and a power of persistence—it is something a little different from patience—such as hardly belongs to any European. We do not know Professor Bose : but we venture to say that if he caught with his scientific imagination a glimpse of a wonder-working 'ray' as yet unknown to man but always penetrating ether, and believed that experiment would reveal its properties of potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and, dying, hand on his task to some successor, be it son or be it disciple. Nothing would seem laborious to him in his inquiry, nothing insignificant, nothing painful, any more than it would seem to the true Sanyasi in the pursuit of his inquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within that sphere of inquiry of a thousand men with the sanyasi mind, the mind which utterly controls the body and can mediate and inquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it be obscured by any terrestrial, temptation.

We can see no reason whatever why the Asiatic mind, turning from its absorption in insoluble problems, should not betake itself ardently, thirstily,

hungrily, to the research into Nature which can never end, yet is always yielding results, often evil as well as good, upon which yet deeper enquiries can be based. If that happened—and Professor Bose is at all events a living evidence that it can happen—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind."

লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা এবিষয়ে আরও সংক্ষেপে লিখল :—

"যখন আমরা চিন্তা করি যে ডাঃ বসু কলকাতায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনার অবিরত কর্তব্য করে তারপর তিনি এইসব মৌলিক গবেষণা করছেন এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেগুলি এদেশে অতি স্বল্প বলেই বিবেচিত হয় তখন তাঁর আবিষ্কারের মূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তাঁর গবেষণার কাজের সঙ্গে তাঁর যন্ত্রপাতি তাঁকে নিজে তৈরি করে নিতে হয়েছে। তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁর দুরকম পরিশ্রমের পরিণতি—(১) যন্ত্রাদি আবিষ্কার (২) গবেষণা।"*

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর যাতে কাজের সুবিধা হয় সেইভাবে তাঁকে সাহায্য করে তাঁর আবিষ্কারের মূল্য দিতে চাইলেন। এই বৈজ্ঞানিকগণের প্রধান হলেন লর্ড কেলভিন। যে সমস্ত অসম্ভব ব্যাপারের ভেতর দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণার কাজ করতে হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। সেই সময় ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন লর্ড জর্জ হ্যামিলটন। তাঁকে লর্ড কেলভিন লিখলেন—

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ বসুর অধ্যাপনা সম্বন্ধে যদি একটা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি-যুক্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রস্তুত করে দেওয়া হয় তবে ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে আরও কৃতিত্ব দেখাতে পারবে।"

লর্ড কেলভিন সেখানেই নিরস্ত হলেন না। লণ্ডনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা ভারত-সচিবের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তাঁর কাছে একখানি অনুরোধপত্র লিখলেন।

* "The originality of the achievement is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta, and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct himself his instruments as he went along. His work forms the outcome of his twofold lines of labour—construction and research."

THE UNIVERSITY.
GLASGOW.

Oct 23/96

Dear Lord George
This will be presented
to you by Dr. J. C. Bose,
Professor of Physical Science
in the University of
Calcutta, and a graduate
of the University of Cambridge
He has done exceedingly
good experimental
work in Calcutta with
necessarily very limited
means and appliances,
and has obtained results

of the University of
Calcutta, in connec
tion with the Professor-
ship held by Dr. Bose

Believe me
Dear Lord George
Yours very truly
Kelvin

"কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ভারত সাম্রাজ্যে একটা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানাগার স্থাপন আমরা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। এটি যে শুধু উচ্চ শিক্ষার সহায় হবে তাই নয়, এতে দেশের আর্থিক উন্নতিরও সাহায্য হবে। বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা আপনাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছি।"

যাঁরা এই আবেদনে সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার (Lord Lister), লর্ড কেলভিন, অধ্যাপক ক্লিফটন, অধ্যাপক ফিটজেরাল্ড, ডাঃ গ্লাডস্টোন, অধ্যাপক পয়েন্টিং (Prof Poynting), স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে, সার গ্যাব্রিয়েল ষ্টোকস্, অধ্যাপক সিলভেনাস টমসন, স্যার উইলিয়াম রুকার (Sir Wlliam Rucker) প্রভৃতি।

বিলেতের এত বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সইকরা মেমোরিয়াল পেয়ে ভারত-সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর সেই মেমোরিয়ালের ওপর লিখলেন, "Being of opinion that the question of establishing an institution of the kind mentioned is deseiving of consideration by Your Excellency in Council."

লর্ড এলগিন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি ভারত-সচিবের সেই ডেসপাচ পেয়ে জগদীশচন্দ্রকে বললেন যে গবর্নমেণ্ট এই গবেষণাগার স্থাপনে ইচ্ছুক। তিনি এ বিষয়ে বাংলা গবর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

এই প্রস্তাবটি বাংলা গবর্নমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ভেতর দিয়ে যখন এসে পৌছল তখন তাতে দেখা গেল লেখা আছে, "এই scheme টি প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু প্রস্তাবটি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।"

জগদীশচন্দ্র এই মতলব বেশ বুঝতে পারলেন। তিনি বিলেতে ভারত অফিস ও ভারত গবর্নমেণ্টকে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে গবর্নমেণ্টের যন্ত্রের কাজের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

জগদীশচন্দ্রের ইংলণ্ডের বন্ধুগণ বললেন এবিষয়ে দেরি হবার কারণ কি জানতে পারিলে তাঁরা সেখানে আবার তাগাদা তদবির করতে পারেন। কিন্তু

জগদীশচন্দ্র যদি সে বিষয়ে মন দেন তাহলে তাঁর গবেষণার কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে থাকবে। অতএব তিনি গবর্নমেণ্টের গবেষণাগারের আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁর পুরানো গবেষণাগারের অসুবিধাগুলি সামান্য যাতে দূর হয়- তার চেষ্টা করে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই রকমে নানা অসুবিধার মধ্যে জগদীশচন্দ্র কোন রকমে তাঁর গবেষণার কাজ করে যেতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর গবর্নমেণ্টের চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় হয়ে এল। এমন সময় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল তাঁর এতদিনের আশা ফলবতী হবার উপক্রম হয়েছে। একটা সম্পূর্ণ গবেষণাগার স্থাপিত হল। এতে তিনি কোন বকমে উপকৃত হবেন না বটে কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন এই কাবণে যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারের যে দুর্দশাজনক অবস্থায় এসে প্রবেশ কবেছিলেন, আব এখন যখন তিনি এই গবেষণাগার পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন তখন এব অবস্থা সম্পূর্ণ উন্নত। তাঁর ছাত্ররা এখন বিভিন্ন কলেজে গবেষণাগারেব অধ্যক্ষতা করছেন। যাই হোক তাঁর চেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজেব ইউবোপীয় অধ্যক্ষ জেমস্ জগদীশচন্দ্র এত বড জগদ্বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি ভারতীয়, সেইজন্য তাঁব সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন, তারই একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার ল্যাবরেটরি নির্মিত হল। বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল এসে এই নূতন গবেষণাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন। দিন স্থির হয়ে গেল। নিমন্ত্রণলিপি বিলি হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র কিন্তু কিছুই জানতে পারলেন না। তাঁর ছাত্র একজন অধ্যাপক তাঁকে এই খবরটি দিল। জগদীশচন্দ্র বেকার ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ। অথচ তাঁকে কিছু না জানিয়েই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। সেটা স্বাভাবিক।

জগদীশচন্দ্র বললেন "তাই নাকি ? আমি কিছুই জানলাম না। আচ্ছা।" বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কয়েক দিন আগে ব্যক্তিগতভাবে জগদীশচন্দ্রকে একদিন চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি জগদীশচন্দ্রের নূতন গবেষণাগার এসে দেখতে খুব আগ্রহী। কবে তাঁর সময় হবে তিনি জানতে পারলে তিনি তাঁর গবেষণাগারে আসবেন। জগদীশচন্দ্র তখনও সেই চিঠিখানার উত্তর দেন নি।

সেইদিনই জগদীশচন্দ্র বেকার ল্যাবরেটরি উদ্বোধনের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই একটা দিন স্থির করে লর্ড কারমাইকেলকে তাঁর পরীক্ষাগারে এসে তাঁর নূতন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

গবর্নরের সেক্রেটারি জগদীশচন্দ্রের আমন্ত্রণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তারপর তার নির্দিষ্ট তারিখ অনুমোদন করে জগদীশচন্দ্রকে এবং অধ্যক্ষ জেমসকে তাঁর আগমনের সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

জেমস আকাশ থেকে পড়লেন। লর্ড কারমাইকেলই আর কয়েকদিন পরে বেকার ল্যাবরেটরির দ্বার উদ্‌ঘাটন করবেন। আর তার আগেই তিনি সেই বেকার ল্যাবরেটরিতে আসছেন জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখতে।

জেমস চিঠি পেয়ে জগদীশচন্দ্রের কাছে ছুটে এলেন। জগদীশচন্দ্র বললেন, লাট সাহেব যে বেকার পরীক্ষাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে আসছেন আমি ত জানিনা। সুতরাং আমি লাট সাহেবের চিঠি পেয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে চিঠি দিয়েছি।

* * * *

একবার জগদীশচন্দ্র বেলা ঠিক দশটার সময় ক্লাসে এলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তখন জগদীশচন্দ্রের ছাত্র। তিনি সেই ক্লাসে পড়েন। আমি এ ঘটনা তার মুখেই শুনেছি।

জগদীশচন্দ্রের চুল উস্কো খুস্কো। চোখ লাল। দেখলেই মনে হয় তিনি যেন সমস্ত রাত নিদ্রা যান নি।

জগদীশচন্দ্র ক্লাসে এসেই বললেন—আজ আমি তোমাদের ক্লাস নেব না। শুধু রোল কল করেই তোমাদের ছেড়ে দেব। আমি কাল সমস্ত রাত ধরে গবেষণা করেছি। আমি এখনই আমার অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষাটা দেখিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব। একটা যুগান্তকারী নূতন জিনিস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই রকম অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন একজন অধ্যাপক—যেহেতু তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইজন্য তাঁকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এত অনাদর ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। এত পরিশ্রম করে তিনি যে পৃথিবীতে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন সেটাই ভারতের নেহাৎ সৌভাগ্য।

চাকরি থেকে তাঁর অবসর নেবার সময় উপস্থিত হল। দীর্ঘদিন তিনি চাকরি করেছেন। এত প্রশংসার সঙ্গে উচ্চ গবেষণার কাজ করে তিনি জগদ্ ব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন। শিক্ষা বিভাগে তিনি এখন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কর্মচারী। তাঁর এখন শিক্ষা অধিকর্তার পদ পাওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছুই জানান নি, পাছে তাঁকে সেই পদ দিতে হয়। ভারতবাসীর ভাগ্যে এই হল পরাধীনতার অভিশাপ। জগদীশচন্দ্র কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তিনি গবেষণা করতে পেলেই হল। তিনি আর কিছু চান না। তিনি কখনও সিভিল লিষ্টও দেখতেন না। সিভিল লিষ্ট দেখলে তিনি দেখতে পেতেন যে শিক্ষা বিভাগে তাঁর চেয়ে পুরাতন ও যোগ্য কর্মচারী আর কেউ ছিলেন না।

শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীরা নিজেদের পদের স্বার্থে গবর্নমেণ্টকে এ সব বিষয় কিছুই জানান নি। কেবল জগদীশচন্দ্রের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় জগদীশচন্দ্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক একজন কর্মচারীকে শিক্ষা অধিকর্তার পদে উন্নীত করবার সময় জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘদিন চাকরির ওপর গবর্নমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। তখন গবর্নমেণ্ট জানতে চাইলেন শিক্ষাবিভাগে জগদীশচন্দ্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যোগ্য কর্মচারী হয়েও কেন তিনি উপেক্ষিত হয়ে আছেন। এর কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। যখন থেকে জগদীশচন্দ্রের সর্বোচ্চ গ্রেড পাবার কথা গবর্নমেণ্ট সেই সময় থেকে তাঁর সর্বোচ্চ বেতন মঞ্জুর করলেন। জগদীশচন্দ্র এই সময় একসঙ্গে বহু অর্থ পেলেন। সব অর্থ তিনি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ফাণ্ডে জমা করে রেখে দিলেন। জগদীশচন্দ্রের একজন বৃদ্ধ বন্ধুও এই সময় এই উদ্দেশ্যে বহু অর্থ দান করেন।

যাই হোক গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুযোগ সুবিধা দেবার কথা ভুলে যান নি। লর্ড কার্জন যখন বড়লাট তখন তিনি জগদীশচন্দ্রকে গবেষণায় সাহায্য দানের কথা নিয়ে আলোচনা করলেন। লর্ড কার্জন নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। সেইজন্য তিনি বিলেতে চার জন বৈজ্ঞানিকের এ বিষয়ে মত চেয়ে কেবল করলেন। তাদের ভেতর দুজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁকে সাহায্য করবার কথা অনুমোদন করলেন। কিন্তু আর দু'জন ছিলেন শারীরবিজ্ঞানী। তাঁরা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের বিরোধী। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে সাহায্যের কথা অনুমোদন করলেন না।

লর্ড কার্জন এই দ্বিধায় পড়ে উভয় মতের একটা সমন্বয় করবার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় জগদীশচন্দ্রকে "কম্প্যানিয়ন অব দি ইণ্ডিয়ান অর্ডার" উপাধিতে ভূষিত করলেন।

জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র আবিষ্কার

বনচাঁড়াল গাছের ছোট একটি পাতা একটা সুতোর ভার পর্যন্ত সইতে পারে না। সুতরাং সে কলম ঠেলে কি করে লিখবে ?

কিন্তু আলো-রেখার কোন ওজন নেই। তাই প্রথমত প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে জগদীশচন্দ্র গাছের পাতার নানারকম লিপিভঙ্গী নিজের হাতে
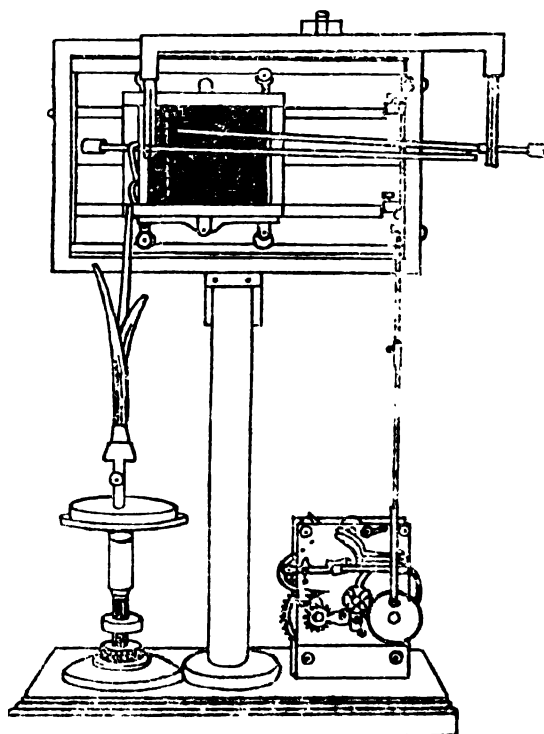
ক্রেসকোগ্রাফ

লিখে নিলেন। সেই সব কথা যখন তিনি জীবতত্ত্ববিদদের কাছে উপস্থিত করলেন তখন তাঁরা খুব বিস্মিত হলেন। পরিশেষে তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে

জানালেন যে এ সব ব্যাপার এতই অভাবনীয় যে যদি কোন গাছ কোন দিন নিজের হাতে লিখে সাক্ষ্য দেয় কেবল তাহলেই তাঁরা এই রকম নতুন কথা মেনে নেবেন।

তখন জগদীশচন্দ্র "সমতাল" যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই কল দিয়ে গাছের অনেক রকম সাড়া লেখা যায়। গাছের বাড় মুহূর্তে নির্ণীত হয়। আর এই রকমে তার স্বতঃস্পন্দন লেখা হয়। আর জীবন ও মৃত্যু রেখা তার আয়ু পরিমাপ করে।

এই রকমে বাধ্য হয়ে জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষার যন্ত্র আবিষ্কার করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা অন্যের উদ্ভাবিত বা নির্ণীত যন্ত্রে গবেষণা করেছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র নিজে অনেক আশ্চর্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

এই রকম একটি যন্ত্রের নাম হল ক্রেস্কোগ্রাফ। জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। প্রথমে এর নাম দিয়াছিলাম কুঞ্চনমান বা শোষণমান। কিন্তু ইংরেজকে দিয়া বাংলা নাম বলাইতে পারিলাম না। সুতরাং ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।"

"ইহাতে জানা যায় যে এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল।" সুতরাং ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের বৃহদীকরণ শক্তি (magnifying power) এক কোটি গুণ। এইরূপ সব যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র এমন সব ব্যাপার মানুষের চোখের সামনে দেখিয়েছেন যা কোন মানুষ এর পূর্বে আর কখনও দেখে নি।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে দেখিয়েছিলেন যে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে গাছ কেমন বেড়ে চলেছে।

এই রকম বহু যন্ত্র তাঁর নির্দেশে তৈরি করতে পারে এই রকম একজন বাঙালী সুনিপুণ কারিকর তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আর একজন বৈজ্ঞানিক বেশী মাইনে দেবার লোভ দেখিয়ে সেই কারিকরটিকে ভাঙিয়ে নিয়েছিলেন। তখন জগদীশচন্দ্রকে আবার অন্য কারিকরকে শিখিয়ে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তাঁর কাজ বন্ধ হয়নি।

জড় ও জীব

এতদিন জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এবার তিনি হঠাৎ জড় পদার্থ ও জীব নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। কেন?

এই কথাটা ভেবে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে জগদীশচন্দ্রের চিন্তাশক্তি একটা নির্দিষ্ট যুক্তির ধারায় চলেছে।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তিনি দেখতে পেলেন যে কৃত্রিম চোখের সাড়ার পরিমাণ অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে আসে। আবার তাকে দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে তবে ঠিক হয়ে যায়।

একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার, প্রতিবারেই তিনি এই জিনিস লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হল—তবে কি প্রাণীর মতো, জড়েরও বাইরের ধাক্কা খেতে খেতে একটা ক্লান্তি বা অবসাদ এসে পড়ে?

জগদীশচন্দ্র এর কারণ খুঁজতে গিয়ে এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

তিনি দেখলেন—কৃত্রিম চোখের ওপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়লে তাতে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বইতে থাকে তার গোড়ায় আছে ঐ চোখের ভেতরের পদার্থের আণবিক পরিবর্তন। জগদীশচন্দ্রের এই মত যখন প্রমাণিত হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে এই আণবিক পরিবর্তন যদি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের জন্যই ঘটে থাকে, তাহলে বাইরের অন্য রকম উত্তেজনাতেও তো তার আণবিক পরিবর্তন হতে পারে। আর এই পরিবর্তনও সাড়ারূপে দেখা দিতে পারে।

কিন্তু এই সাড়া তো সাদা চোখে দেখা যায় না। যন্ত্রের সাহায্য না হলে এই সাড়া বোঝা যায় না। কারণ পাতা ও ডগার ওঠানামা সাদা চোখেই ধরা পড়ে। কোন্ আঘাতে কতক্ষণে উঠল আর কতটা নামল আর কতক্ষণে আর কি রকমে সেটা সেই আঘাতের ধাক্কা সামলে আবার প্রকৃতিস্থ হল, এ সকলের লেখাপড়া ও হিসাবপত্র করা খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুরকম সাড়াই ঠিক জানবার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের দরকার।

জগদীশচন্দ্র এর জন্য অনেকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তার মধ্যে দু-একটা যন্ত্রে কি করে সাড়া অঙ্কিত হয় সেটা না জানলে এই সাড়া বোঝা যাবে না।

তিনি একটা যন্ত্র বার করলেন যাতে গাছের এই সাড়ার দাগ আপনি আপনি লেখা হয়ে যাবে। গাছের পাতা ও ডগা ওঠানামা করে—একেই আমরা বলি গাছের সাড়া দেওয়া। এই যন্ত্রে ঐ সাড়াগুলো লেখা হয়ে যায়।

যন্ত্রের আর-একটা অংশ হল অ্যালুমিনিয়ম বা অপর কোনও ধাতুর তার। জগদীশচন্দ্র এই তারের এক ধার গাছের পাতায় অতি সরু রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধলেন। আর-একটা ধার আর-একটা তারে লম্বাভাবে শক্ত করে বাঁধা হল। এই শেষের তারে একটা গোল ছোট আয়না লাগিয়ে দিলেন। যাতে ঐ আয়না সুদ্ধ দুটো তার অনায়াসে খেলে বেড়াতে পারে—তারও ব্যবস্থা এই যন্ত্রে আছে।

এই যন্ত্রে একটা রেখা দেখা যায়। এটা হল একটা স্থির আলোকরশ্মির পথ। এই আলোটা প্রথমে তারের সঙ্গে জোড়া আয়নার ওপর পড়বে। তারপর উপরকার আর একখানা স্থির গোল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে, সামনের সাড়া আঁকবার যন্ত্রের কাগজে এসে পড়ে। যন্ত্রের সঙ্গে লাগান বড় কাগজখানাকে ফিতের মতো গুটিয়ে রাখা হয়। এই যন্ত্রে আর-একটা ঘড়িকল আছে। সেই ঘড়িকল দিয়ে সেই কাগজখানাকে ইচ্ছামত দ্রুত বা আস্তে খোলা হয়।

মনে করুন একটি সুতোয় বাঁধা গাছের পাতা যেন লজ্জাবতী লতার মতো আপনা থেকেই নীচের দিকে নেমে পড়ল।

এতে পাতার সঙ্গে বাঁধা সুতোর টানে সেই তার দুটো আর তার সঙ্গে লাগান আয়নাখানা যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে দেখতে পাওয়া যাবে। কাজেই সেই আয়নায় যে আলোর রশ্মির ছবি পড়বে সেটা দ্বিতীয় আয়নাখানায় প্রতিফলিত হয়ে যে কাগজের ওপর সাড়া আঁকা হচ্ছে সেখানে চঞ্চল হয়ে দেখা দেবে। পাতার ওঠানামা যদি থাকে, আলোর রশ্মিকে ঐ দুই আয়নার ওপর প্রতিবিম্বিত হবার পর কাগজে এক স্থির আলোকবিন্দুর আকারে দেখা যেত। কিন্তু পাতা নেমে গেল। সুতরাং আমরা দেখতে পাব আলোর বিন্দুটা একটা সরল পথে বাঁদিক থেকে ডানদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মনে করুন—আমাদের সেই পাতাটা উঠতে আরম্ভ করেছে। এ অবস্থায় সেই তারের সঙ্গে লাগান আয়নাখানা ঘুরে আবার আগের জায়গায় আসতে আরম্ভ করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আয়নার ওপর প্রতিফলিত আলোর বিন্দুটাও তার আগেকার পথে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলতে আরম্ভ করবে। সুতরাং পাতার এই রকম ওঠানামায় সাড়া আঁকবার কাগজের উপর আলোর বিন্দুটাকে আমরা একটা সরল পথে ক্রমাগত বাঁদিকে আর ডানদিকে যাওয়া আসা করতে দেখতে পাব।

খাতার উপরে পেন্সিলের মুখ রেখে যদি সেটাকে ক্রমাগত বাঁদিকে আর ডানদিকে চালনা করা যায়, তাহলে খাতায় একটা লম্বা দাগ পড়ে যায়। এখন মনে করুন, পেন্সিলের মুখ যখন বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলছে, তখন খাতাখানাকে কেউ ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এ রকম অবস্থায় খাতার ওপর কখনও আগের মতো একটা সরল দাগ পড়বে না। একটা নির্দিষ্ট সরলরেখার জায়গায়, খাতার ওপর স্রোতের মত এক আঁকাবাঁকা দাগের ছবি আঁকা হয়ে যাবে।

এইবার এই যন্ত্রে সাড়া আঁকবার কাগজখানা যখন ঘড়িকলের সাহায্যে খুলতে আরম্ভ করবে, যে আলোর বিন্দুটা ডান দিকে আর বাঁদিকে যাচ্ছিল সেটা তখন আর কাগজের ওপর সরল রেখা আঁকতে পারবে না। তার জায়গায় একটা উঁচু নিচু বক্ররেখা আঁকা হয়ে যাবে।

পেন্সিল যেমন খাতায় দাগ রেখে যায়, আলোর বিন্দু, সাড়া আঁকবার কাগজে বাঁকা পথে চলতে থাকলেও তাতে কোন চিহ্ন রেখে যায় না। কাজেই আলোর বিন্দুর পথ যাতে কাগজে স্থায়িভাবে আঁকা হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

জগদীশচন্দ্র সাধারণ কাগজের বদলে এই যন্ত্রে ফটোগ্রাফের কাগজ জড়িয়ে, আলোর পথ স্থায়ী করবার একটা উপায় বার করলেন। আলোর বিন্দু যে পথে চলা ফেরা করে, ফটোগ্রাফের কাগজে তার ছবি আঁকা হয়ে যায়। পরে ফটোগ্রাফির সাধারণ নিয়মে, সেই ছবি ফুটিয়ে তুললে কাগজে আলোর পথ স্থায়িভাবে আঁকা হয়ে যায়।

মনে করুন বনচাঁড়াল গাছের পাতার বোঁটায় আঘাত লাগল। বোঁটার সঙ্গের পাতাটি নেমে পড়ে ছবিটা বাঁ পাশের ওপর রেখাটাকে সাড়া আঁকবার কাগজের ওপর টানবে। তারপর পাতাটা যখন কয়েক মিনিট পরে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করবে, তখন পরের নিম্ন রেখাটি আপনা থেকে আঁকা হয়ে যাবে।

সুতরাং দেখা যাবে ছবির এক-একটা চূড়ার মতো বক্ররেখা পাতার ওঠা-নামা বোঝাবে। কোন চূড়া অপরের তুলনায় মাটি থেকে কত ওপরে উঠেছে জানতে পারলে দুটি পাতার মধ্যে কোন্‌টা বেশী নীচে নেমেছিল, সেটা কেবল ছবি দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

চূড়াগুলো নীচেটাকে সময়জ্ঞাপক রেখা বলে ধরা যেতে পারে। একবার

নেমে গিয়ে পাতাটা যদি উঠতে দেরি করে তবে সেই সময়ে সাড়া আঁকবার যন্ত্রে জড়ানো কাগজটার অনেকখানি খুলে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাতার ওঠা-নামা বোঝবার চূড়াটার নীচেটাকে খুব লম্বা হতে দেখা যাবে।

একটা পাতার চারবার ওঠানামার ছবি আঁকা যায়। পাতাটা একবার নেমে যাবার পরে সম্পূর্ণ উঠতে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে। ছবির নীচু রেখার সঙ্গে প্রথম চূড়োর নীচেটা তুলনা করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

চারবার নিয়মিত আঘাতে পাতাটা চারবার নিয়মিতভাবে সাড়া দেয়, তার বোঁটার গোড়ায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। বিষযুক্ত হয়ে পাতাটা আর নিয়মিত সাড়া দিতে পারেনি।

পাতাটা যে বিষের ক্রিয়ার ফলে মরে গিয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায়। সাড়ালিপি যন্ত্রের আলোর বিন্দুটা স্থির থাকলে, যেমন সাড়ার কাগজে একটা সরল দাগ পড়ে যায়, এখানেও সেই রকম সরল দাগ সাড়া-লিপিতে আঁকা হয়ে যাবে।

পাতাকে তিনবার আঘাত করা হয়েছিল। সুতরাং পাতাটা তিনবার ওঠানামা করেছিল। তৃতীয়বার ওঠবার পর জগদীশচন্দ্র তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাতে আরম্ভ করেছিলেন। সুতরাং তখন পাতা মরমর হয়ে আর সাড়া দিতে পারে নি। এই ছবির ডানদিকের অংশে তার মৃত্যুরেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

বাইরের আঘাতে বা উত্তেজনায় প্রাণীরা যে সব প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তা জীবতত্ত্ববিদরা এই রকম নিয়মে লিপিবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু উদ্ভিদ যে আবার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রাণীরই মতো সাড়া দিতে পারে তা এ পর্যন্ত কোন জীবতত্ত্ববিদই মনে করতে পারেন নি।

জগদীশচন্দ্র ব্যাঙের পেশীবিশেষের সাড়া-লিপি দেখিয়েছেন। নিয়মিত আঘাতে ব্যাঙের পেশীটা কুঁচকে যায় আবার প্রসারিত হয়ে কি রকম নিয়মিত সাড়া দেয় এই ছবিখানা দেখলেই সহজে বুঝতে পারা যায়।

প্রথমে ব্যাঙের পেশী আঘাতে সাড়া দিল। তারপর তার পেশীতে বিষ প্রয়োগ করা হল। তাতে তার সাড়া দেবার ক্ষমতা একটু একটু করে কমে এল। শেষে প্রায় থেমে গেল।

জগদীশচন্দ্র এই রকম করে যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সাড়া আঁকবার ব্যবস্থা করেছেন। গাছের পাতা কুকড়ে গেল, প্রসারিত হল, পাতা ওঠা

নামা করল—তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ সাড়া আঁকবার তিনি কি উপায় করেছেন দেখা যাক।

যখন আঘাত পেয়ে উদ্ভিদ নড়েচড়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না তখনকার অবস্থা জানবার উপায় কি?

বনচাঁড়াল, লজ্জাবতী লতা, ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি কতকগুলো গাছে হাত দিলে বা তাতে তাপ প্রয়োগ করলে এই সব গাছের ছোট ছোট পাতা গুটিয়ে আসে। পাতার ডাঁটাও নেমে পড়ে। তার অনুভূতিও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে হাত দেওয়া দূরে থাক, গাছে ধাক্কা মারলেও কই তারা সাড়া দেয় বলে মনে হয় না। গাছে হাজার ঝাঁকি দাও, গাছের পাতা একটুও নামে না।

জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ অবস্থা বিশেষে পড়ে যে রকম সাড়া দেয়, তার প্রতিক্রিয়া বাইরে প্রকাশ করে, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি গাছ সেইরকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধরা পড়ে যায়।

কোন প্রাণীকে যদি নির্দয়ভাবে মারা যায়, তাহলে সে হাত-পা ছুড়ে, চেঁচিয়ে তার ব্যথা ও বেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু সেই প্রাণীকে যদি হাত-পা শক্ত করে বেঁধে, তাকে ঘা কতক লাঠি পেটা করা যায়, তাহলে তো সে হাত পা ছুড়ে ব্যথা বা বেদনা জানাতে পারে না। একমাত্র চীৎকার করে বেদনা প্রকাশ করতে পারে। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের যেন হাত-পা বাঁধা। তাই এ গাছগুলো আঘাত পেলেও যত চেষ্টাই করুক লজ্জাবতী লতার মতো হাত-পা নেড়ে ব্যথা জানাতে পারে না। হাত-পা-বাঁধা জন্তুর বেদনা যেমন চীৎকারে প্রকাশ পায়, সেই রকম হাত-পা-বাঁধা গাছগুলোর সাড়া অন্য রকমে জানা যায়।

এই উত্তেজনা, যা চোখে দেখা যায় না, লিপিবদ্ধ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র বিদ্যুতের সাহায্য নিয়েছেন। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে জীবের দেহের কোন্ অংশে আঘাত দিলে, আহত জায়গা থেকে সুস্থ স্থানের দিকে আপনা থেকেই একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটতে থাকে। আঘাত যতই গুরুতর হয় এই বিদ্যুতের প্রবাহও তত প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। আর আহত জায়গাটা সুস্থ হতে আরম্ভ হলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমশ কমতে থাকে। তারপর বিদ্যুৎ প্রবাহ একেবারে লোপ পায়। মানুষের শরীরেও তাই হয়।

লজ্জাবতী লতা, বনচাঁড়াল, ভুমি আমলা প্রভৃতি গাছগুলি যেমন প্রত্যক্ষ সাড়া দেয় সেই রকম অপ্রত্যক্ষ সাড়াও দেয়। একটা যন্ত্রে জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন এই গাছগুলোরই অপ্রত্যক্ষ সাড়ার ছবি। একই আঘাতে এই যন্ত্রে দেখতে পাবেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির ছবি। দুখানি চিত্র একসঙ্গে দেখলে উভয় সাড়ার একতা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। খুঁটিনাটি সব বিষয়েই অবিকল মিল রয়েছে। সুতরাং এখানে ঐ দুটো সাড়াকে একই আঘাতের জন্য উত্তেজনার দুটো স্বতন্ত্র বিকাশ বলতে হয়।

লজ্জাবতী লতা আঘাত পেলে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ দুরকম সাড়াতেই তার উত্তেজনা প্রকাশ করতে পারে। আব আম, কাঁঠাল গাছ কেবল অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়া দিয়ে অনুভূতি জানায়। দুই গাছের মধ্যে তফাত হল এইটুকু। আঘাতের অনুভূতি একমাত্র লজ্জাবতী লতারই নিজস্ব নয়। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছেরও এই ধর্মটি পুরো মাত্রায় বর্তমান আছে।

জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের এই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়া নিয়ে কত যে গবেষণা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পাশ্চাত্য জগতেব বিজ্ঞানীদের এসব বিদ্যা ছিল ধারণার অতীত। তাই তাঁবা জগদীশচন্দ্রের এই নূতন গবেষণা আর তা তাঁদের চোখের সামনে দেখাবাব জন্য যে সব যন্ত্রপাতি তিনি নিজে আবিষ্কার করেছিলেন তা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই জগদীশচন্দ্রেব এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল।

জগদীশচন্দ্রের এই অপ্রত্যক্ষ সাড়া আবিষ্কারেব ফলে জানা গিয়েছে যে জীবের দেহে আঘাত লাগলেই তার আহত অংশের সুবিন্যস্ত অণুসকল বিকৃত হয়ে পড়ে। আর সেই বিকারের গ্রাস থেকে বাঁচবার জন্য অনেক অণুরই একটা চেষ্টা দেখা যায়। প্রাণী আর উদ্ভিদ—দুয়েরই সকল রকম সাড়াই এই আণবিক বিকারের ফল। আর এই বিকার থেকে বাঁচলেই তারা সাড়া দেওয়া বন্ধ করে আবার সুস্থ হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্ভিদের দেহের ভেতরের আণবিক ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইগুলোর মধ্যে উদ্ভিদের দেহের ভেতর কোষের ভিতরকার জলীয় অংশ বার হয়ে এবং আহত স্থান থেকে সুস্থ অংশের দিকে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করাকে জগদীশচন্দ্র আণবিক বিকারের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করেছেন। উদ্ভিদ যখন সুস্থ থাকে তখন

তার দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষগুলি জলে ভর্তি হয়ে ফুলে থাকে। এ অবস্থায় তাতে আঘাত করলেই অণুর চেহারা বদলে সেই জল সজোরে বেরিয়ে দেহের ভেতর ছুটতে থাকে। কাজেই আহত অংশের কোষগুলো কুঁকড়ে গিয়ে সেখানকার ডাল পাতাকে নামিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সব চেষ্টাই তো সফল হয় না। উদ্ভিদের শরীরের কোষগুলো জল বেরিয়ে যখন কুঁকড়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা ডাল-পালাকেও নামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টা লজ্জাবতী প্রভৃতি কয়েকটা উদ্ভিদ ছাড়া আর কোন গাছে স্পষ্ট দেখা যায় না। লজ্জাবতীর দেহের গঠন আর বিশেষ দুই-একটা অঙ্গ এই চেষ্টায় সাহায্য করে। কিন্তু আম, জাম প্রভৃতি গাছে এই রকম স্বাভাবিক সুব্যবস্থা নেই। সেইজন্য আণবিক চেষ্টা সেখানে সফল হয় না। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতে সব গাছই লজ্জাবতী লতার মতো আণবিক বিকারগ্রস্ত হয়। তাই থেকে সকলেরই যে আণবিক অবস্থা একই রকম হয় তা আমরা বিকারের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখে জানতে পারি।

* * * *

জগদীশচন্দ্রের সহিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার

জগদীশচন্দ্রকে বাংলা দেশের শিক্ষাসচিব কি চোখে দেখতেন এবং তাঁর প্যারিস বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যাওয়া সম্বন্ধে পদে পদে কি রকম বাধা সৃষ্টি করেছেন এখানে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

৮৯ অপার সার্কুলার রোড
২রা মার্চ, ১৯০০

সুহৃদ্বরেষু—

গত মঙ্গলবার দিন Belvedere এ গিয়াছিলাম। Sir J. Woodburn আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratoryতে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদের কার্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন। আপনারা আমার Paris Congressএ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে সে কথা উল্লেখ করিলাম।

Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় Secretary of State-এর হাত।

গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্তেই Directorএর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—"I am informed you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exhibition, to attend a meeting of European scientists. May I ask you to inform of the reasons for making your request to His Honor?"

এরূপ দুরাশা করিবার reason কি, ইহার explanation কি দিতে হইবে জানি না।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

বাংলা গভর্নমেণ্ট এত বাধা দেওয়া সত্বেও জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত প্যারিসে যাবার অনুমতি পেলেন।

* * * *

প্যারিসে জগদীশচন্দ্র

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সেখানে বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক তথ্য সম্বন্ধে বলবার জন্য নিমন্ত্রণ এল।

এদিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও জীব সম্বন্ধে যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেগুলি দেখে নূতন ছোটলাট অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হলেন। তাঁর পূর্ব স্থলাভিষিক্ত ছোটলাট চার বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর নূতন আবিষ্কার প্রকাশ করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনিও স্থির করলেন যে তিনিও তাঁকে ইউরোপে পাঠাবেন। জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার ফল প্যারিসের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাবেশই প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ভারতের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন জগদীশচন্দ্র। তিনি তখন ৪২ বৎসরের যুবক। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বক্তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে রেখাঙ্কিত ছবি টাঙানো। তাতে বিষপ্রয়োগ, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি আক্ষেপ, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, স্নায়ু ও পেশীর এবং তার সঙ্গে তুলনা করা ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা আঁকা রয়েছে। তাঁর সামনের টেবিলে এই সব পরীক্ষা দেখাবার যন্ত্রপাতি সাজানো।

জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ। সাবলীল তাঁর ভাষা। মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাসের সঙ্গে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে সেই আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাবেশে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের মধ্যে ভেদাভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটিয়ে দিলেন।

তিনি সেই আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাবেশে তাঁর নিজের সৃষ্ট যন্ত্র সকলের সামনে পরীক্ষা করে দেখালেন।

তারপর জগদীশচন্দ্র সেই সভায় সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলীর সামনে একখণ্ড টিনকে বিষপ্রয়োগ করলেন। টিনের সঙ্গে যন্ত্রের যোগ করে দিলেন। টিনের মরণক্ষেপ সেই যন্ত্রে আপনি আপনি লিপিবদ্ধ হতে লাগল।

তারপর একটা টবের ওপরের লতার দেহের সঙ্গে সেই যন্ত্র যোগ করে দিলেন। তারপর তিনি সেই গাছকে বিষ প্রয়োগ করলেন। গাছের মরণ-যন্ত্রণা সেই যন্ত্রের প্লেটে লিপিবদ্ধ হতে লাগল।

তারপর জগদীশচন্দ্র একটা ব্যাঙকে ক্লোরোফর্ম্ দিয়ে অজ্ঞান করলেন। তার বুকের যে মরণ যন্ত্রণা হতে লাগল সেটাও সেই প্লেটে আপনি আপনি তার বুকের ভেতরের সেই তরঙ্গের দাগ পড়তে লাগল।

তিনটে কলই একসঙ্গে আপনি আপনি লিখে চলল।

শেষে তিনি সেই তিনটি বিভিন্ন লিপি সেই বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর হাতে দিলেন। তিনি বললেন, আপনারা এই তিনটি বিভিন্ন প্লেটের ওপর এক টুকরো টিন, একটা গাছ ও একটা প্রাণী ব্যাঙকে বিষ প্রয়োগের ব্যাপার চোখের সামনে দেখলেন। ভিন্ন ভিন্ন মরণ-আক্ষেপে যন্ত্রণার ভিন্ন ভিন্ন লিপির তফাৎ কোন্‌খানে ধরে দিন।

কেউই সেই সাড়া-লিপিগুলি চিনে বলতে পারলেন না যে কোন্‌টা টিনের, কোন্‌টা গাছের আর কোন্‌টা প্রাণীর মরণ-যন্ত্রণার লিপি।

তখন জগদীশচন্দ্র আবার ওষুধ প্রয়োগ করে সেই তিনটি জীবনই ফিরিয়ে এনে সুস্থ করে তুললেন।

সমস্ত বিজ্ঞানজগৎ এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখের সামনে দেখে স্তম্ভিত।

স্বামী বিবেকানন্দ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির এই প্রতিনিধিসভায় এক-একজন লোকোত্তর মনীষী উঠে তাঁর নিজের নিজের দেশের গৌরবকাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন তখন তাঁর মনে হল কোথায় আমার জননী ভারতভূমি! তোমার গৌরবকাহিনী বর্ণনা করবার কোন বীর সন্তান কি আজ এখানে উপস্থিত নেই!

তারপর তিনি দেখলেন এক সৌম্যমূর্তি ভারতীয় বীর সন্তান সেই বৈজ্ঞানিক সমাবেশে নিজের মৌলিক গবেষণার বিষয় ধীরে ধীরে বর্ণনা করে সেই জগৎসভাকে স্তম্ভিত করে দিলেন। তখন তাঁর বুক গর্বে ফুলে উঠল। তিনি অন্তরে অন্তরে ভারতমাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, জননী জন্মভূমি! ধন্য তুমি যে এমন সন্তান জঠরে ধারণ করেছ!

*　　*　　*　　*

লণ্ডনে জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে এলেন। সেখান থেকে তিনি ৩১শে আগস্ট, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি প্যারিস ও লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

"একদিন (প্যারিস) Congressএর President হঠাৎ আমাকে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি কিছু কিছু বলেছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congress-এর Secretary আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But monsieur, this is very beautiful (but এর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিনদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষ দিন আর নিজেকে সম্বরণ করিতে

পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য Secretary এবং President-এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।"

* * * *

রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্র প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে এলেন।

এখানে তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতা করতে আহূত হলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল সেই যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া।

এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা ৯টা। সভার দুয়ার খোলা হল। বসু-জায়াকে নিয়ে সভাপতি সভায় প্রবেশ করলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল। তাঁর পরনে শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। গায়ে ভারতীয় অলঙ্কার।

তাঁর পেছনে যশস্বী লোকের দল। সকলের পেছনে আচার্য বসু নিজে।

সভা আরম্ভ হল। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিতভাবে বলতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর পেছনে বিষপ্রয়োগ, ক্লান্ত অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর ও ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা আঁকা। আর সামনে টেবিলে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজান।

তিনি সেই সব পরীক্ষাই দেখালেন। সকলের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

উপসংহারে তিনি বললেন :—

"I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

"It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago.

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সভাস্থ দুই-একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্যদেবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

জগদীশচন্দ্র আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পেয়েছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদের পথ—তা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্মে সেই পথ ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ভারতের যে প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন এই যা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে, জগদীশচন্দ্র সেই ঋষিবাক্য প্রমাণ করলেন। তিনি দেখালেন যে ঋষিদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রয়েছে। এখনও তাঁরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করছেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যখন ইউরোপে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল প্রচার করছিলেন তখন ভারতের যশ ও খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবাসী তাঁর স্বদেশীয়রা তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের (১৮৯৭) "প্রদীপ" পত্রিকায় "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি" শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন :—

"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি

দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত-অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ-মাতৃস্বরে!

জগদীশচন্দ্রের ইউরোপে এই বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইউরোপবাসীরা স্বীকার করল যে ভারতীয়রা শুধু কল্পনাপ্রবণই নয়। তারা আধুনিক বিজ্ঞানেও অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ের ছাপ রাখতে পারে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র ব্রাডফোর্ড সভায় কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তার সঙ্গে যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখালেন যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড় ও জীব একই রকম সাড়া দেয়। আরও তাঁর নিজের তৈরী কৃত্রিম চোখ সভার সামনে উপস্থাপিত করে দেখালেন যে আমাদের চোখের চেয়ে তার শক্তি বেশী। তখন সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষা পদার্থবিদরা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নির্বাক হয়ে রইলেন। তাঁরা এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিলেন না। যেহেতু এই আবিষ্কার তৎকালীন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারে তাঁদেরও স্বীকৃতি দরকার। কারণ জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা দুয়েরই অন্তর্গত।

তাঁর তৈরী কৃত্রিম চোখের ওপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কাজ অবিকল প্রাণীদের চোখের মতো। পদার্থবিদরা স্বীকার করলেও শারীরতত্ত্ববিদরা তাঁদের পুরানো মত বদলাতে রাজী হলেন না।

* * *

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ গ্রহণের অনুরোধ

ইংলণ্ডের পদার্থবিদরা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। ইংলণ্ডের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। সেখানে এই পদ গ্রহণ করলে জগদীশচন্দ্রের উচ্চ গবেষণার সুবিধা হবে বলে ইংলণ্ডের পদার্থবিদরা তাঁকে সেই পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ তারিখে একখানি পত্র লিখলেন—

"বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার Stereoscope-এ MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, 'You have a fine research in hand, go on with it.'

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important.'

আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

তার পরের দিন Prof Barret আমাকে বলিলেন, 'We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India, and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ University-র নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

এখন বলুন কি করি? একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration এর

মূলে আমার স্বদেশী লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?"

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত আর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—

......"আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্ম জন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোনটা ছাড়িয়া কোনটা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।'

এদিকে জগদীশচন্দ্র ব্রাডফোর্ডের বক্তৃতাগুলো শেষ হতেই লণ্ডনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হল। সম্পূর্ণ সারতে তাঁর দু মাস লাগল।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জগদীশচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক লর্ড রেলি ও স্যার জেমস ডিউয়ার সাহায্যে তিনি রয়াল ইনষ্টিট্যুশনের ডেভি ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে তাঁর নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন। এখানে কাজ করার সময় তিনি এমন সব যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন যাতে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ালিপি আপনা থেকেই লিপিবদ্ধ হতে পারে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে তাঁর এই আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখালেন। এ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখানোর পর ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে একখানি চিঠিতে লিখেছেন—

"জয়! আমি একাকী শত শত বিরুদ্ধবাদীর শত জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ১৫ মিনিটের মধ্যে বিস্তৃত হল আমার জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

"প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক Howes আমাকে বললেন—'আমি যখন এক একটি পরীক্ষা দেখছিলাম, তখন তার প্রত্যেকটার কি কি দোষ ত্রুটি

থাকতে পারে সেই কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু তার পরের পরীক্ষাটা সব দোষ ত্রুটি ঢেকে দিচ্ছিল।'

যাই হোক বক্তৃতা খুব সফল হয়েছে। সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছে, এমন কি জয়ধ্বনিও করেছে।

সভাপতি মহাশয় আমাকে এ সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখেছেন :—

"It seems to me that your experiments make it clear beyond doubt that all parts of plants—not merely those which are known to be mobile—are irritable, and manifest their irritability by an electrical response to stimulation. This is an important step in advance, and will, I hope, be the starting point for further researches to elucidate what is the nature of the molecular condition which constitutes irritability, and the nature of the molecular change induced by a stimulus. This would, doubtless, lead to some important generalisation as to the properties of matter ; not only living matter, but non-living matter as well".

স্যাণ্ডারসন প্রভৃতি কয়েকজন জগদীশচন্দ্রের পেশী ও স্নায়ুর ওপর বৈদ্যুতিক উত্তেজনা স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। তাঁরা বললেন, 'তুমি পদার্থবিদ্যার লোক, তুমি ঐ বিদ্যার পরিধির মধ্যেই থাক। শারীরবিদ্যার মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন ?

তাঁদের এই অস্বীকৃতির ফলে জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেই প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটি তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করলেন না। ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভায় যে কোন প্রবন্ধ পড়লেই তা লেখকের দায়িত্বে তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির একটা প্রবন্ধ প্রকাশের কমিটি আছে। তাঁরা প্রত্যেক প্রবন্ধ ছাপার আগে বিচার বিবেচনা করে দেখেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের এই নূতন আবিষ্কারের প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটির আলমারিতে বন্ধ রইল। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হল না।

উদ্ভিদবিদ্যাবিদ অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ভাইন্‌স এই বিষয়ের দুজন বিখ্যাত পণ্ডিত হোরেস ব্রাউন আর হাওয়েসকে সঙ্গে করে লণ্ডনে এসে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলো দেখালেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষা দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা বললেন, রয়াল সোসাইটি তোমার প্রবন্ধ

প্রকাশ না করুক, আমাদের লিনিয়ান সোসাইটিতে এসে তুমি তোমার পরীক্ষাগুলো দেখাও। আমরা তোমার প্রবন্ধ স্বীকার করে নেব। আর যে সব শারীরবিজ্ঞানী তোমার প্রবন্ধের বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরও সভায় আহ্বান করব।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী জগদীশচন্দ্র লিনিয়ান সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর প্রবন্ধ সকলেই স্বীকার করে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের আবার জয় হল।

বৈজ্ঞানিকের নীচতা

নীচতা শুধু কোন স্থানবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ নয়। একজন শারীববিজ্ঞানী রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলো দেখেছিল। সে জগদীশচন্দ্রের সেই আবিষ্কাব নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করল। এ দিকে লিনিয়ান সোসাইটির পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রকাশ হতে গিয়েছে।

জগদীশচন্দ্র লিনিয়ান সোসাইটির সম্পাদক হাওয়েসের (Howes) নিকট থেকে এক চিঠিতে এই সংবাদ জানতে পারেন। অধ্যাপক ভাইনস ও হাওয়েস দুজনেই ছিলেন রয়াল সোসাইটির সভ্য। তাঁরা এই ঘটনার পাঁচ মাস আগে রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রেব প্রবন্ধের প্রুফকপি দেখেছিলেন। সুতরাং তাঁরা প্রকাশ করে দিলেন যে আসল আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রেরই। তখন জগদীশচন্দ্রেব জয় হল।

অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাসে রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কাব বিনা আপত্তিতে প্রকাশিত হল। এই রকম করে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর প্রত্যেক আবিষ্কার নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করে তাঁর মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। তার জন্য তৎকালীন প্রচলিত বিরুদ্ধ মতকে ভুল প্রমাণ করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা যে কি রকম কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত বিদেশে যেখানে জগদীশচন্দ্রকে একলা কারও বিনা সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে তার জন্য তাঁর মানসিক উদ্বেগ, অর্থব্যয়, অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। বিশেষতঃ তখন তাঁর শরীর অসুস্থ। তার ওপর তাঁর কলেজের ছুটি তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ও কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে

আর ছুটি দিতে অনিচ্ছুক। অথচ তাঁর মৌলিক গবেষণা যদি তিনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত না করেই ভারতে ফিরে আসেন তাহলে তাঁর সারা জীবনের গবেষণা নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক যশ ও খ্যাতি বিনষ্ট হবে।

তিনি তৎক্ষণাৎ ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়ে তাঁর ডেপুটেশনের ছুটি বাড়িয়ে দিতে বললেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস তাঁকে জানাল যে এ রকম ছুটি দেওয়ার কোন নজির নেই। সুতরাং এ ছুটি তাঁকে দেওয়া যায় না। তিনি তখন বললেন যে তাঁর এক বছর ছুটি পাওনা আছে। সেই ছুটি তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস তাঁকে জানাল যে এ ব্যাপারে ইণ্ডিয়া অফিস হস্তক্ষেপ করে না। ভারতে গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁকে এই ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। যাই হোক তাঁরা এই বিষয়ে পরামর্শ করে দেখবেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ইণ্ডিয়া অফিস যে সমস্ত শারীরবিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর আবিষ্কারের মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী। সুতরাং সেই সব শারীরবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে আর ছুটি দিতে পরামর্শ দিলেন না।

জগদীশচন্দ্র তখন ইণ্ডিয়া অফিসকে জানালেন যে তাঁরা ডেপুটেশনের ছুটি অথবা সাধারণ ছুটি তাঁকে দিন বা না দিন, তিনি বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁর মত সুপ্রতিষ্ঠিত না করে এদেশ থেকে যাবেন না। তার জন্য যদি তাঁকে চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে হয় তাতেও তিনি প্রস্তুত।

জগদীশচন্দ্রের এই সাহস ও নির্ভিকতায় ভারতসচিব নিজের দায়িত্বে তাঁকে ছুটি দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন।

জগদীশচন্দ্র ছুটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তখন তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটির পরীক্ষাগারে শান্ত চিত্তে নূতন করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের মানসিক বিপ্লবের কথা এই রকম বর্ণনা করেছেন :—

"এই ভয় যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে যে তিনি যদি কোথাও এতটুকু অসফল হন, তাহলে তাঁর স্বজাতীয়রা শিক্ষালাভের অধিকারী বলে আর বিবেচিত হবে না। তিনি আমাকে বললেন, 'সকলেই জানে আমাদের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি আছে, কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের

নিখুঁত বিচারের শক্তিও আছে, অধ্যবসায়ও আছে।' এ কথা তিনি (জগদীশচন্দ্র) যখন আমাকে বলেছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁর শেষ দিকের আবিষ্কারের কথা লিখে ফেলার চেষ্টা করছেন।"

এই রকমে জগদীশচন্দ্র ইউরোপে দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে সফল হয়ে প্রমাণ করলেন যে ভারতবাসী শুধু দার্শনিক নয় বৈজ্ঞানিক অভিযানেও অদ্বিতীয়। তারপর ভারতে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা লাভ করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গাইলেন—

> "জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
> হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
> অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
> সত্যপথযাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।"

* * * *

পুস্তক রচনা

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র জীব ও উদ্ভিদের স্নায়ুর সাড়া সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য পাঠান। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর শত্রুরা সেই প্রবন্ধগুলি রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশের বিরুদ্ধতা করে। তার ফলে রয়াল সোসাইটি তাঁকে জানাল যে তাঁর গবেষণার ফলগুলি প্রচলিত মতের বিরোধী। সুতরাং গাছপালা নিজেরা তাদের স্নায়ু-ক্রিয়া লিখে না দেখালে তাঁর মত তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং তাঁর প্রবন্ধগুলি তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

রয়াল সোসাইটি যখন এই মত প্রকাশ করল তখন হয়ত তাঁর প্রবন্ধগুলি আবার কেউ আত্মসাৎ করে নিজের বলে চালাবার চেষ্টা করতে পারে। তাই জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন যে প্রবন্ধগুলি বইয়ের আকারে ছাপিয়ে ফেলবেন। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষাগারে বহু পরীক্ষা করে ফলাফল দুখানি বিরাট গ্রন্থে প্রকাশ করলেন। একখানি হল জড় ও জীবের সাড়া (Response in the Living and Non-living)। এখানি বিলেতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল।

আর দ্বিতীয় খানির নাম হল Plant Response: as a means of Physiological investigation। এখানিও বিলেতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

জগদীশচন্দ্র তাঁর জড় ও জীবের সাড়া বইখানিতে জড় ও জীবের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয় তার ভুল দেখালেন। তিনি বললেন যে বাইরের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে যে আণবিক বিকৃতি এসে দেহের অণুগুলোকে আক্রমণ করে তাই দেহের ভেতরে রাসায়নিক কাজ করে। আগেকার বৈজ্ঞানিক বিদগ্ধ জন এই কথাটা ধরতে পারেন নি বলে যত গণ্ডগোল। যে শক্তি সজীব পদার্থের ভেতর একটা শক্তির খেলা দেখায় সেই শক্তিটাকে বৈজ্ঞানিকরা "জীবনী শক্তি" নাম দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে সেই শক্তি বাইরের শক্তিরই অংশমাত্র।

জগদীশচন্দ্র এখানে বায়ু-চালিত বৈদ্যুতিক কলের (wind-motor) সঙ্গে উদ্ভিদ দেহের তুলনা করেছেন। এই যন্ত্র প্রবল বাতাসের তাড়নায় ঘুরে কাজ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সংলগ্ন বিদ্যুৎকোষে সেই বাতাসের কিছু অংশ বিদ্যুৎ আকারে সঞ্চয় করে রাখে। যখন প্রবল বাতাসের বেগ হয় তখন কোষে সঞ্চিত সেই বিদ্যুৎ কলে এসে যন্ত্রকে ঘোরাতে থাকে। জগদীশচন্দ্রের বই দুখানি প্রকাশিত হওয়ার পরই জার্মান ও রুশ ভাষায় সে দুখানি অনূদিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বই ছেপে ত চুরির হাত থেকে বাঁচলেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটি বলেছে গাছপালা নিজেরা তাদের স্নায়ু ক্রিয়া লিখে না দেখালে সেই প্রবন্ধ তাঁরা রয়েল সোসাইটির কাগজে প্রকাশ করবেন না। তাহলে—?

জগদীশচন্দ্রের নিজের কথায়ই বলি—"

"বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যক···। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং বিভিন্ন কলগুলির গঠন প্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে

ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় নির্ণয় এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর একটা কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এই দেশীয়।

"এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষ জীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিম্বা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

"তাহার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনা-প্রবাহ কিরূপে বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সে প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়?

"এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।"

দীর্ঘদিন বহু সাধনার পর জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটির কথা অনুসারে গাছপালাদের নিজেদের দিয়েই তাদের স্নায়ু ক্রিয়া লিখে দেখাবার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এইবার তিনি ইউরোপে গিয়ে সেই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁর পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করবার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

"Science should be studied for the sake of science. Don't look for reward. When you have done something, don't expect that the world is going to set off fire works about it immediately; don't fool yourself into thinking that there will be band-playing, banner-waving right away. Learn to work without looking for money." —J. Bose.

উদ্ভিদের জীবন

বিজ্ঞানীরা দেখলেন জীব দেহের অঙ্গের বিচিত্র ব্যাপার পদার্থ বিদ্যা বা রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে মীমাংসা করা যায় না। তখন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদরা কল্পনা করতেন যে প্রাণীর শরীরের ভেতর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। জীবদেহের ভেতরের কাজ যেটার কার্যকারণ তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, তাঁরা মনে করতেন এই কল্পিত শক্তি সেই কাজ করায়।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেই কল্পিত শক্তি দিয়ে জীবের সব কার্যকলাপের সদুত্তর মেলে না। তাছাড়া আসল ভেতরকার কথাটা ত অন্ধকারেই থেকে যায়। তিনি বুঝেছিলেন যে সমগ্র প্রকৃতিটাকে দুর্বোধ্য করে রাখা কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যা খুব সহজ ও সুস্পষ্ট তার সঙ্গেই প্রকৃতির কারবার।

এই পৃথিবীতে দুরকম শক্তি থাকতে পারে না। কারণ ভগবান কখনও একটা অন্ধ শক্তি আর একটা জাগ্রত শক্তির ব্যবস্থা করেন নি। একটা শক্তি ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা রূপে বিরাট বিরাট মহীরুহ উপড়ে ফেলে, বড় বড় বাড়ী ভূমিসাৎ করে দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল—আর একটা আলাদা শক্তি যার জোরে অন্ধকার ঘরে টবের লতার একটা ডগা খোলা জানালার আলো হাওয়ার দিকে বাড়তে বাড়তে এগিয়ে গেল।—এ শক্তি দুটো যে আলাদা একথা জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি নানা রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শক্তি পদার্থ বিদ্যার অনুমোদনে জড়ের ওপর কাজ করে সেই শক্তিই জীবের ওপরেও কাজ করে। তিনি এমন রেখার পার্থক্য খুঁজে পেলেন না যেখানে বলা যায় যে এইখানে পদার্থ বিদ্যার রেখা শেষ হল। তারপর জীব বিদ্যার ধর্ম আরম্ভ হল।

জগদীশচন্দ্র গাছের ঘুমের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। প্রচলিত সিদ্ধান্ত ছিল ঘুমটা উদ্ভিদ দেহের একটা বিশেষ কাজ। জগদীশচন্দ্র বললেন যে আলোর কম বেশী যদি উদ্ভিদের ঘুমের একটা কারণ হত, তবে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই আমরা গাছের খোলা পাতাগুলোকে চোখের সামনে সদ্য সদ্য বুঁজতে দেখতাম।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতই বেলা বাড়তে থাকে, পাতাগুলোও ততই একটু একটু করে বুঁজে আসে। শেষে সন্ধ্যার সময় তারা একেবারে বুঁজে

যায়। সুতরাং বোঝা যায় যে সকাল থেকে আরম্ভ করে, বোঁজার কাজটা সন্ধ্যা পর্যন্ত একাদিক্রমেই চলতে থাকে আর দিনের শেষে সেই কাজটা শেষ হয় যখন পাতাগুলো একেবারে বুঁজে যায়। আর তখনই ব্যাপারটা আমাদের নজরে পড়ে। তার আগে পড়ে না।

জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভিদের নিদ্রার কারণ বলে মনে করা যায় না। তিনি এর পূর্বে "স্বতঃ সঙ্কলন ও পৌনঃপৌনিক সাড়া" প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেছেন যে উদ্ভিদের নিদ্রা এই স্বতঃ সঙ্কলনের একটা উদাহরণ। তফাৎ এই যে, বনচাঁড়ালের পাতা যেমন খুব ঘন ঘন ওঠানামা করে, অন্য গাছের পাতা সে রকম না করে চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর নেমে জাগরণ ও নিদ্রার ভান করে। বাইরের গরম প্রভৃতির মাত্রা অনুসারে বনচাঁড়াল গাছের পাতার ওঠানামা ইত্যাদির নানারকম পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু এই সব কারণে উদ্ভিদের নিদ্রার সময়ের কোন পরিবর্তন হয় না। ঝড়, বৃষ্টি, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা উপদ্রবের ভেতরেও গাছের পাতা অতি ধীরে নামতে নামতে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নেমে ও জোড় বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ে।

এখন জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করলেন যে আলোর উত্তেজনাতেই যদি গাছের ঘুম আসে, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্থাৎ যখন আলোর উত্তেজনা থাকে না, তখন কেন পাতাগুলো বুঁজে আসে?

এই প্রশ্নে আসবার আগে আলোর উত্তেজনা গাছের পাতা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর কি করে ওঠানামা করে সেটা জানা দরকার।

লাউ বা কুমড়ো গাছের লতানো ডগার ওপরের পিঠে ক্রমাগত রোদ বৃষ্টি ইত্যাদি লাগে বলে নীচের পিঠের তুলনায় ওপর দিক্‌টা অল্প উত্তেজনশীল হয়ে পড়ে।

মনে করুন ঐ লতাটার ওপর যেন সোজাসুজি ভাবে সূর্যের রোদ বা আলো এসে পড়েছে। সূর্যের আলোর লতাকে উত্তেজিত করবার একটা ক্ষমতা আছে। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে লতার ওপরের পিঠে সূর্যের আলো পড়তে থাকলে আলোর উত্তেজনাটা ডগার ভেতর দিয়ে নীচের পিঠে পৌছবে। কিন্তু কুমড়ার ডগার ওপরের পিঠের চাইতে নীচের পিঠ বেশী উত্তেজনশীল। এইজন্য প্রত্যক্ষ সূর্য্যের আলো পেয়ে ওপরকার পিঠ যতটা উত্তেজিত হয়, নীচেকার পিঠ পরিবাহিত উত্তেজনায় তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সূর্যের আলোয় যখন ডগার ওপরের পিঠের চেয়ে নীচের পিঠ

বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্কোচনের মাত্রাও ওপরের তুলনায় খুব বেড়ে যায়।

সন্ধ্যায় আলোর তেজ কমে আসায় গাছের পাতা ঘুমিয়ে পড়ে না। সমস্ত দিন আলোর উত্তেজনা পাতার মূলের ওপর পিঠ থেকে নীচের পিঠে এসে, সন্ধ্যা বেলায় ঐ পিঠের সঙ্কোচের মাত্রা খুব বাড়িয়ে তোলে। সেইজন্য আমরা এই নির্দিষ্ট সময়ে পাতাগুলোকে ঘুমুতে দেখি। রাত্রে আর আলোর উত্তেজনা থাকে না। সঙ্কুচিত পাতার মূলের বিকৃত অণুগুলো প্রকৃতিস্থ হবার সুযোগ পায়। আণবিক বিকার কেটে গেলেও পত্রমূলও সঙ্কোচ ত্যাগ করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। এইজন্য রাত্রে যখন সূর্যের আলো থাকে না তখনই গাছের পাতার জাগবার সময়।

লোকের একটা ধারণা ছিল যে সকালে সূর্যের আলো বেরুলেই গাছ তার পাতাগুলোকে খুলে দেয়। এ ধারণা ভুল। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে দেখেছেন কতক গাছের পাতা মাঝ রাতে খোলে। তার কারণ তিনি বলেছেন সমস্ত দিনব্যাপী আলোকের যে উত্তেজনাটা গাছের উপর পড়ে, সেই উত্তেজনার সবটা পাতাগুলোকে নামাতে খরচ হয়ে যায় না। তার খানিকটা অংশ গাছের গায়েই সঞ্চিত হয়ে থাকে। আর তাই শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলোকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে উঁচু করতে খরচ হয়। সুতরাং বাইরের আলোর উত্তেজনাকে অন্তর্নিহিত করবার ক্ষমতা, যে সব গাছের বেশী, তারাই সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে নিম্নমুখী পাতাগুলোকে তাড়াতাড়ি সোজা করে তোলে।

শক্তি সঞ্চয় করবার ক্ষমতা সব গাছের সমান নয়। কাজেই ঘুমুবার সময়ও সব গাছের সমান নয়। যে গাছ যত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে, আলোর উত্তেজনাকে সে তত তাড়াতাড়ি হারিয়ে জেগে উঠবে।

এই কথাগুলি মনে রাখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে জগদীশচন্দ্র যে লজ্জাবতী লতার পাতার ওঠানামা, বনচাঁড়াল পাতার নৃত্য আর উদ্ভিদের নিদ্রা প্রভৃতিকে একই ব্যাপার বলে স্থির করেছিলেন।

লজ্জাবতী লতাকে ছুঁলেই তার পাতার মূলের উত্তেজনায় পাতাগুলো যেমন বুঁজে যায় এবং উত্তেজনার ধাক্কা সামলে নিয়ে যেমন কয়েক মিনিটের ভেতর আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, গাছের ঘুমের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তফাৎ শুধু এইটুকু যে লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার

ওঠানামা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয় কিন্তু ঘুম আর জাগার ব্যাপারটা শেষ হতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে।

ধরুন মেঘলা দিনে আকাশে কোথাও এতটুকুও আলোর উত্তেজনা নেই। তখনও গাছের পাতা ঠিক সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ গুটিয়ে যায়, তার কারণ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র নানা পরীক্ষা করলেন।

তিনি একটা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা বন্ধ করে রেখে পরীক্ষা করলেন। ঘরে লেশমাত্র আলো ছিল না। তবুও লতাটি যেন অভ্যাসের বশে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর আবার যথা সময়ে পাতা খুলে জেগে উঠল।

ফরিদপুরে খেজুর গাছের ওঠানামা

ফরিদপুরের একটা গণ্ডগ্রাম।

একদিন এক গয়লানী বুড়ী মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। বুড়ী ত অবাক! একি কাণ্ড! বুড়ী বলে উঠল—অ্যাঁ, গাছটা

অতটা উঠে গেল কি করে? যাবার সময় ত দেখে গেলাম খেজুর গাছটার ঝাঁকড়া মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে আছে। ঠিক যেন প্রণাম করছে। আর এখন দেখছি আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

বুড়ী নির্বাক বিস্ময়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

মাটিতে শুয়ে থাকা গাছ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্চে! ওপরের দিকে মাথা তুলছে!

অন্য কোন দিন ত এ পথে সে আসে নি!

"দোহাই ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর" বলতে বলতে বুড়ী হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে খেজুর গাছটাকে প্রণাম করল।

মাটিতে পড়ে যাওয়া গাছ, আবার নিজে নিজে উঠে দাঁড়ায়—তার এতখানি বয়েস হল, কই কখনও ত এমন অদ্ভুত ব্যাপার তার চোখে পড়েনি। নিশ্চয় দেবতা ভর করেছে গাছে।

সেদিন বাড়ী ফিরতে তার অনেক দেরী হয়ে গেল।

বাড়ী গিয়ে বুড়ী সকলকে এই ঘটনা বর্ণনা করে শোনাল। শুনে সবাই ত অবাক! এমন কাণ্ড ত কেউ কখনও শোনে নি। নিশ্চয় দেবতা ভর করেছে গাছে।

সকাল সন্ধ্যা গ্রামের লোক সব দল বেঁধে ছুটল—গাছে দেবতা ভর করেছে দেখতে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সে কথা। সকলেই দেখল—বুড়ীর কথা ত সত্যি! সকাল সন্ধ্যা গাছ ওঠানামা করে। গাছের কাছে ভীড় লেগে গেল। পূজো, মানত, মানসিক, নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি। খেজুর গাছ সিঁদুরের ফোটায় ভরে গেল। শোনা গেল এই গাছের গোড়ায় পূজো দিয়ে লোকের অসুখ সারছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে যে প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বৎসর পরে গ্রামবাসীদের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এসেছেন।

সেই সময় মেলার উদ্যোক্তারা ফরিদপুরের কাছে এই আশ্চর্য প্রণামকারী খেজুরগাছের কথা জগদীশচন্দ্রের কাছে নিবেদন করল।

জগদীশচন্দ্র গাছটি দেখতে গেলেন। শুনলেন একবার ঝড়ে এই খেজুর গাছটি ৬০ ডিগ্রী বেঁকে যায়।

সূর্যদেব যখন অস্তাচলে যান, সন্ধ্যায় মন্দিরে যখন শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে ওঠে, দীপশিখা জলে উঠে, সারা পল্লী কাসর ঘণ্টার শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে, তখন এই খেজুর গাছটি মস্তক অবনত করে ভূমিতে প্রণত হয়। আবার প্রভাতে নবোদিত সূর্যের প্রথম আলোক স্পর্শে সমস্ত প্রকৃতি যখন নবজীবনে সঞ্জীবিত হয় তখন এই বৃক্ষও ধীরে ধীরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে।

জগদীশচন্দ্র অনুসন্ধানে জানলেন—এই খেজুর গাছটি মাটি থেকে একেবারে সোজা হয়ে ওঠেনি। গাছটি যখন শিশু ছিল তখন ঝড়ে মুচড়ে গিয়ে সোজা হয়ে উঠেছে।

গাছটা যেখানে বেঁকেছে জগদীশচন্দ্র মনে করলেন সেই জায়গাটা কোন রকমে উত্তেজিত করা হল, তাপ দিয়ে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে। লজ্জাবতী লতার মত এই গাছের কোন গঠনবৈচিত্র্য নেই। সুতরাং বাইরের সংকোচন ক্রিয়া চারদিকে সমানভাবেই হবে। অতএব গাছ নড়ে সাড়া দেবে না। এই অবস্থা হওয়াই উচিত।

জগদীশচন্দ্র আরও দেখলেন এই খেজুর গাছটার গঠনবৈচিত্র্য আছে। এই খেজুর গাছটার যে জায়গাটা বেঁকে গিয়েছে, সেই জায়গাটার ওপর দিকটা ক্রমাগত ঝড়, জল রোদ খেয়েছে। কিন্তু তার নীচেটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত। তার ফলে উত্তেজনার ক্রিয়া নিচেই বেশী হবে। তাই দ্বিপ্রহর মধ্যাহ্নের উত্তাপ যখন এই জায়গাটাকে উত্তেজিত করল তখন নিচে ও ওপর আলাদাভাবে সঙ্কুচিত হল। ফলে গাছের মাথাটা নেবে গেল। সুতরাং ঐ অংশেই ওপর নিচের অবস্থার তফাৎটাই গাছের ওঠানামার কারণ। আর সেটা ঘটেছে বাইরের উত্তাপের জন্যই।

জগদীশচন্দ্র এই প্রণামকারী খেজুর গাছে তার যন্ত্র বসিয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন। দেশের লোক প্রথমে এই দেবভাবাপন্ন গাছে কল বসাতে আপত্তি করল। তারা বলল, এই বিদেশী কল দেবভাবাপন্ন গাছে বসালে গাছের স্বর্গীয় ভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

জগদীশচন্দ্র তাদের বোঝালেন—এই যন্ত্র বিদেশী নয়। তাঁর নিজের পরীক্ষাগারে তাঁর নিজের হাতে তৈরি। আর তাঁর সহকারী যিনি এই যন্ত্রটি গাছে বসাবেন তিনি স্বয়ং একজন পুরোহিতের ছেলে।

তখন সকলে সেই খেজুর গাছে যন্ত্র বসাতে দিতে সম্মত হল।

জগদীশচন্দ্র এই খেজুর গাছের ওঠানামা ও উত্তাপের পরিবর্তন পাশাপাশি

লেখবার জন্য একটা যন্ত্র বসালেন। তাতে গাছের ওঠানামা আর উত্তাপের পরিবর্তন লেখা হতে লাগল।

দেখা গেল দুটো লিপিই সম্পূর্ণ এক রকমের। এতে স্পষ্ট দেখা গেল ওই গাছের উত্থান-পতন কেবলমাত্র বাইরের উত্তাপের বিভিন্নতার জন্যই হচ্ছে। সুতরাং যে গাছ এ রকম করে জন্মায় যাতে তার দুদিক ভিন্ন অবস্থায় পড়ে, সেই গাছই বাইরের উত্তাপের তারতম্যে বাঁকবে—তা যে গাছ যেখানেই জন্মাক না কেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি খেজুর গাছেও জগদীশচন্দ্র একই রকমের ওঠানামা লক্ষ্য করলেন।

কুমুদিনীর নিশিজাগরণ

কুমুদিনী রাত্রে ফোটে। দিনে মুদে যায়। আর পদ্মের ব্যবহার ঠিক তার উল্টো। এটি লক্ষ্য করে আগেকার বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে গাছের ঘুমান বা জাগা সম্পূর্ণভাবে তাদের খেয়ালের ওপব নির্ভর করে। জগদীশচন্দ্র অনেক পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :—

টবশুদ্ধ একটা গাছকে কাত করে গাছের ডালটাকে যদি মাটির সঙ্গে শুইয়ে রাখা হয় তাহলে দেখা যায় যে ডালটা বেঁকে মাথা উঁচু করে উঠছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এই রকম করে। এই রকম বেঁকে ওপরে ওঠবার ক্ষমতা সব গাছের সমান নয়। কোন গাছের বেশী, কোন গাছের খুব কম।

অভিকর্ষের ক্রিয়া ছাড়াই উদ্ভিদ আলোকের স্পর্শে পাতা উঠিয়ে বা নামিয়ে নানা রকমে সাড়া দিয়ে থাকে। গাছ কোথাও পাতা বেঁকিয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যায়। আবার কোন গাছ আলো থেকে দূরে যাবার জন্য ঘাড় বেঁকাতে থাকে। একটা মাদার গাছের পাতার ওপর আলো ফেলা হল। পাতাটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আলো পেয়েই মনে আনন্দ হোক বা যাই হোক, এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই সে ওপরের দিকে বাঁকতে লাগল। কিন্তু লজ্জাবতী লতা এ রকম হলে যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোর জন্য উত্তেজনা, মাত্র এই দুটি শক্তি যদি উদ্ভিদের ওপর কাজ করত তাহলেও তাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত ভিন্ন রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসত। কোথাও একটা শরীর অপরটির উল্টো দিকে কাজ করছে, কোথাও বা তারা পরস্পরকে সাহায্য করছে।

আর প্রত্যেক শক্তির পরিমাণ কত আলাদা। সুতরাং এই দুটো আলাদা শক্তির সমবেত ফল দেখে বলা চলে না কোন শক্তি কতটা কাজ করছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র দেখলেন যে কুমুদিনী অভিকর্ষের ফলে ফোটে না। আলোর উত্তেজনাতেও না। তিনি লক্ষ্য করলেন যে উহা সন্ধ্যা ৬টার সময় খুলতে আরম্ভ করে। আর রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলে যায়। আর বেলা ১০টার সময় সম্পূর্ণভাবে বুঁজে আসে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা আর রাতজাগা তবে কি বাইরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে?

যে যন্ত্রে ফুলের নিদ্রা ও জাগরণ লেখা হচ্ছিল, তার পাশে আর একটা যন্ত্র লাগান হল যাতে দিনরাত তাপ পরিবর্তনের খবর লেখা হয়। দিনের পর দিন এই রকম লিপিসাক্ষ্য নেওয়া হতে লাগল। পরে মিলিয়ে দেখা গেল যে দুটো লেখাই সম্পূর্ণ এক। মিশিয়ে দিলে চেনাই যায় না যে দুটোতেই দুটো আলাদা আলাদা বিষয় লেখা হয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাইরের তাপের দ্বারাই ঘটে। যে জন্যে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যাবেলা মাথা নোওয়ায় আর সকালবেলা সোজা হয়ে দাঁড়ায় সেই একই কারণে পৃথিবীর সমস্ত কুমুদ রাতে ফুটে দিনে কুঁকড়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষায় আরও দেখলেন যে দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি রাতের ঠাণ্ডাটা বজায় রাখা যায় তবে দিনেও রাতের মত কুমুদ ফোটে, বরং রাতে যদি তার চারিদিকে দিনের উত্তাপ ঠিক পরিমাণে বজায় রাখা যায় তাহলে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলেও কুমুদিনী মুখ তুলে চাইবে না।

কিন্তু একটা কথার মীমাংসা হচ্ছে না যে কুমুদিনী যখন বিকশিত তখন নলিনী মলিন কেন? আবার কমলিনী যখন প্রস্ফুটিত তখন কুমুদিনী মুদ্রিত কেন? বাইরের উত্তাপ বা শীত কি রকমে দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে?

একখণ্ড লোহাকে সমান লম্বা এক টুকরো তামার সঙ্গে জুড়ে দুটোকে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হল। তাপে দুটিই বাড়বে। কিন্তু সমান তাপে তামা সমান লম্বা লোহার চেয়ে বেশী বাড়ে। অথচ একসঙ্গে জোড়া রয়েছে বলে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বাড়বার উপায় নেই। ফলে সমস্তটা ধনুকের মত বেঁকে যাবে। যেটা বেশী বাড়ে সেটা থাকবে বাইরে, যেটা কম বাড়ে সেটা থাকবে ভেতরে। সেই রকম গাছের এক দিক যদি আর এক দিকের

চেয়ে বেশী বাড়ে তবে গাছটা বেঁকে যাবে। আর পাতার এক দিক আর এক দিকের চেয়ে বেশী বাড়লে পাতাটা ধনুকের মত হবে।

কুমুদের পাপড়ির বাইরের সবুজ দিকটা ভেতরের সাদা দিকের চেয়ে বেশী নমনীয় সুতরাং গরমে ভেতরের চেয়ে বাইরেটা বেশী বাড়বে। তার ফলে পাপড়িটা ধনুকের মত হবে। সবুজ দিকটা থাকবে বাইরে। সাদা দিকটা থাকবে ভেতরে। সুতরাং ফুলটা একেবারে মুদে যাবে। দিনে ফোটে এই রকম একটা ফুল নিয়ে দেখুন, পাপড়ির ভেতরটা ওর বাইরের চেয়ে বেশী কোমল। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পাপড়িটা বেঁকে যাবে। তবে এবার উহা উল্টো দিকে বাঁকবে সুতরাং বাইরের উত্তাপের জোরে ওটা আরও খুলে যাবে।

অতএব একই উত্তেজনা যে ভিন্ন জাতীয় ফুলকে বিভিন্ন রূপ দান করে তা কেবলমাত্র তাদের ভেতরের গঠনের বৈচিত্র্যের জন্যই হয়।

নির্বাক জীবন

বাড়ী থেকে বাইরে বেরুলেই চারিদিকে জীবনের উচ্ছ্বাস আমাদের চোখে পড়ে। অথচ আমরা দেখি সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ। আমরা লক্ষ্য করি যে শীত ও গ্রীষ্ম, মলয় সমীরণ আর ঝড়ের উদ্দাম নৃত্য, বৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি, আলো আর অন্ধকার এই নির্বাক ও নিঃশব্দ জীবন নিয়ে খেলা করছে। তাতে কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হয়। কত রকমের আঘাত, কত রকমের ভেতরের সাড়া আমাদের চোখে পড়ে। এই নিঃশব্দ, এই নিশ্চল, এই স্থির জীবন-প্রতিমার ভেতরে কত যে অদৃশ্য খেলা চলছে তা বলে শেষ করা যায় না।

জগদীশচন্দ্র বলেছেন গাছের কথা, তাদের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে, আমাদের গাছের কাছেই যেতে হবে। সে ইতিহাস খুব জটিল। বড়ই রহস্যময়।

গাছের ইতিহাস উদ্ধার করতে হলে গাছ আর যন্ত্রের সাহায্যে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তের তার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে হবে, লিপিবদ্ধ করতে হবে। গাছ লিখবে নিজের হাতে। তারা তাতে নিজের হাতে সই করবে। তবে লোকে সেই ইতিহাস বিশ্বাস করবে।

এই লেখায় মানুষের কোন হাত থাকবে না, কারণ মানুষ অনেক সময় নিজের ভাবে প্রতারিত হয়।

একটা বৃক্ষশিশু তিল তিল করে বাড়ছে। সে বৃদ্ধি চোখে দেখা যায় না। মুহূর্তের মধ্যে গাছ কতটুকু বাড়ল তা কি করে বোঝা যায়? গাছকে আহার দিলে গাছের কি পরিবর্তন হয়? আহার না দিলেই বা কি হয়? আর সেই পরিবর্তন আরম্ভ হতে কত সময় লাগে? গাছকে ওষুধ খাওয়ালে কিম্বা বিষ খাওয়ালে কি পরিবর্তন হয়?

একটা বিষ দিয়ে অন্য বিষের প্রতিকার করা যায় কি? বিষের মাত্রা কম বেশী হলে তাতে কি কিছু পরিবর্তন হয়?

কোন জীব যখন আঘাত পায় ঠিক সেই মুহূর্তে সে সাড়া দেয় না। একটা ব্যাঙের পায় চিমটি কাটা হল। তার সাড়া পেতে কম বেশী এক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। ইংরাজী ভাষায় তাকে বলে "লেটেণ্ট পিরিয়ড"।

বাইরের অবস্থা অনুসারে এই "লেটেণ্ট পিরিয়ড" অর্থাৎ এই অনমুভূতি কালের কম বেশ হয়। মৃদু আঘাত অনুভব করতে একটু সময় লাগে। কিন্তু

প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করতে বেশী সময় লাগে না। আর যখন জীব শীতে আড়ষ্ট হয়ে থাকে তখন তার আঘাত অনুভব করতে একটু বেশী সময় লাগে। আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখনও আমাদের অনুভব করতে একটু দেরী হয়। সে সময় এমন কি আমাদের অনুভব করবার শক্তি লোপ পায়। মানুষের বেলায় যে নিয়ম, গাছেরও সেই একই নিয়ম। লজ্জাবতী লতার অনমুভূতিকাল অর্থাৎ লেটেণ্ট পিরিয়ড এক সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ। আর চঞ্চল আর উদ্যমশীল ব্যাঙের তুলনায় কেবলমাত্র ছ' গুণ বেশী।

আর বিরাট বিরাট গাছ দিব্যি ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু রোগা পটকা গাছগুলো তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়।

শীতে গাছের আঘাত অনুভব করতে প্রায় ডবল সময় লাগে। আঘাতের পর গাছ সুস্থ হতে তার প্রায় পনের মিনিট সময় লাগে।

গাছ বেশী ক্লান্ত হলে, তার অনুভূতির ক্ষমতা সাময়িকভাবে লোপ পায়। তখন সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সাড়ার মাত্রা

সময় ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য হয়। গাছ সমস্ত রাত নিশ্চেষ্ট থাকার জন্য সকালে তার একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাত করলে সেই জড়তাটা চলে যায়। ক্রমে সাড়ার মাত্রা বাড়তে থাকে। তখন যেন গাছটা জেগে উঠল। গরম জলে স্নান করিয়ে দিলে গাছের জড়তাটা শীঘ্র চলে যায়। বিকেল বেলা অবস্থাটা থাকে এর বিপরীত। ক্লান্ত থাকলে সাড়া ক্রমে ক্রমে কমে যায়। কিন্তু বিশ্রামের সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলে যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়ালে সাড়ার মাত্রাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়েও মানুষের সঙ্গে গাছের কোন তফাৎ নেই। গ্রীষ্মকালে যে আঘাতের মাত্রা সারতে পনেরো মিনিট লাগে শীতকালে সেটা সারতে আধঘণ্টা লাগে।

'উদ্ভিদের সাড়া (১৯০৬) নামে বইখানি জগদীশচন্দ্র তাঁর স্নেহময়ী জননীর নামে উৎসর্গ করেন। "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" (১৯০৭) নামে বইখানি "উদ্ভিদের সাড়া" বইখানির অনুবৃত্তমাত্র।

"উদ্ভিদের সাড়া" আর "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" নামক বই দুখানিতে জগদীশচন্দ্র যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ দিয়েছিলেন বিজ্ঞান

জগতে সেগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। আর বই দুখানি প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সে সবদেশেও বই দুখানি নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিদগ্ধ মণ্ডলীতে একটা আলোচনা হতে লাগল। এই পরীক্ষাগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন দেশে আংশিকভাবে প্রযুক্ত হয়ে বেশ সুফলও হয়েছিল।

তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ আচার্য জগদীশচন্দ্রকে তাঁর এই নূতন পরীক্ষাগুলি দেখাতে তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাবার জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন। তখন বৃটিশ সরকার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্রকে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিকে তাঁর নূতন পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে আসবার জন্য পাঠালেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্র ঐ সব দেশে গিয়ে তাঁর পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে এলেন। পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর আবিষ্কৃত নূতন যন্ত্রগুলি দেখে বিস্মিত হল। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতারও যথেষ্ট সমাদর হল।

জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন। এবং আরও নূতন নূতন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মন দিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

জগদীশচন্দ্র এবার যে সব নব নব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলেন তাতে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন যে উদ্ভিদের স্নায়ু মণ্ডলী আর প্রাণীদের স্নায়ু মণ্ডলীর ভেতর কোন পার্থক্য নেই। দুই একই প্রকারের। সেই প্রমাণ পেয়ে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাদের পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফল প্রকাশ করল।

এই সময় জগদীশচন্দ্রের আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হল। তার নাম "উদ্ভিদের উত্তেজনাশীলতা"। তখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্রের কাছে বক্তৃতার আহ্বান এল।

সুতরাং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্নমেণ্ট আচার্য জগদীশচন্দ্রকে চতুর্থ অভিযানে পৃথিবী ভ্রমণে পাঠালেন।

ইউরোপ যাত্রা

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। এপ্রিল মাস। ভারতমাতার সুসন্তান জগদীশচন্দ্র এবার তার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও ভীরু ও লাজুক গাছপালা নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হলেন। তিনি তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ইউরোপের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য যাত্রা করলেন। তাঁর জন্য আলাদা নির্দিষ্ট কামরা না হলে তাঁর যন্ত্রপাতি নিরাপদে পৌছবে না। তাঁর সঙ্গে চলল—গেলভেনোমিটার, রেসোনেণ্ট রেকর্ডার, ডেথ রেকর্ডার প্রভৃতি।

যন্ত্রপাতি নির্বিঘ্নে লণ্ডনে পৌছল। জগদীশচন্দ্র রিজার্ভ গাড়ী থেকে নেমে নিজে হাতে দুটো যন্ত্র ট্যাক্সিতে তুললেন। আর দুটো যন্ত্র দিলেন ইংরেজ কুলীর হাতে। তার হাতে ছিল রেসোনেণ্ট ও অসিলেটিং রেকর্ডস আর ক্রেসকোগ্রাফ। ট্যাক্সিতে করে যন্ত্রগুলি যখন বাসস্থানে পৌছল তখন দেখা গেল ইংরেজ কুলীর হাতে যন্ত্র দুটো শেষ হয়ে গিয়েছে। সেগুলি আর কোন কাজ করে না।

এদিকে জগদীশচন্দ্রের এক সহকারী গাছপালা নিয়ে বরাবর জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করলেন। দুটি লজ্জাবতী লতা আর দুটি বন চাড়াল গাছ ভারত থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পৃথিবী ভ্রমণে বেরুল। প্রথম কয়েক দিন গাছ বেশ ভালই থাকল। জগদীশচন্দ্র বলে দিয়েছেন প্রত্যেক বন্দরে নেমে গাছগুলির খুঁটিনাটি খবর তাঁকে যেন দেওয়া হয়।

জাহাজে পথের ধারে গাছগুলি রাখা হয়েছিল। কতকগুলি ছোট ছেলে প্রত্যহ এসে গাছগুলিকে ছুঁয়ে দিত। তাতে গাছগুলি কুঁকড়ে যেত। তারা যেন একটা মজা পেল। তাদেব যেটা খেলার মজা, সেটা যে গাছের পক্ষে মৃত্যু তা তারা বুঝল না।

তখন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে এই কথা বলতে হল। তিনি গাছগুলির আন্তর্জাতিক মূল্যের কথা শুনেছিলেন। তিনি গাছগুলি তার দিয়ে খাঁচার মত করে মুড়ে দিলেন। আর কেউ গাছে হাত দিতে পারত না। আর প্রত্যহ সকালে ক্যাপ্টেন এসে ঠাট্টা করে খবর নিতেন: ওহে, খাঁচার ভেতর তোমার ক্যানারি পাখীগুলি কেমন আছে?

ভারত মহাসাগর দিয়ে যতদিন জাহাজ চলল, ততদিন ভারতীয় আবহাওয়ায় গাছগুলি বেশ সুস্থই থাকল। তার নতুন কচি পাতাও বেরুতে লাগল।

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়ল। সেখানেও বেশ রোদ। সেখানেও গাছের কোন স্বাস্থ্যহানি হল না। জাহাজ ভূমধ্য সাগরে পড়ল। এখানে প্রথম ভারতীয় আবহাওয়া বদলে গেল। এখানে এসে গাছের ঠাণ্ডা লাগল। পাতা ঝুলে পড়ল।

লিয়ন উপসাগরে গিয়ে ঠাণ্ডায় মনে হল গাছ বুঝি আর বাঁচে না। সর্বনাশ! গাছ না হলে সমস্ত পরীক্ষাই যে নষ্ট হবে! তখন গাছের খাঁচার ওপর কম্বল জড়ান হল। রোদ উঠলে, গাছদের একটু রোদে রাখা হল। এই রকমে এপ্রিল মাসের শেষে গাছগুলি লণ্ডনে গিয়ে পৌছল।

ট্যাক্সির কাঁচ বন্ধ করে কুলি না নিয়ে জগদীশচন্দ্রের ছাত্র গাছগুলি নিজের হাতে যত্ন করে গাড়ীতে তুললেন। অবশেষে গাছগুলি লণ্ডনের বাড়ী গিয়ে পৌছল। সেগুলি ড্রয়িং রুমে রাখা হল। কিন্তু বিপদ এখানেও শেষ হল না।

যদিও এপ্রিলের শেষ। নামে গ্রীষ্মকাল। কিন্তু তখনও লণ্ডনে প্রচণ্ড শীত।

সকালে উঠে দেখা গেল গাছগুলি প্রায় অর্ধমৃত। ব্যাপার কি?

জগদীশচন্দ্র বললেন—ঘরে গ্যাসের আলো। গাছের ওপর গ্যাসের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তার ওপর এখানকার প্রচণ্ড শীত।

লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কে রয়াল বোটানিক গার্ডেন। সেখানে "হট হাউস" আছে। সেখানে প্রাচ্য দেশের আবহাওয়া স্থষ্টি করে ফলন্ত কলাগাছ, ফলন্ত ধানগাছ প্রভৃতি জন্মান হয়েছে। জগদীশচন্দ্র তাঁর গাছগুলিকে সেখানে যাতে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করবার জন্য সেখানকার ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি গাছগুলির সব কথা শুনে তাঁর "হট হাউসে" গাছের টবগুলি সযত্নে রেখে দিলেন। আবহাওয়া আরও একটু বেশী গরম করবার দরকার হলে, তিনি গাছের কাছে দুটো 'হিটার' জেলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ঘরে ভারতীয় আবহাওয়া স্থষ্টি হল। গাছগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে থাকল।

মিঃ কেল্প ছিলেন এই রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তিনি নিজে প্রত্যহ গাছগুলির যত্ন নিতে লাগলেন।

'লণ্ডন টাইমসে' এই গাছের খবর প্রকাশিত হল। 'লণ্ডন টাইমস' লিখল:—

"Rare Plant in the Botanic Gardens.

Among interesting plants growing in the Victoria Regia House are a banana in fruit, the sacred city of the East,

লণ্ডনে লজ্জাবতী লতা

লণ্ডনে বনচাঁড়াল
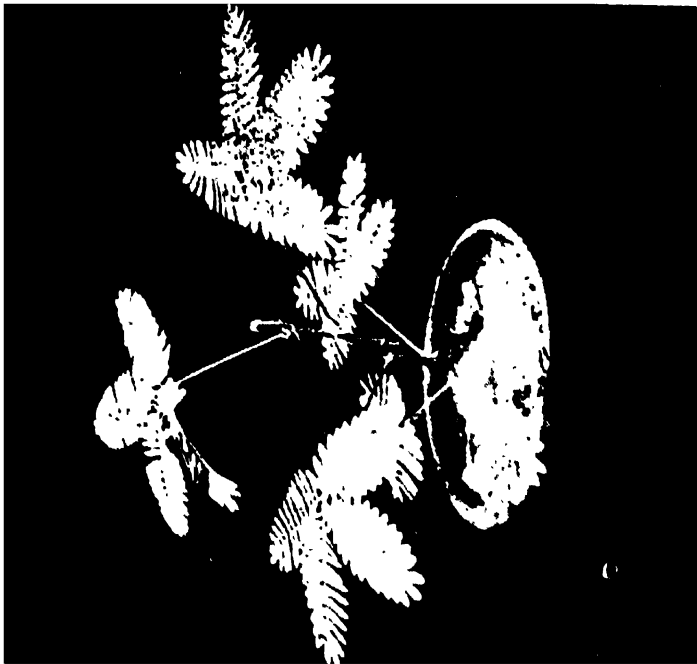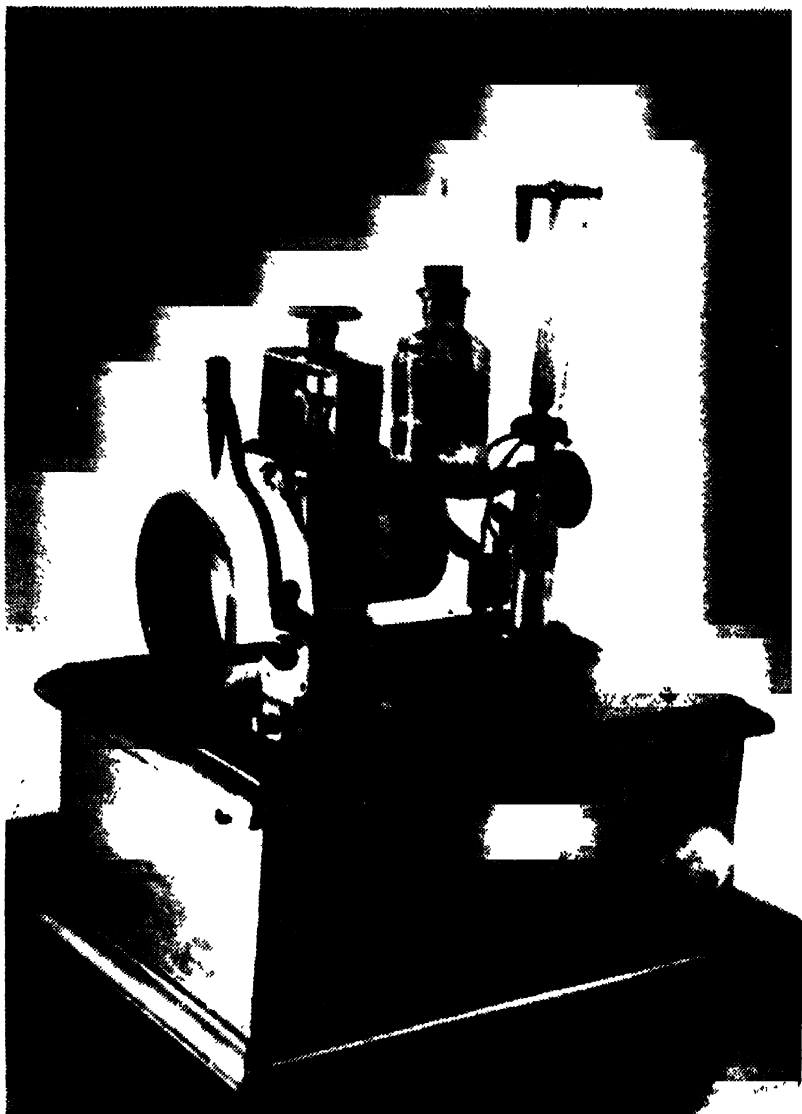
সূর্যালোক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ নিয়ে বৃক্ষের দেহে যে শর্করা প্রস্তুত হয় তাহাই মাপিবার যন্ত্র

Nelumbium Speciosum, sugar cane and rice. A plant rarely to be seen in this country, Desmonodium gyrans, telegraph plant have lately been received from India and is now growing in the same green house. The interest of this plant has been greatly increased since it has been found by Prof. Bose that the pulsations are automatic and that the leaflets respond in exactly the same way as the hearts of animals to stimulants, poisons and electric shock."

এই খবর পড়ে ভারতীয় এমন আশ্চর্য গাছ দেখবার জন্য প্রত্যহ ভিক্টোরিয়া রিজিয়া হাউসে দলে দলে লোক আসতে লাগল।

গাছের ব্যবস্থা ত হল কিন্তু পরীক্ষাগার কোথায় হবে? বাড়ীতে গ্যাসের আলো থাকলে চলবে না। গাছ মরে যাবে। কারণ গাছ গরম ঘরে থাকলেও পরীক্ষা দেখবার সময় তো তাদের পরীক্ষাগারে আনতে হবে।

জগদীশচন্দ্র নিজে একটি সুন্দর বাড়ীর সন্ধানে বেরুলেন। সাউথ কেনসিংটনেই ময়দাভেলে একটি সুন্দর বাড়ী পাওয়া গেল। ঘরে খুব আলো হাওয়া। সঙ্গে একটি বৃহৎ বাগান।

সামনেই যে ঘরটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই ঘরটিতেই পরীক্ষাগার করা হল। সেখানে টেবিলের ওপর সাজানো হল—(১) গ্যালভেনোমিটার—বৈদ্যুতিক রেস্পন্স ও গাছের হ্রাস-বৃদ্ধি মাপবার যন্ত্র।

(২) রেসোনেণ্ট রেকর্ডার—গাছের নার্ভের অনুভূতি আপনি আপনি লেখবার যন্ত্র।

(৩) ডেথ রেকর্ডার—গাছের মৃত্যুর মুহূর্ত জানাবার যন্ত্র ইত্যাদি।

ময়দাভেল পরীক্ষাগার একটা ঐতিহাসিক স্থান হয়ে উঠল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, বিদগ্ধ জনমণ্ডলী, চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ প্রত্যহ এই পরীক্ষাগার দেখতে আসতে লাগলেন।

রয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বক্তৃতা করবার সাদর আহ্বান এল।

এখানে পূর্বে জগদীশচন্দ্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে বক্তৃতা দেন। তখন তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—"অটোগ্রাফিক রেকর্ডস অফ রেসপন্স অফ দি লিভিং এণ্ড নন লিভিং।"

জগদীশচন্দ্র জানতেন যে ইউরোপবাসীর ধারণা যে ভারতবাসী হল

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক ও বিচার শক্তির অধিকারী। কিন্তু তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কি জানে? সুতরাং এই ধারণা দূর করবার জন্য জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন যে, ইংলণ্ডে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল অক্সফোর্ডেই তিনি প্রথম পরীক্ষা দেখাবেন। অক্সফোর্ডে তাঁর মতের যারা বিরোধী তাদের নেতা সার জন বার্ডেন স্যাণ্ডারসনকে তিনি প্রথম পরীক্ষা দেখানো স্থির করলেন। সুখের বিষয়, তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। তিনি জগদীশচন্দ্রকে অক্সফোর্ডের বোটানিক্যাল লেবরেটরীতে পরীক্ষা দেখাতে আহ্বান করলেন। সার জন বার্ডেন স্যাণ্ডারসন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণকে এই সভায় পরীক্ষা দেখতে আহ্বান করলেন। বক্তৃতার পর তাঁদের আলোচনায়ও যোগ দিতে বললেন।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতা

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ২০শে মে। বক্তৃতার দিন স্থির হল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিনটা ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা।

তাঁদের পরীক্ষার গাছগুলিকে রিজেণ্ট পার্কের হট হাউস থেকে শীতের ঠাণ্ডায় দু ঘণ্টা ট্রেনে করে অক্সফোর্ডে আনতে হবে। জগদীশচন্দ্রের ছাত্র যখন গাছ নিয়ে অক্সফোর্ডের কাছে এসে পৌঁচেছে তখন আবহাওয়া আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তখন ভয় হল যে এত শীতে গাছ বোধ হয় কোন সাড়া দেবে না। অক্সফোর্ডের প্রথম সভায় তাঁর বক্তৃতা বোধ হয় বিফল হবে। তা হলেই সর্বনাশ!

বোটানিক্যাল লেবরেটরীতে পৌঁছেই তাঁরা গাছগুলি এক উষ্ণ ঘরে রাখলেন। যেন সেগুলি শীতের আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে আবার বেঁচে উঠতে পারে।

জগদীশচন্দ্র হলে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন যে বক্তৃতার হল অধ্যাপক আর বিজ্ঞানবিদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সকলেই বিশেষজ্ঞ। আর সকলেই শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান (ফিসিওলজিক্যাল) গবেষণাগারে নূতন নূতন আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতার সূত্রপাতে বললেন যে জীবন-দর্শনের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বহু এবং বিপরীতমুখী। বৃক্ষজগতে বৃক্ষের নিজের দেওয়া প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। বৃক্ষের অব্যক্ত অন্তর্জীবনের চিহ্ন বৃক্ষের নিকট থেকেই যদি পাওয়া যায় সেই হল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সেই প্রমাণ

আমরা কি করে পেতে পারি? গাছের নিকট থেকেই এই প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে "রেসনেণ্ট রেকর্ডার" (Resonant Recorder) নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

রেসোন্যাণ্ট রেকোর্ডার
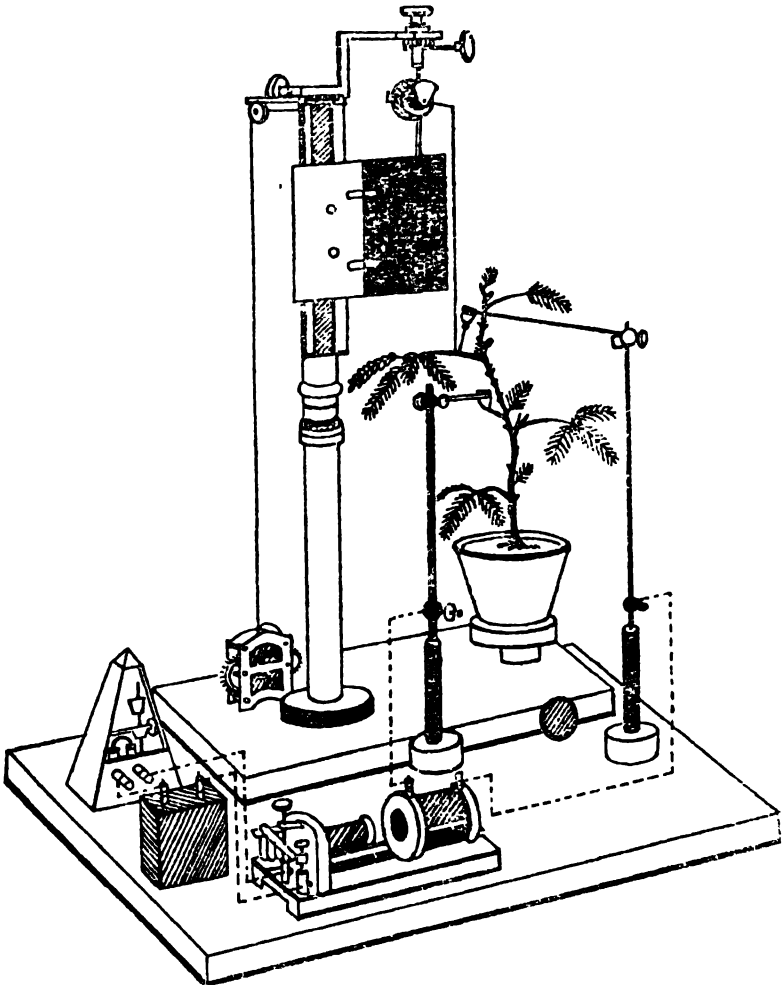
বিস্ময়-বিমুগ্ধ দর্শকের সামনে এই যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র, বৃক্ষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দেখাতে আরম্ভ করলেন। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ে বৃক্ষের স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়া সেই যন্ত্রে পরিমাপ হতে লাগল। অসিলেটিং

রেকর্ডার নামে আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে বনচাঁড়াল গাছের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রেকর্ডে দাগ পড়তে লাগল।

বিস্মিত শ্রোতৃবর্গের চোখের সামনে যখন এই বৃক্ষগুলির হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃক্ষেরা নিজেরাই রেকর্ডের ওপর আপনি আপনি দাগ দিয়ে জানিয়ে দিতে লাগল তখন তাঁদের উৎসাহের সীমা রইল না।

তারপর যে বিষ পান করলে মানুষ মরে যায়, আর যে প্রতিষেধক ওষুধে সে বেঁচে ওঠে, সেই সব ওষুধ জগদীশচন্দ্র গাছের ওপর প্রয়োগ করতে লাগলেন। মানুষের শরীরে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গাছের ওপরও ঠিক সেই একই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল।

তখন সর্বাপেক্ষা সন্দিগ্ধ বৈজ্ঞানিককেও বলতে শোনা গেল—'সব প্রাণই এক।'

প্রথম বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্রের জয় ঘোষিত হল। যাঁরা বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাঁরা এখন থেকে জগদীশচন্দ্রের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

রয়াল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতা

এইবার জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতা দেবেন।

এই রয়েল ইনষ্টিটিউশন থেকে দেড়শ বছর ধরে পৃথিবীতে যুগান্তকারী কত যে আবিষ্কার হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট রামফোর্ড ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করবার জন্য এই ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে টমাস ইয়ং, হামফ্রে ডেভি, মাইকেল ফ্যারাডে, জন টিনডল, লর্ড র‍্যালে, স্যার জে. জে. টমসন প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ কত নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছেন।

এখানে নিয়মিত বক্তৃতা ছাড়া প্রতি শুক্রবার রাত্রি নটা থেকে ঠিক দশটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। মাত্র এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার কারণ হল, বক্তৃতা দেবার সময় এই ইনষ্টিটিউশনের সামনে এত গাড়ী দাঁড়ায় যে এ রাস্তায় অন্য গাড়ী চলতে পারে না। পথে লোকচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বন্ধ করতে হয়। কেবলমাত্র এক দিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেদিন ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী আরও শুনবার জন্য এত অধীর হয়ে

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN
BENGAL

বন্ধু

তোমার সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারব আশা করেছিলুম কিন্তু এখনো চলতে ফিরতে কষ্ট হয় — প্রায় সমস্ত দিন কেদারা অবলম্বন করে থাকি। সকালে মুখ ধুয়ে একটুখানি হাঁটি, তাতেই হাঁপিয়ে পড়ি। রেলে যাতায়াত করতে ভয় পাই।

আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েছি, আশা করি তোমার হাতে পৌঁচেছে — তোমার সেদিনকার অভিনন্দন সভায় এই আমার অর্ঘ্য। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো — কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে

আচার্যদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি
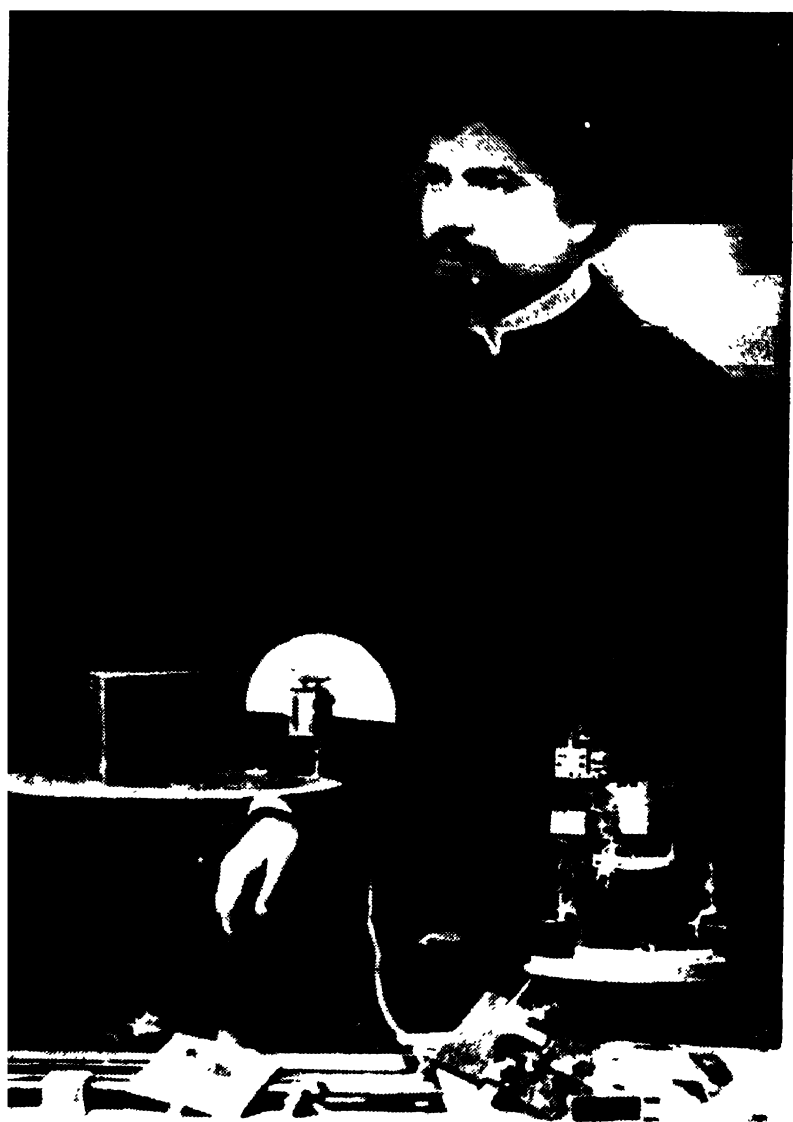
জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিটিউশনে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার বর্ণনা করছেন।

উঠল যে তারা সমবেতভাবে জগদীশচন্দ্রকে বক্তৃতা চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল। সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতার সঙ্গে পরীক্ষা দেখাতে হল।

এখানে শুক্রবারের বক্তৃতায় কোন সভাপতি থাকেন না। কারণ বিশ্ব-বিখ্যাত বক্তা ছাড়া আর কাউকেও এখানে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হয় না। সুতরাং তাঁকে শ্রোতৃবর্গের সামনে পরিচিত করে দেবার প্রয়োজন হয় না। আর তিনি এখানে যা বক্তৃতা দেন তা কোন নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর কাছে নয়। তিনি বক্তৃতা দেন সমগ্র পৃথিবীর কাছে। কারণ এখানে বক্তৃতা করলে সমগ্র পৃথিবীতে সে বক্তৃতা প্রচারিত হয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন জগদীশচন্দ্র এখানে প্রথম বক্তৃতা দেন। তখন তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে পরীক্ষা এতই সুন্দর হয় যে একটি পরীক্ষাও অকৃতকার্য হয় নি। বক্তৃতার পর লর্ড র‍্যালে বললেন—"বাস্তবতার আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যও দু-একটা পরীক্ষা অকৃতকার্য হওয়া উচিত ছিল।" এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে?

সেই সভায় জগদীশচন্দ্রকে "উইজার্ড অফ দি ঈস্ট" অর্থাৎ প্রাচ্যের জাদুকর নাম দেওয়া হয়।

এখানকার সহকারিগণ জগদীশচন্দ্রের এইবারের (১৯১৪) বক্তৃতায় সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন—'এই পরীক্ষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি ভারতের দান। শুধু ভারতীয়গণকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দেখাতে দিন।'

এখানে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় ছিল "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফস্ অ্যাণ্ড দেয়ার রেভেলেশনস্।" বক্তৃতার শেষে সেদিন জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—জড় ও জীবের চিহ্নগুলির ভেতর এত মিল যে আপনারা একটা থেকে আর-একটার পার্থক্য ধরতে পারবেন না।

কেমব্রিজে জগদীশচন্দ্র

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হল জগদীশচন্দ্রের "এলমা মেটার।" তিনিই সম্ভবতঃ এখানকার প্রথম ভারতীয় ছাত্র। সুতরাং কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণাগুলি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছিলেন।

তিনি এখানে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন শুনে সেখানকার উদ্ভিদ্‌ বিত্মার কর্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষ থেকে ভারতের মাটিসুদ্ধ তাঁর প্রয়োজনীয় গাছগুলি সংগ্রহ করেছেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ২রা জুন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিত্মালয়ে বক্তৃতার দিন স্থির হল। জগদীশচন্দ্র ৩০ বৎসর পূর্বে যখন এখানে ছাত্র ছিলেন তখন উদ্ভিদবিত্মার পরীক্ষাগারে যিনি সহকারী ছিলেন তিনি তখনও এখানে কাজ করছেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে চিনতে পারলেন। দুজনে মধুর সম্ভাষণ হল। এখন উদ্ভিদ্‌-বিত্মার পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক ভাইন। আর ডিমনষ্ট্রেটর ছিলেন মিঃ ওক্‌।

২রা জুন, বক্তৃতার দিন ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। চারিদিক অন্ধকার। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বক্তৃতার দু' ঘণ্টা আগে পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার গাছগুলি ছিল বেশ সতেজ। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে গাছ শীতের আবহাওয়ায় কুঁকড়ে গেল। গাছ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে অসাড় হয়ে পড়ল।

বক্তৃতা আরম্ভ করবার পূর্বে জগদীশচন্দ্র গাছের ওপর উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগ করলেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিত্মালয়ের ছাত্রগণ, অগ্রসর বৈজ্ঞানিক তরুণগণে হল পরিপূর্ণ। সেই সময় কলেজে ট্রিপস পরীক্ষা চলছিল। ট্রিপসের পরীক্ষার্থীরা জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করে পাঠাল যে তারা পরীক্ষাশেষে পরীক্ষার হল থেকে ছুটে গিয়ে তাঁর বক্তৃতার হলে বটানিক্যাল থিয়েটারে বক্তৃতা শুনতে যাবে। তিনি যেন দশ মিনিট তাদের জন্য অপেক্ষা করেন।

স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন, অধ্যাপক সিউয়ার্ড, অধ্যাপক ব্ল্যাকম্যান আরও বহু বৈজ্ঞানিক সামনের সারিতে বসে নিবিড় মনোযোগ দিয়ে তাঁর পরীক্ষা লক্ষ্য করছেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর স্থানীয় সহকারীকে আর্ক ল্যাম্প জেলে বোর্ডের ওপর অপটিক্যাল ল্যাণ্টার্ণের প্রথম স্লাইডের ছায়া ফেলতে বললেন। কিন্তু আর্ক ল্যাম্প জ্বলল না। তার যন্ত্রপাতি কিছু খারাপ হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বললেন—৬০ বছর আগে এই আর্ক ল্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে। একজন সামান্য লোকও এটাকে জ্বালতে জানে। এখানকার বৈজ্ঞানিক

কারখানা থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরিত হয়ে থাকে। আর আজ এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রের আর্ক ল্যাম্প জ্বলল না।

আর আজ তাঁর শ্রোতৃবর্গ আশা করেন যে অর্ধপৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ভীরু ও লাজনম্র গাছপালা এনে তাদের সাহায্যে তাঁরা যে প্রশ্ন করবেন এক মিনিটের মধ্যে তার উত্তর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখাতে হবে।

ইতিমধ্যে গাছে যে উত্তেজক ঔষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার ফল বেশ ভাল হল। জগদীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রের মুখে হর্ষের চিহ্ন দেখেই সে কথা বুঝতে পারলেন।

তখন জগদীশচন্দ্র অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক পরীক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হল। বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে হল মুখরিত হয়ে উঠল।

স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন তাঁর বক্তৃতার প্রচুর প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন—"They were all filled with admiration, not only for the brilliancy of the work but for the convincing character of the experiments that were demonstrated which conclusively proved his results and justified his theories. They all realised that in Dr. Bose they found a most brilliant experimentalist of rare skill and ingenuity. They should moreover remember that Dr. Bose had been obliged to work under great isolation and to depend entirely upon himself, even for the training of his mechanics who has constructed for him instruments of such extraordinary delicacy and precision. The results of Prof. Bose's researches not merely affect Physiological Botany but are also of the deepest import in various other branches of Science and much might be expected from the furtherance of his work."

ভিয়েনা

জার্মানীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় Halle-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ অধ্যাপক প্রিংসহিম জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে মৌলিক গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লেখেন যে তাঁর গবেষণায় সকলেই আকৃষ্ট ও চমৎকৃত হয়েছেন। তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে

যদি জগদীশচন্দ্র জার্মানিতে একবার বক্তৃতা দেন তাহলে গবর্নমেণ্ট বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ উপকৃত হবেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদগণের একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবার কথা ছিল। তাতে জগদীশচন্দ্রের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা ও বক্তৃতার জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য হয়।

মিউনিক শহরের উদ্ভিদ-উদ্যান পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত। অধ্যাপক গোয়েবেলকে এই উদ্যানের জন্য নূতন নূতন উদ্ভিদ সংগ্রহ করবার জন্য তিন তিন বার সারা পৃথিবীতে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান হয়েছে। তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন যে তিনি এখানে বক্তৃতা দিতে এলে তাঁর বৃক্ষগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। তদনুসারে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট জগদীশচন্দ্রের সদলে মিউনিক শহরে যাবার কথা ছিল। তার পূর্বেই তাঁরা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ভিয়েনা থেকে সাদর আহ্বান পেলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক মোলিশ (Molisch) গাছের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন। গাছের ব্যাধি ও বিভিন্ন বৃক্ষ সমন্বয় বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে সেখানে বক্তৃতা দিতে যাবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। সেই পত্রে তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক জনমণ্ডলী অধীর আগ্রহে তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রদত্ত বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। কারণ তারা জানে যে এই বক্তৃতা থেকে তারা অনেক নূতন বিষয় জানতে পারবে।

সুতরাং জগদীশচন্দ্র প্রথমে ভিয়েনার বক্তৃতা শেষ করে তারপর জার্মানির অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যাবেন স্থির করলেন।

জগদীশচন্দ্র তদনুযায়ী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন ভিয়েনা যাত্রা করলেন। দীর্ঘ পথে তাঁদের যাত্রা করতে হল। সঙ্গে তাঁদের মহামূল্য বৃক্ষ ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। তাঁরা ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে একখানি স্পেশাল রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলেন। তাঁদের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও খাঁচায় ঢাকা বৃক্ষসমূহ দেখে সকলেরই কৌতূহল হয়। যে স্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামে সেখানেই জানালার বাইরে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যায়। এই ভিড়ের ভেতর সৈন্য ও সামরিক অফিসারদেরও দেখা যায়।

গাড়ীতে তাঁদের নূতন অভিজ্ঞতাও হল। গাড়ীর করিডরে তাঁদের একজন

অষ্ট্রিয়াবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারেন। যদিও তিনি কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি তাহলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলে মনে হল। এই দীর্ঘ পথ রিজার্ভ গাড়ীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণে বাঙ্গালী অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তাঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সুন্দর ইংরাজী ভাষায় কথা কইতে পারেন এরকম একজন সঙ্গী পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি যখন শুনলেন যে জগদীশচন্দ্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ভিয়েনায় বৈজ্ঞানিক অভিযানে চলেছেন তখন তিনি ব্রিটিশরা বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগে যে কতদূর পিছিয়ে আছে সেই কথা বলে ব্রিটিশদের নিন্দা করলেন। তিনি বললেন যে বস্তুতঃ ইউরোপের সব শিল্প বাণিজ্য তো জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান জাতি একচেটিয়া করে নিয়েছে। বিভিন্ন চাকরি-বাকরিতেও ইংরেজ অফিসারগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁর দুই ছেলে যুদ্ধ বিভাগে চাকরি করে। একজন ক্যাপ্টেন। আর একজন লেফটন্যাণ্ট। চাকরিতে যোগ দেবাব আগেই তারা রসায়নবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেছে। তারা রসায়নে তাদের বিদ্যা আরও অনুসরণ করে চলেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রয়োগে তারা সুদক্ষ হয়ে উঠেছে।

ট্রেন এইবার লিপজিগ স্টেশনের নিকটবর্তী হল। এখানে হঠাৎ পাখীর মত ঝাকে ঝাঁকে আকাশে উড়ন্ত এয়ারোপ্লেন নানা রকম কসরত দেখাচ্ছে তাঁরা দেখতে পেলেন। আকাশে খুব উঁচুতে দুখানা বিরাট জেপলিন যেন তাদের নিচের পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করছে চোখে পড়ল। এখন তো দেশে শান্তি বিরাজ করছে। তবে এই শান্ত দেশে আকাশে এত বিমানের সমাবেশ কেন? তাঁরা এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

যাই হোক, জগদীশচন্দ্র সদলবলে ২৬শে জুন সকালে ভিয়েনায় গিয়ে পৌছলেন। অধ্যাপক মোলিশ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করালেন।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাসাদ—দেখবার মত বটে। ইউরোপের মধ্যে একটা সুন্দর প্রাসাদ। এখানে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্রের সংখ্যা সাত হাজার থেকে আট হাজার। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীরা সকলেই সমান অধিকার ভোগ করে। অথচ ইংলণ্ডে সে সময় অক্সফোর্ড কিংবা কেম্‌ব্রিজে কোন ছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

চারিদিক দেখে মনে হল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা চলছে। আর সেই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় যেন সৈন্যেরা অবরোধ করে রেখেছে।

বিকালে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ জগদীশচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরীক্ষাগারে প্রচুর যন্ত্রপাতি। আর সব আধুনিক প্রথায় সাজানো। উদ্ভিদ-উদ্যানে কাঁচের ঘরে আবহাওয়া আপনা আপনি নিয়মিত করবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে তাঁদের গাছপালাগুলিকে তাদের নিজের আবহাওয়া তৈরি করে দেওয়া হল।

অধ্যাপক মোলিশ উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল দেখালেন। তিনি আলু গাছের সঙ্গে টমাটো গাছের কলম করেছেন দেখালেন। সেই একই গাছে মাটির নিচে ফলছে আলু আর গাছের ডালে ফলছে টমেটো!

জগদীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রকে নিয়ে তাঁর যন্ত্রপাতিগুলি খুলে তার সূক্ষ্ম কাজ সমবেত অধ্যাপকগণকে দেখালেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে যন্ত্রের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। এই যন্ত্রগুলির সম্ভাবনা তাঁরা বেশ উপলব্ধি করতে পারলেন। এই যন্ত্রগুলির বৃহদীকরণ (magnifying power) যে এককোটি গুণ তা দেখে তাঁরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন।

অধ্যাপক মোলিশ স্বীকার করলেন জগদীশচন্দ্রের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির তুলনায় তাঁদের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত স্থূল। আর বৃক্ষের অনুভূতির শক্তি সম্বন্ধে এত জ্ঞানের ধারণা তাঁদের ছিল না। উদ্ভিদের অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁরা এতদিন জ্ঞান আহরণ করতে পারেন নি। মানুষ সেই জ্ঞান সম্বন্ধে যে কতদূর উচ্চস্তরে পৌচেছে তা তাঁরা এই সব যন্ত্রপাতি দেখে বুঝতে পারলেন। ভারতবর্ষ তাঁদের এ বিষয়ে বহু দূর পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে—এ কথা তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা বললেন যে ভবিষ্যতে এ সব বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভের জন্য তাঁদের ভারতবর্ষে যেতে হবে।

এই অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের মধ্যে একজন রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তিনি তাঁর পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে ট্রাভেলিং ফেলোশিপের বৃত্তি পেয়েছেন। তিনি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিটিং (Fitting), ভেরওর্ন (Verworn) এবং ফেফার (Pfeffer) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকগণের কাছে পাঁচ বৎসর ধরে গবেষণা করছেন।

উদ্ভিদের জীবনে শরীরবিদ্যার তিনটি জটিল রহস্যের তিনি কিছুতেই সমাধান করতে পারছেন না।

তিনি তাদের মধ্যে উদ্ভিদ-জীবনের একটি রহস্যের কথা বললেন। তিনি বললেন যে এই রহস্যটি উদ্‌ঘাটনের ওপর উদ্ভিদ-জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে। তিনি এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য গত তিন বৎসর ধরে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু তিনি উদ্ভিদ জীবনের এই অন্ধকারময় রহস্যের কোন ক্ষীণ আলোকরশ্মিরও সন্ধান করতে পারেন নি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গী তাঁর ছাত্র ডাঃ সেন সেই গবেষক ছাত্রের কাছে তাঁর সমস্যাটি জেনে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের "ইরিটেবিলিটি" শীর্ষক নূতন গ্রন্থখানি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেখানি তখন টেবিলের ওপরই পড়ে ছিল। সেই বইখানির ১৯৬ পাতা খুলে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাঁর সমস্যার কি করে সহজ সমাধান করেছেন সেটি দেখবার জন্য নিঃশব্দে সেই ছাত্রের হাতে তুলে দিলেন।

সেই গবেষক ছাত্রটি সমস্যার সমাধানের সচিত্র প্রমাণ দেখে—যন্ত্রপাতির বিবরণ ও পরীক্ষার কথা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে বলল, "This is a very brilliant piece of work।" এর জন্য আমি তিন বছর ধরে গবেষণা করে আসছি। কিন্তু এর কোন সমাধান করতে পারি নি। কিন্তু আমার আর দুটি কঠিন সমস্যা আছে—যার সমাধানের জন্য আমাকে সারাজীবন গবেষণা করতে হবে।

জগদীশচন্দ্রের ছাত্র সেই গবেষক ছাত্রকে বললেন, "আপনার দ্বিতীয় সমস্যাটির কথা জানতে পারি কি?"

গবেষক ছাত্র দ্বিতীয় সমস্যাটি বললেন।

জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ডাঃ সেন সেই পুস্তকের একটু পেছন দিকের পাতা উলটে একটি পাতা খুলে বইখানি আবার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ছাত্রট একটু নিরাশ হলেন। তারপর বললেন, "আমার আর একটা সমস্যার সমাধান বাকি রইল। সেটি হল উদ্ভিদের অটোমেটিসমের বিরাট রহস্য।"

তখন ডাঃ সেন বললেন, মশাই এটা কোন রহস্যই নয়—আর সমাধানের অযোগ্যও নয়। আপনি যদি এই বইয়েরই কুড়ি থেকে তেইশ অধ্যায় পড়েন তাহলে এর সহজ সমাধান এখানেই দেখতে পাবেন। বইতে পরীক্ষা চিত্র দিয়ে দেখানো আছে। আর সমাধানও করে দেওয়া আছে।

ছাত্রটি সেই বইখানির পাতাগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে বিস্মিত হয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন—আমার তিনটা সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। আমার আর কিছুই করবার রইল না। আর এরই জন্য আমি বিভিন্ন পরীক্ষাগারে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জীবনের দীর্ঘ পাঁচ বৎসর নষ্ট করেছি।

একটু পরে সেই ছাত্রটি জগদীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল—আমি ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরিতে) কাজ করতে পারি কি ?

অধ্যাপক মোলিশও তাঁর গবেষক ছাত্রদের কলকাতায় গিয়ে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের কাছে কাজ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁদের কি উত্তর দেবেন ? কোথায় তাঁর ল্যাবরেটরি ? কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কলেজে সেই সামান্য পরীক্ষাগারে ব্যক্তিগত কাজ করতে দিতে চান না। আর যাতে তিনি গবেষণা করতে সময় না পান সেইজন্য তাঁকে কলেজে সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘণ্টা পড়াতে বাধ্য করেছেন। হায়রে হতভাগ্য পরাধীন ভারত ! দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তান জগদীশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভাবলে অসাধ্য সাধন করেছেন। আর বিদেশী গবর্নমেণ্ট যতদূর সম্ভব তাঁর কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন।

পরদিন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা আশার অতিরিক্ত সফলতা লাভ করল। উদ্ভিদের সাড়া, আঘাতের প্রত্যুত্তরে উদ্ভিদের অনুভূতি জ্ঞাপন, উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগে উদ্ভিদের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেকটি পরীক্ষা অতি অদ্ভুতভাবে সফল হল। শ্রোতৃবর্গ এই দৃশ্যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বৃক্ষকে বিষ প্রয়োগ করার ফলে সে যখন তার দেহে মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্ন দেখাতে লাগল, সে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল—জীবন ও মৃত্যুর মাঝে যখন সে প্রাণপণে লড়াই করছে—এই সব চিত্র গাছ নিজে যখন লিখে জানিয়ে দিতে লাগল, নিজের চোখকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারল না—তখনই বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময় চরমে উঠল।

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। নির্বাক বিস্ময়ে সকলে স্তম্ভিত হয়ে আছে। অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতে উঠে বললেন, "অধ্যাপক বসুর নিকট আজ ভিয়েনার বৈজ্ঞানিকগণ যে অনুপ্রেরণা লাভ করল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আজ আমি তাঁকে তার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এতদিন আমরা নেক্রোলজি বিষয়ে অর্থাৎ মৃতপ্রায় অথবা মৃত জিনিস নিয়ে গবেষণা করে এসেছি। এই আমরা প্রথম দেখলাম যে

শবব্যবচ্ছেদের টেবিল ছাড়া জীবন ও তার রহস্য উদ্ভিদ নিজের হাতে লিখে জানিয়ে দেয়। আজ আমাদের চোখের সামনে গাছের নিজের লেখা রহস্যগুলি যদি অধ্যাপক বসু তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে আমাদের রাখতে দেন তাহলে সেই লেখাগুলি আমাদের মিউজিয়ামে বহুমূল্য স্মৃতির অবদানরূপে আমরা চিরকাল রক্ষা করব।”

অন্যান্য জার্মান বিশেষজ্ঞ শারীরবিদ্যাবিদগণ সেই রকম আনন্দই প্রকাশ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক ফেফার (Pfeffer) জগদীশচন্দ্রের কাছে এসে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন। উদ্ভিদের দেহে স্নায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে এই অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ জগদীশচন্দ্র উলটে দিলেন।

সেইজন্য জগদীশচন্দ্র তাঁর কথায় স্বভাবতই একটু সন্দিগ্ধ হলেন। তাঁর এই আমন্ত্রণ কি সত্যিই আন্তরিক! কিন্তু তাঁর একজন সহকারী জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি এই অধ্যাপকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং তাঁর কথায় সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। অধ্যাপক নিজে জগদীশচন্দ্রের বৃক্ষদেহের এই রহস্যের সমাধান নিগূঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নূতন আবিষ্কারের কথা তিনি জানতে পারলেন যখন তিনি তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌচেছেন।

জগদীশচন্দ্র ভিয়েনার বৈজ্ঞানিকগণের সামনে গবেষণার যে নূতন পথ খুলে দিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-সচিবের মাধ্যমে ভারত সরকারকে তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল। আর ইম্পিরিয়াল জার্মান গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞানের বার্ষিক পুস্তকে (The Year-book of Science) জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদের শারীরবিদ্যার আবিষ্কার আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে প্রকাশিত হল।

পরদিন অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের ভিয়েনার ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। তাঁরা ক্যালিশবার্গ (Kalishburg) গেলেন। সেই উন্নত স্থান থেকে নীচে দানিয়ুব নদীর অতি মনোরম ও অপরূপ দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল। সেই উন্নত স্থানে বসে অধ্যাপক মোলিশ তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এবং জার্মানির বৃদ্ধ সম্রাট এবং দেশের অনিশ্চিত অবস্থার কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফার্ডিনাণ্ডের আর্কডিউক সম্রাটের অবর্তমানে সিংহাসনে বসবেন।

যখন তাঁদের এই আলোচনা হচ্ছিল তখনও তাঁরা জানেন না যে ঠিক সেই মুহূর্তে এবং সেই স্থানের নিকটেই পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবার মত ঘটনার সমাবেশ হচ্ছে। কিন্তু পরদিন প্যারিসে পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত এই ফার্ডিন্যাণ্ডের আর্কডিউকের হত্যার সংবাদ তাঁরা পাননি।

প্যারিসে জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র স্থির করেছিলেন যে প্রথমে তাঁরা যাবেন প্যারিস। তারপর সেখানে থেকে ষ্ট্রাসবুর্গ, লিপজিগ, হেল, বার্লিন, বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা সেরে তাঁরা মিউনিকে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে উপস্থিত হবেন।

জগদীশচন্দ্র এর পূর্বে দুবার প্যারিসে বক্তৃতা করে গিয়েছেন। সুতরাং তিনি পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিক হিসেবে সেখানে সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আবিষ্কার সম্বন্ধে সরবোনে বৈজ্ঞানিক অ্যাকাডেমিতে ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করে গিয়েছেন। সে সময়ে পঁয়কারে, কর্নু, মাসকার্ট, লিপম্যান, কইলেটেট (Cailletet), বেক-কোয়েরেল (Becquerel) প্রভৃতি ফরাসী মনীষীগণ তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। তখন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কর্নু সায়েন্স অ্যাকাডেমির সভাপতি ছিলেন। তিনি তখন তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর চিঠির শেষে তিনি লিখেছিলেন—"You should try to revive the grand traditions of your race which bore aloft the torchlight of science and art and was the leader of civilisation two thousand years ago. We, in France, applaud you."

এম পঁয়কারে ছিলেন ফরাসীরাষ্ট্রের সভাপতির ভাই। তিনি ফরাসী দেশে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষী বলে পরিচিত। তিনি তাঁর "বৈদ্যুতিক তরঙ্গ" নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকে "জগদীশচন্দ্র বসু নামক হিন্দু বৈজ্ঞানিক যুবকের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারগুলি" লিপিবদ্ধ করেছেন।

এবার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক মনীষী জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন যে পদার্থবিদ্ জগদীশচন্দ্র এবার দেহবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা দেশে, এতই কৌতূহলের সৃষ্টি করল যে তাঁরা ফ্রান্সে "Le Temps" নামে একখানি শ্রেষ্ঠ

পত্রিকার বৈজ্ঞানিক সম্পাদককে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে সভায় উপস্থিত থাকতে বললেন। সেই পত্রিকার একটি বিশেষ বিজ্ঞান সংস্করণে এই বক্তৃতার দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হল।

প্যারিসে জগদীশচন্দ্রের এইবারের বক্তৃতা একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ এই বক্তৃতার প্রধান পরীক্ষা এই প্রথম ও শেষ বারের জন্য সফল হয় নি।

বক্তৃতার সময় উদ্ভিদ তার স্নায়ুর কাজ সুন্দর দেখাল। তারপর তাকে এক দাগ পটাসিয়াম সায়ানাইড দেওয়া হল। শ্রোতৃমণ্ডলী রুদ্ধনিশ্বাসে বৃক্ষের স্নায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হবার প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে জগদীশচন্দ্রের সহকারীদের আতঙ্কিত করে সেই গাছ মরা দূরে থাক আরও আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করতে লাগল।

এরকম আশ্চর্য ঘটনা তো কখনও ঘটে নি। গাছের তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটাবার জন্য সহকারী আর একটু বেশী ডোজ পটাসিয়াম সায়ানাইড গাছের ওপর প্রয়োগ করলেন। সহকারী হতাশ হয়ে দেখলেন যে পটাসিয়াম সায়ানাইডের গাছের ওপর কোন প্রতিক্রিয়াই হল না। তখন সহকারী সেই পটাসিয়াম সায়ানাইডের এক ফোটা তাঁর নিজের জিভ দিয়ে আস্বাদ করে দেখলেন। না—এতো পটাসিয়াম সায়ানাইড নয়! এ যে মিষ্টি! এ যে চিনির শরবত!

সুখের বিষয় তাদের কাছে ক্লোরোফর্ম্ ছিল। সেই ক্লোরোফর্ম্ গাছকে একটু বেশী মাত্রায় দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হল। তারই ফলে গাছ শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

এখন পটাসিয়াম সায়ানাইড কি করে চিনির শরবতে পরিণত হল তার রহস্যটা হল এই।

প্যারিসে পরীক্ষা দেখাবার আগে জগদীশচন্দ্রের সহকারী দেখলেন যে ইউরোপে যে সব পরীক্ষা দেখাতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম সায়ানাইড সব ফুরিয়ে গিয়েছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া বিদেশে একজন অপরিচিতের পক্ষে পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যখন তাঁরা এই দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলেন তখন তাঁরা যাঁর বাড়ীতে অতিথি ছিলেন তাঁর কন্যা স্বেচ্ছায় এই বিষাক্ত ওষুধটি সংগ্রহ করে দিতে চাইল। সে বলল যে পাশের রাস্তাতেই তাদের পরিচিত একটা ওষুধের দোকান আছে।

সুতরাং সেখানে তাদের সায়ানাইডের জন্য কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে না।

মেয়েটি ওষুধ আনতে চলে গেল।

ডাক্তারখানায় গিয়ে মেয়েটি বললে যে, "প্রাচ্যের একজন বৈজ্ঞানিক এসেছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখাবেন যে ঠিক মানুষের মতই উদ্ভিদের স্নায়ু ও অনুভূতির শক্তি আছে। একটা গাছকে হত্যা করবার মত সামান্য একটু পটাসিয়াম সায়ানাইড আপনি নিশ্চয়ই দেবেন এই আশায় আমি এসেছি।"

ফরাসীরা অত্যন্ত ভদ্র। যদিও দোকানের মহিলা কর্মচারিণী সেই মেয়েটির এই অত্যাশ্চর্য গল্পের একটি কথাও বিশ্বাস করল না তবুও সে এই মেয়েটিকে একটি নমস্কার করে বললে, "ম্যাদেময়সেল, আপনার যে আমি একটু উপকারে লাগতে পারছি এর জন্য আমি খুব অনুগৃহীত।"

সে কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্থির করল যে এই "ইয়ং লেডি" নিশ্চয়ই কোন "লাভ অ্যাফেয়ারে" হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তাই সেই মহিলাটি সায়ানাইডের মত দেখতে একটা সাদা তরল পদার্থ চিনির শরবত তৈরী করে দিল। সুতরাং গাছ যে পটাসিয়াম সায়ানাইডের বদলে মিষ্টি শরবত খেয়ে মারা গেল না, তাতে গাছের কোন অপরাধ নেই! দয়ার্দ্র চিত্ত কম্পাউণ্ডারের কাজেই গাছের মৃত্যু হল না।

* * * *

এইবার জগদীশচন্দ্রকে লণ্ডনে ফিরবার জন্য বিলেত থেকে একটি তার এল। লর্ড ক্রু তখন ভারতের সচিব। তাঁর কাছে বিলেতের বৈজ্ঞানিকরা জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তিনি জগদীশচন্দ্রের লণ্ডনের ময়দা ভেলের পরীক্ষাগারে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে চান। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের জার্মানি ভ্রমণ ত্যাগ করে লণ্ডনে ফিরতে হল।

জগদীশচন্দ্র স্থির করেছিলেন যে ২রা আগস্ট তিনি জার্মানির বন শহরে যাত্রা করবেন। এবং ৪ঠা আগস্ট থেকে জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করবেন। কিন্তু তাঁরা আগে থেকে সময়মত গাড়ী রিজার্ভ করে না রাখতে পারলে তাঁর লাজুক ও স্পর্শকাতর গাছপালা ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু এই সময় জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেই সৈন্য চলাচল আরম্ভ হল। জগদীশচন্দ্রও

যাবার জন্য গাড়ী রিজার্ভ করতে পারলেন না। তাই তাঁদের আর সে যাত্রা জার্মানি যাওয়া হল না। এদিকে ৪ঠা আগস্ট থেকেই বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

ময়দাভেল পরীক্ষাগারে ক্রুকস্

লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভাপতি তখন সার উইলিয়াম ক্রুকস্ (Sir William Crookes)। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে আসছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আবিষ্কার হল "রেডিয়েণ্ট ষ্টেট অফ ম্যাটার"। তাঁর আবিষ্কার "ক্রুকস্ টিউব" থেকেই রঞ্জন রশ্মি ও ইলেকট্রন আবিষ্কারের সূত্রপাত। তখন একটা কথা প্রচলিত ছিল, 'যেখানেই ক্রুকস্ সেখানেই আলো'। ("Where there is Crookes, there is light".) স্যার উইলিয়াম ক্রুক্সের বয়স তখন ৮৩ বৎসর। এই বৃদ্ধ ক্রুকস্ তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র যখন ইতিপূর্বে ১৮৯৫ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দুবার বক্তৃতা দেন, দুবারই সেই সভায় স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি এইবার জগদীশচন্দ্রের ময়দাভেলের পরীক্ষাগারে "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফসের" যন্ত্রে কিরূপে গাছ তার নিজের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিজে লিপিবদ্ধ করে তাই দেখতে এলেন।

জগদীশচন্দ্র স্থির করেছিলেন যে তাঁর "কণ্ট্রোল অফ নার্ভাস ইম্পাল্‌স" নামে নূতন আবিষ্কারটি তিনি রয়েল সোসাইটিতে প্রথম পরীক্ষা করে দেখাবেন। ক্রুকস (সভাপতি) রয়েল সোসাইটির সম্পাদক বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ স্যার রোজ ব্রাডফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য ময়দাভেলে এলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর নূতন আবিষ্কার "কণ্ট্রোল অফ নার্ভাস ইম্পালস" তাঁদের সামনে পরীক্ষা করে দেখালেন।

রয়েল সোসাইটির সভাপতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস বিজ্ঞানচার্য জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষা দেখে গিয়ে জগদীশচন্দ্রকে এই চিঠিখানি লিখে পাঠালেন :—

"আপনার আবিষ্কৃত কৌশলময় ও অভিনব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা দ্বারা আপনি বৃক্ষের অঙ্গের বৈদ্যুতিক ও অপরাপর ক্রিয়ার অনুভূতি ও তাদের জীবনের স্পন্দন যখন বাইরের কোন শক্তি তাদের ওপর কাজ করে না, তাদের দ্বারাই

তাদের অনুভূতির স্বয়ংক্রিয় লিপির কৌশল দেখে আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। আপনার আবিষ্কৃত শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার এই পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "কেমিক্যাল নিউজ" পত্রিকায় আমি এই আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশ করব যাতে অপর সকলে আপনার এই নূতন আবিষ্কারের কথা পড়ে জানতে পারবে।"*

তারপর জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটিতে কনট্রোল অফ "নার্ভাস ইম্পালসের" বিষয় বক্তৃতা করলেন। এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা সকলে বেশ বুঝতে পারলেন। তখন রয়েল সোসাইটিতে তাঁর নূতন আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হল।

শারীরতত্ত্ববিদ

ইউরোপে বিজ্ঞানের এক শাখার বিজ্ঞানী অন্য আর এক শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করলে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়। বিজ্ঞানীরা তার প্রতিবাদ করে। এটা তারা সহ্য করে না। এই জন্যই ইউরোপের বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিদ্যা থেকে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন। অধিকাংশ শারীরবিদ্যাবিদ জীবনের রহস্যকালে একটা অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এই কথা বলে তাঁদের অজ্ঞতা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন। জগদীশচন্দ্র জীবিত ও জড়ের মধ্যে একটা সাড়ার পারম্পর্য দেখিয়েছেন। একজন বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ স্বীকার করেছেন যে এতদিন তিনি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের এই ফল প্রাচ্যমনের একটা স্বপ্নজাল বলে মনে করে এসেছেন এবং তাঁরই "কাষ্টিং ভোটে" রয়েল সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

"ডাঃ বোস, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনিই ঠিক পথে চলেছেন আর আমরা এত দিন বরাবর ভুলপথে চলেছিলাম।"†

* "I was much impressed by the most ingenious and novel self-recording instruments, whereby you are able to make plants automatically record their response to electric and other stimulations and their own movements when no outside stimulous affects them. The means of physiological investigation thereby afforded is of much importance. I will give a review of your researches in the *Chemical News* so that others may be able to read and understand the novel facts you have discovered."

† "Dr Bose, now I see that you have been in the right and we have all along been wrong".

লণ্ডনে ময়দাভেল পরীক্ষাগার
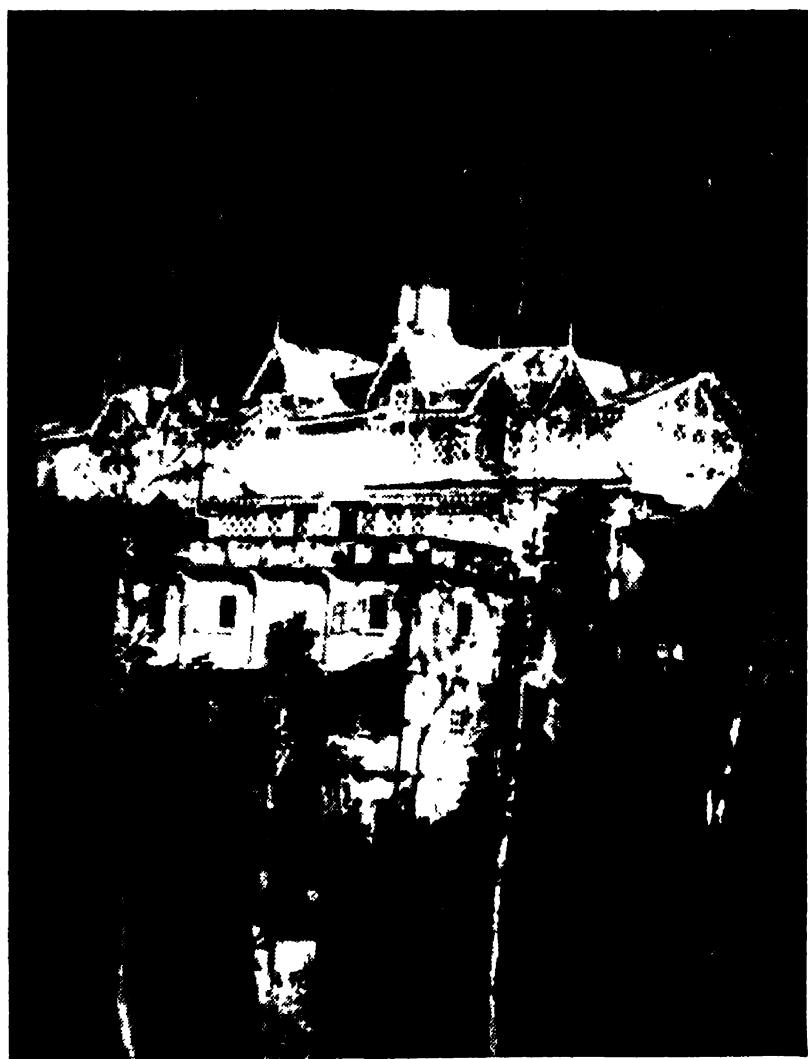
দার্জ্জিলিংয়ে মায়াপুরী পরীক্ষাগার (৭০০০ ফুট)

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সের অধ্যাপক ফার্মার (Farmer) প্রথম জগদীশচন্দ্রের কাছে ময়দাভেল পরীক্ষাগারে এলেন। তিনি "ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সের" পক্ষ থেকে তাঁদের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য জগদীচন্দ্রকে আন্তরিক আহ্বান জানালেন। ওদিকে অধ্যাপক ব্ল্যাকম্যান বটানিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক অলিভার জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত বিষয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ময়দাভেল পরীক্ষাগারে তিনি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত বিষয়গুলির পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক ষ্টারলিং, "উদ্ভিদকে প্রশ্ন করলে তাদের নিজে নিজে উত্তর দেবার যে অভিনব ও অপূর্ব কৌশলপূর্ণ যন্ত্র আপনি আবিষ্কার করেছেন তা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি" বলে জগদীশচন্দ্রকে একখানি চিঠি লিখলেন।

ইউরোপের বিখ্যাত স্নায়ুবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক সেরিংটন উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্নায়ুর মিল দেখে একান্ত অভিভূত হয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের অপূর্ব সম্ভাবনা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। যে সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদ এত দিন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিরুদ্ধতা করে এসেছেন এখন তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

ময়দাভেলে সাহিত্যিক সঙ্ঘ

"লণ্ডন ডেলি নিউজের" সম্পাদক গার্ডনার একদিন এসে ময়দাভেল পরীক্ষাগার দেখে গিয়ে "হিউম্যান প্লাণ্ট" সম্বন্ধে তার "ডেলি নিউস" সংবাদ পত্রে এক অত্যন্ত প্রশংসাপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন, "In these days it seems to be impossible to live more than a few weeks at a time without receiving some more or less serious mental shocks···Just now Prof. J. C. Bose is giving people shocks in Maida Vale. If you watch his astonishing experiments with plants and flowers you have to leave an old world behind and enter a new one. The world where plants are merely plants becomes mercilessly out of date and you are forced abruptly into a world where plants are almost human beings. Prof. Bose makes

you take the leap when he demonstrates that plants have a nervous system quite comparable with that of men and makes them write down their life history. So you step into yet another world......"

"Lens" ছদ্মনামে একজন বিখ্যাত লেখক লণ্ডনের "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় "এক্‌স ওরিয়েন্টি লাক্স" (Ex Oriente Lux) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার শেষে তিনি লিখলেন—

"The old idea of a University as a collection of books has yet yielded place to the truth. The Indian Universities founded as examining bodies, have done some teaching, no doubt, but still await their true development into places where truth is wrested from the unknown for the service of mankind. I make, not therefore, my head a grave but a treasure of knowledge, wrote Sir Thomas Brown. The library or collection of books, is too often a mere cemetery of knowledge; a real University is a treasure of that most treasurable kind which gives itself freely to all and yet ever accumulates and a real University cannot, I believe, fail properly to value such a growing point of vital knowledge as is the work of Prof. Bose."

মিঃ ম্যাসিংহাম

বিলেতের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক পত্রিকা হল "নেশন"। তার সম্পাদক ম্যাসিংহাম জগদীশচন্দ্রের ময়দাভেল পরীক্ষাগার দেখে তাঁর পত্রিকায় লিখলেন :—

"In a room near Maida Vale, there is an unfortunate Carrot, strapped to the table of an unlicensed invisector. The wires of an electric battery pass through two glass tubes full of white substance : they are like two legs whose feet are buried in the flesh of the carrot. When the vegetable is pinched with a pair of forceps it winces. It is so strapped that the shudder of pain pulls an electric recorder to which is attached a tiny mirror. This casts a beam of light on the frieze at the other end of the room and thus

enormously exaggerates the tremor of the Carrot. A pinch near the right hand tube sends the beam seven to eight feet to the right, a pinch near the other wire sends it as far to the left. Thus can science reveal the feelings of even so stolid a vegetable as the carrot…… ..”

জর্জ বার্নাড শ

জর্জ বার্নাড শর নাম ইংরেজী সাহিত্যে ও নাট্য জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিনি ছিলেন একজন নিরামিষভোজী। তিনি জীব হিংসা করতেন না, সেই জন্য তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন। এ জন্য তিনি আন্তরিক আনন্দিত ছিলেন। কিন্তু এই ময়দাভেলে যখন তিনি স্বচক্ষে দেখলেন যে একটা কপিকে একটা চিমটি কাটলে সে থর থর করে কাঁপে আর তার ছাল ছাড়ালে সে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে তখন তাঁর অন্তরে একটা আঘাত লাগল। আর তিনি নিরামিষাশী বলে মনে মনে যে অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করতেন তাঁর সে ধারণার মূলে একটা কুঠারাঘাত হল।

আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক গিলবার্ট মারে ময়দাভেল পরীক্ষাগার দর্শন করে জগদীশচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন :—

"রয়েল ইনষ্টিটিউশনে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দুবার আপনার বক্তৃতা পড়েছি। এ রকম অল্প পরিসরে এমন সুন্দর বিবৃতির পেছনে কত শ্রম ও ধৈর্যসাধ্য ব্যাপার রয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি। পৃথিবী আগে যে রকম ছিল এর পর নিশ্চয়ই তার চেয়ে আরও আশ্চর্যজনক স্থানে পরিণত হবে বলে মনে হচ্ছে।"

অধ্যাপক কার্ভেথ রীড

"মেটাফিজিক্স অফ নেচার" নামক পুস্তকের রচয়িতা অধ্যাপক কার্ভেথ রীড তাঁর পুস্তকে লিখেছেন—

"Whoever grants consciousness to the new hatched chick but denies it to the new-laid egg can only excuse

* "I have read your Discourse at the Royal Institution twice with extraordinary interest and I think I can realise the immense amount of skilful and patient work that lies behind such a short and clear statement. It certainly makes the world seem even more wonderful than it did before".

his rejection of continuity by some device of conjuring a ghost into the chicken. Again the simplest forms of life are undistinguishably animal or vegetab and if the least organised plant life is indistinguishable from animal life that is admitted to become consciousness, it is arbitrary to deny consciousness of such plant life. Having got so far beyond the range of human sympathy as the level of plant life, the principle of continuity carries us further and points to some actuality even in the organic nature, however vague and undifferentiated. J. C. Bose in his "Response in the Living and Non-living", after showing that under stimulus, plants exhibit fatigue and are affected like animals by anaesthetics and poisons, goes on to prove the same properties of tin and platinum wire. Those also become fatigued ; there is a threshold of response ; sublimal stimuli become effective by repetition ; response increases with the intensity of stimulus up to a certain point ; some substances act as stimulants upon tin and platinum, others as poisons destroying all response ; a small dose may increase the response ; and a large dose of the same may abolish it. The resemblance of these results to some of those obtained in physiological psychology is obvious. Inorganic matter is much simpler than organic ; the simpler an organism the simpler its consciousness ; hence no doubt inorganic consciousness is the simplest of all."

ভারতসচিব লর্ড ক্রু

লর্ড ক্রু ময়দাভেলে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগার দেখবার ইচ্ছা করলেন। ভারত অফিসের সব কর্মচারী এবং আণ্ডার সেক্রেটারিকে তিনি এই সব আবিষ্কারের নূতন পন্থার উদ্ভাবন সম্বন্ধে অবহিত হতে বললেন।

তিনি একদিন সকলকে নিয়ে পরীক্ষাগার দেখতে এলেন।

পরীক্ষা দেখার পর জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারে তিনি এবং ভারত গবর্নমেণ্ট গর্ববোধ করেন একথা প্রশংসার সঙ্গে বললেন। তিনি আরও বললেন, "পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ভারতবর্ষের এই অবদানে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।"

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র

৪ঠা আগস্ট। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। এইদিন জগদ্ব্যাপী প্রথম মহাসমর আরম্ভ হল। তার তিন মাসের মধ্যেই খবর এল যে, একখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও কয়েকখানি বাণিজ্য জাহাজ ইংলিশ চ্যানেল আর আইরিশ সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে। জার্মানরা যে ইংলিশ চ্যানেলে এসে সাবমেরিন দিয়ে যুদ্ধ-জাহাজ বা অন্য জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গেল—একথা বিশ্বাস করাও কঠিন। তারপর অতলান্তিক মহাসমুদ্রে "লুসিটানিয়া", "দি আরেবিক" আর "দি সিমরিক" নামক তিনখানি জাহাজও জার্মানরা টর্পেডো দিয়ে ডুবিয়ে দিল। সুতরাং অতলান্তিক মহাসমুদ্রে জাহাজে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

পূর্বে স্থির ছিল যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র এই তিনখানি জাহাজের একখানিতে আমেরিকা যাবেন। তিনি আমেরিকান জাহাজ 'ফিলাডেল-ফিয়া'তেই অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়াই স্থির করলেন, যদিও এখানিকে ঠিক সমুদ্রগামী জাহাজ বলা যায় না।

জাহাজ ছাড়ল। সেই জাহাজে তাঁদের একজন আমেরিকান সহযাত্রী ছিলেন। তিনি একজন ধনী আইন-ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর কথাবার্তায় নিজের দেশের গৌরবের চিত্র তাঁর সহযাত্রীদের মনে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বলতেন, "পৃথিবীতে যে একশতটি উন্নতিকর আবিষ্কার হয়েছে, তার মধ্যে ৮৭টি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের ছোট্ট স্টেট 'মেরিল্যাণ্ডে'। পৃথিবীর সমস্ত অর্থের পরিমাণের ৯০ ভাগ হল আমেরিকায়। আমরা বোকার মত সেই মান্ধাতার আমলের ১২০ টন ওজনের কামান আর সুপার ড্রেডনট তৈরি করিনে—যা দিয়ে ইউরোপ যুদ্ধ জয় করবার আশা করছে। কামান ২০ মাইল পর্যন্ত গোলা ছুঁড়তে পারে। আমরা এ সব তৈরি করবার চেষ্টাও করিনে। আমরা এমন একটা রাসায়নিক জিনিস তৈরি করেছি, যা ২০ মাইল নয়—২০০ মাইল স্রেফ শূন্য করে ছেড়ে দেবে।"

যাই হোক, এই সব গল্প শুনতে শুনতে আচার্য জগদীশচন্দ্র নভেম্বর মাসের শেষে নিউ ইয়র্কে এসে উপস্থিত হলেন। আমেরিকার কয়েকখানি সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই জগদীশচন্দ্রের জগদ্বিখ্যাত ও যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকার তখনকার অধিকাংশ অধ্যাপকই শিক্ষা পেয়েছিলেন জার্মানিতে। আর জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারগুলি জার্মান অধ্যাপকদের প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধী। সুতরাং এইবার জগদীশচন্দ্রকে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হল।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা দিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি সমগ্র আমেরিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। এর বাৎসরিক ব্যয় সাত কোটি টাকা। এখানে আমাদের দেশের মত অর্থের অভাবে গবেষণার সুযোগের অভাব হয় না।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে "উদ্ভিদের জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তারই ফলে জগদীশচন্দ্রের কাছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালে (Summer term) "গাছের সাড়া" সম্বন্ধে বৈদ্যুতিক গবেষণা ("Electrical Research on Irritability of Plants") বিষয়ে বক্তৃতা দেবার আহ্বান এল। তাঁর বক্তৃতা শুনে বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে আলোচনা করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে রকফেলার ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক লোয়েব (Prof. Loab) একজন। (তাঁর পুস্তক "Artificial Fertilisation by Purely Chemical Stimulus" তখন জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল।)

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। বক্তৃতার শেষে সভাপতি মশাই এই আশ্চর্য আবিষ্কার এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় মূল্যবান তথ্যে পরিণত হয়েছে দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন—"এতদিন তাঁরা তাঁদের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্য জার্মানিতে পাঠাতে বাধ্য হতেন। এবার যদি তাঁরা তাঁদের ছাত্রদের নূতন জগতের গবেষণার জন্য ভারতবর্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিকট পাঠাতে পারেন, তবে তাঁরা কৃতজ্ঞ হবেন।"

বক্তৃতার পর জগদীশচন্দ্র কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই চিঠিখানি পেলেন—"কলম্বিয়ায় আমাদের ছাত্রগণ আপনার অসাধারণ বিষয়বস্তু ও পরীক্ষায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তার জন্য আমি এই বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্বতঃলিপিবদ্ধ বৃক্ষের ভিতরকার হ্রাস-বৃদ্ধি ও দেহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদ যে-ভাবে সাড়া দেয়—এই সমস্ত বিষয়ে আপনি যে সব বিষয় প্রমাণ করেছেন,

তার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। এর পূর্বে বৃক্ষের ভিতরকার প্রক্রিয়া মাপতে এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আমরা আশা করি যে যে সব বিদেশী ছাত্র আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, তাদের আপনার পরীক্ষাগারে শিক্ষার সুযোগ দেবেন।"*

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেহবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক মারকোয়েট (Prof. Marquette) তাঁকে লিখলেন—"এ বৎসর আপনার আশ্চর্য 'রেসোনেন্ট রেকর্ডার' নামক একটি যন্ত্র যদি পাওয়া যায়, এই আশায় আপনাকে এই পত্র লিখিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের শারীরবিজ্ঞান পরীক্ষাগারে আপনার এই যুগান্তকারী যন্ত্রটি ব্যবহার করতে চাই।"

আমেরিকায় প্রতি বৎসর একটি বিজ্ঞান সম্মেলন হয়ে থাকে। সেখানে সব বিজ্ঞান বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হয়ে বৎসরের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার-সমূহের আলোচনা করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পেনিসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সর্ব-আমেরিকান বিজ্ঞান সম্মেলন বসে। জগদীশচন্দ্র এই সম্মেলনে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি সমেত তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সাদর নিমন্ত্রণ পেলেন।

সে বৎসর ডিসেম্বর মাসে আমেরিকায় শীত বড় কঠোররূপে দেখা দিল। জগদীশচন্দ্রের আমেরিকার এই কঠোর শীতের অভিজ্ঞতা ছিল না। একদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হয়ে গেল। এখানকার তাপমাত্রা এত কমে গেল যে নদীর জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র যে সমস্ত গাছপালা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন হয়ে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিভাগের সংযুক্ত "হট হাউসে" তাপমাত্রা উচ্চতম ডিগ্রীতে তুলে তাঁর গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা হল। কিন্তু তাতেও উত্তাপ যথেষ্ট হল না। তখন সেখানে কয়েকটা বৈদ্যুতিক উনান জ্বেলে শীতে সঙ্কুচিত

* "Our students in Columbia have been most deeply interested in your work and for them I wish to express the thanks of the Department for your most interesting and stimulating lectures and demonstrations. Your automatic recording apparatus makes it impossible to attack by quantitative methods, the fundamental problem of plant growth and response to stimuli and the results you have obtained offer for the first time from plant organisms for a truly general physiology of both plants and animals. In the field of response to stimuli no such instruments of precision have hitherto been available for plant physiologists It is to be hoped that facilities may be provided, in your laboratory for the reception of foreign students who are desirous of familiarising themselves first hand with your apparatus and methods."

গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা হল। কিন্তু যারা সেই "হট হাউসে" সেই গাছ-গুলিকে দেখতে এলেন, তাঁরা প্রথমে সেই অসহ্য গরমে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের কৌতুহল নিবৃত্ত হল না।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে সেই বিজ্ঞান সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদবিদ্যায় অপূর্ব আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করে সকলে আশ্চর্য ও চমৎকৃত হলেন। বক্তৃতার শেষে সকলে তাঁকে ঘিরে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তাঁবই। তারপর আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্রের যে সব বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হল, তার একটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।

"ভারতীয় অধ্যাপক প্রাণী ও উদ্ভিদকে এক স্তরে এনেছেন।

কলিকাতার বৈজ্ঞানিক অভিনব তথ্য ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

পেনিসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফব দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের অধিবেশনে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত হয়, তা তিনি অভিনব, নিঃসন্দেহ ও আশ্চর্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে. চন্দ্র বোস সেই সমবেত শত শত বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধানীদের মধ্যে তাঁর অপূর্ব তথ্য আবিষ্কারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছেন।"*

* * * *

আমেরিকার পূর্ব উপকূলে তিনটি প্রধান শহর আছে। একটি হল ফিলাডেলফিয়া। দ্বিতীয়টি হল নিউইয়র্ক আর তৃতীয়টি হল বোস্টন। ফিলাডেলফিয়া শহরে আমেরিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান "ফিলসফিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা" বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্থাপন করেন।

* Indian Professor links Plants and Animals.

Calcutta Scientist Gives Starlting Demonstrations.

New, unsuspected and even startling similarities between the behaviour of plants and animals were revealed at the University of Penysylvania before the American Association for the Advancement of Science'. Dr. J. Chunder Bose, the Indian scientist made an extraordinary and impressive figure among the hundreds of assembled scientists. In the opinion of his compeers, he placed himself, by his experiments, among the foremost of the biological investigators."

এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডবলিউ কীন (W. W. Keen) সমগ্র পৃথিবীতে মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ শল্যবিদ্যা চিকিৎসক বলে বিখ্যাত। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রকে এই প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে ও তথ্য প্রমাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সকলেই চমৎকৃত হলেন।

পরদিন ফিলাডেলফিয়ার সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হল * :—

"কাল বিজ্ঞান জগতে আর একটি নূতন আবিষ্কার হল, যখন হিন্দু বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে. সি. বসু সমবেত বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের সভায় একটি বৃক্ষকে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করে সেই উদ্ভিদ-দেহের স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ করে দেখালেন। এই পরীক্ষার সাফল্য (এই সর্বপ্রথম প্রদর্শিত) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আশ্চর্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি সপ্রমাণ করেছেন যে, কতকগুলি উদ্ভিদ বৈদ্যুতিক উত্তেজনার তিন সহস্র ভাগের একভাগেও সাড়া দেয়। অথচ মানুষের জিহ্বার অগ্রভাগ তার দশগুণ বেশী উত্তেজনাও অনুভব করতে পারে না। ডাঃ বসু আরও যে সমস্ত উদ্ভিদ-দেহের নূতন তথ্য দেখিয়েছেন তাও অতি আশ্চর্য বলে সকলে স্বীকার করেছেন।"

ফিলাডেলফিয়ার পর নিউ ইয়র্ক অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠান থেকে জগদীশচন্দ্রের নিকট বক্তৃতা দেবার আহ্বান এল। এই বক্তৃতায় যাতে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে তার জন্য ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বিশাল হলে বক্তৃতার আয়োজন হল। সমগ্র পৃথিবীতে এত বড় জাদুঘর আর নেই। এখানে বক্তৃতা শুনবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। তখন সকলকে জানাবার জন্য এখান থেকে এই বুলেটিন প্রচার করা হল :—

"এই অ্যাকাডেমীতে অধ্যাপক বসু উদ্ভিদের অব্যক্ত জীবনের গোপনরহস্য তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করবেন। উদ্ভিদ নিজেই তার দেহের

* Another addition was made yesterday to the list of great scientific achievements, when Dr. J. C. Bose, the Hindu scientist before the distinguished gathering of Surgeons & Botanists successfully anasthetised a plant & then measured its nerve reactions. The more success of the operation which was the first of its kind was acclaimed marvellous by those present. He showed how some plants would respond to one three millionth part of a standard electrical stimulus while the tip of the human tongue was unable to perceive a stimulus ten times as strong. Even more noteworthy, it was declared, was the wide synthetic generalisation which Dr. Bose reached."

আঘাত ও বেদনা, হর্ষ ও দুঃখ জানাবে, যা তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ হবে। প্রাণীর জীবনের ন্যায় বৃক্ষের জীবনেও আনন্দ বা আঘাতের অনুভূতি দেখা দেয়। তিনি এখানে যে সব পরীক্ষা দেখাবেন সে হল উদ্ভিদের অনুভূতি জ্ঞাপনের সময়-পরিমাপক যন্ত্র, তার দেহের স্পন্দন, তার দেহের উপর বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া, বিষের ক্রিয়া, ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া ইত্যাদি। তাদের হৃৎস্পন্দনের কথাও তিনি প্রমাণ করবেন। উদ্ভিদ মৃত্যুর আঘাতে তার দেহের ভিতর একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাও তিনি দেখাবেন। এই সমস্ত গবেষণা, কৃষি, শারীরবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যায় নূতন আলোকসম্পাত করবে।"

এই বুলেটিনে যে আশা ব্যক্ত করা হল, শ্রোতৃবর্গ জগদীশচন্দ্রের "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফস্" শীর্ষক বক্তৃতা শুনে তার চেয়েও সন্তুষ্ট হলেন। বক্তৃতার পর এই "নিউইয়র্ক অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস"এর সভাপতি জগদীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়ে যে পত্রখানি লেখেন, তার মর্মার্থ এখানে দেওয়া হল :—

"প্রিয় অধ্যাপক বসু,

আপনার "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ" শীর্ষক আশ্চর্য বক্তৃতা শুনে আমরা যে আপনার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে বিষয় আপনি এত সুন্দরভাবে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া এবং উদ্ভিদের দেহে নানা আঘাতের সাড়া প্রমাণ করেছেন তাতে আপনার প্রত্যেক শ্রোতা তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়েছিল। আপনার বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবর্গ 'হল' ছেড়ে যেতে দ্বিধাবোধ করছিল। অ্যাকাডেমিতে এ পর্যন্ত যে সব বক্তৃতা হয়েছে, আপনার বক্তৃতা তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। আমরা এ বিষয়ে আপনার গবেষণার সাফল্য কামনা করি। আপনার গবেষণা অভিনব এবং আপনি এ গবেষণার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপনাকে আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার জন্য পাঠিয়ে বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।"

বিখ্যাত 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রের সম্পাদক নিজে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনলেন। তারপর তাঁর যন্ত্রপাতিও পরীক্ষা করে গিয়ে তাঁর পত্রিকায় একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তার একটি অংশ এখানে দেওয়া হল :—

"The dramatically interesting investigation on "Plant Autographs" is highly significant. It was conducted by

Prof. Jagadish Ch. Bose as a continuation of a remarkble series of studies which culminated in positive proof that inorganic matter is as responsive to crucial electrical tests as organic matter. The investigations prove further that there is no difference between plant and animal life in response to environment and the barrier long supposed to exist between the two is purely arbitrary. There is but one matter, one science, one truth and all outwardly different matters, all sciences and all truths are part of a great unity. It is poetically fitting that this should have been taught by a descendant of Hindu philosophers. In this remarkable investigation, the synthetic intellectual methods of the East co-operate with the analytical methods of the West in a single mind. In science, at least all nations meet on a common ground of understanding, although half the nations of the world are at war."

"সায়েন্টিফিক আমেরিকান" পত্রের সম্পাদক বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি কথা বাদ দিয়ে জনসাধারণের বোধগম্য করে আমেরিকায় আর একটি বিখ্যাত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বললেন, "কল্পনা ও ধারণাশক্তির অতীত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে, বৃক্ষেরও স্নায়ুকেন্দ্র আছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের দেহে আঘাত লাগলে যেমন তার শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়, একটা গাজর বা একটা শালগমের শরীরে আঘাত লাগলে তার দেহেও ঠিক সেই রকম প্রতিক্রিয়া হয়। তারাও মদ খেলে মাতাল হয়, একটা কিল খেলে আঘাতের চিহ্ন দেখায়, ক্লোরোফরম দিলে অজ্ঞান হয়। ক্লান্ত হলে শ্রান্তির চিহ্ন প্রকাশ করে, আর আলস্যে রোগা হয়ে যায়। ভেষজ ওষধি ও বৈজ্ঞানিক কৃষিবিজ্ঞানে এরই ফলে সুদূরপ্রসারী নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে উন্নতি বিধান করবে। তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে মানুষের পায়ের তলার মাটি, বদ্ধ জলাশয়ে যে শেওলা জন্মায় তার এবং মানুষের নিজের মধ্যে একটা সাম্যের বিধান আছে।"

বোস্টনে জগদীশচন্দ্র

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে (১লা জানুয়ারী, ১৯১৬) আমেরিকার কৃষ্টি ও নৈতিক কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান "বিংশ শতাব্দী ক্লাবে" (Twentieth Century Club) জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা দেবার আহ্বান এল। সেই সভায় জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনবার জন্য বোস্টনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "ম্যাটার অ্যাণ্ড থট"। ক্ষুদ্র রাজ্য ম্যাসাচুসেটেসের রাজধানী হল বোস্টন। গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল ইনষ্টিটিউশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বোষ্টনবাসী কাউণ্ট রামফোর্ড (Count Rumford)। এই বোস্টনের অধিবাসী ছিলেন বৈদ্যুতিক বিশেষজ্ঞ মর্স (Morse) এবং বৈজ্ঞানিক লুইস আগাসিজ (Louis Agassiz)। এই বোস্টন শহরেই প্রথম প্রমাণিত হয় ঈথারের জ্ঞান লোপ করবার শক্তি আর এখানেই বেল (Bell) প্রথম মানুষের কথা তারের ভেতর দিয়ে পাঠাতে সমর্থ হন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় এবারও আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস্টন শহরে এসে এখানকার বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। জগদ্বিখ্যাত ও জ্যোতির্বিদ অধ্যাপক লাউয়েন, যিনি মার্স উপগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন, তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্র পরস্পরের আবিষ্কার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন।

মার্গারেট ডিল্যাণ্ড বোষ্টনের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি জগদীশচন্দ্রকে এক অভ্যর্থনা সভায় আমন্ত্রণ করলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ রমণী মিসেস জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ-এর (Mrs Julia Ward Howe) সঙ্গেও জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়।

ওয়াশিংটনে জগদীশচন্দ্র

বোষ্টন থেকে জগদীশচন্দ্র সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে গেলেন। "দি একাডেমি অফ সায়েন্স, ওয়াশিংটন," "দি বটানিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা" আর "ব্যুরো অফ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রি"—এই তিনটি প্রতিষ্ঠান একটি যুক্ত সভায় তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। এই "ব্যুরো অফ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রি" একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। উদ্ভিদের জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করে

তার সাহায্যে যাতে কৃষিকার্যের উন্নতি হয়, এই উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক বিশেষজ্ঞ এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের আলাপ আলোচনা হল। তাঁরা বহুদিন বাংলা ও উত্তর প্রদেশে থেকে মালদহের ফজলি, কাশীর ল্যাংড়া প্রভৃতি আম নিয়ে গবেষণা করেছেন। এরই ফলে হয়ত এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন এই সব আমদানী করা ফল আমাদের দেশ অপেক্ষা সেখানে সস্তায় বিক্রী হবে।

ওয়াশিংটনে এই যুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত সভায় বক্তৃতার বহু পূর্বে সেই হলে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। যাঁরা হলের ভেতর স্থান পান নি, তাঁরা প্রবেশ-দ্বারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। টেলিফোনের আবিষ্কর্তা মিঃ গ্রেহাম বেল (Mr Graham Bell) বক্তৃতা আরম্ভ হবার ১৫ মিনিট পূর্বে সভায় এসে ভেতরে প্রবেশ করতে পারলেন না। যাতে অনুষ্ঠানে বৃক্ষলতার পরীক্ষা কৃতকার্য হতে পারে, তার জন্য ঘরের আবহাওয়াকে অসম্ভব রকম গরম করে তুলতে হয়েছিল। সভাপতি মহাশয় এই আবহাওয়ার উষ্ণতার কারণ শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে জানিয়ে যাঁরা এই উষ্ণ আবহাওয়া ত্যাগ করতে চান, তাঁদের বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন। 'হল' ত্যাগ করার পরিবর্তে যাঁরা দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা মেঝেতে চেপে বসে পড়লেন। কেউ কেউ জানালার কার্নিশ বেয়ে উঠলেন। এই বক্তৃতা এতই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে এক ঘণ্টা বক্তৃতা হবার পরেও শ্রোতৃমণ্ডলী 'হল' থেকে না বেরিয়ে বক্তৃতা আরও আধ ঘণ্টা চালিয়ে যাবার জন্য দাবী করলেন।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র

স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন আমেরিকার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ওয়াশিংটনে জেমস স্মিথসন নামে এক ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় এই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এর সভ্যদের মধ্যে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, সহকারী সভাপতি আর প্রধান বিচারপতি। তা ছাড়া তিন জন সেনেটের সভ্য আর তিনজন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য। এখানেও কর্তৃপক্ষের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন।

টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রেহাম বেল তখন ৩০০০ মাইল দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। ওয়াশিংটনে একাডেমি অফ সায়েন্সের আয়োজিত

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে না পেয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে জগদীশচন্দ্রের একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। সেই সভায় গ্রেহাম বেল ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও বৈজ্ঞানিকগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ কার্টিস। তিনি তখন আকাশযানে অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। আর সেই সভায় ছিলেন আমেরিকার সেক্রেটারী অফ ষ্টেট মিঃ লামসিং।

ওয়াশিংটনে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক আবিষ্কারের বিবরণ এতই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে ষ্টেট বিভাগের সম্পাদক মিঃ ব্রায়ান ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের সম্মুখে তাঁর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন।

জগদীশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে ডিপ্লোমেটিক অভ্যর্থনা হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। করিডরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা ও পরীক্ষা যতটুকু তাঁরা দেখতে ও শুনতে পান, ততটুকু পৃথিবীর সর্বদেশে তারে সে সম্বন্ধে সংবাদ পাঠাবার জন্য সমবেত হয়েছেন।

আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে পরদিন এই সংবাদ প্রকাশিত হল :—

"ব্রায়ান চোখের সামনে গাছকে মদ পান করতে দেখলেন—ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গাছকে এলকোহল দিয়ে পরীক্ষা করলেন—আঙুর রস দিয়ে নয়। গাছকে কষ্ট দিও না। যদি দাও তাদের দেহে প্রচণ্ড আলোড়ন হবে—তাদের মূর্চ্ছা হবে।"

নিউইয়র্ক টাইম্‌সে এই সংবাদটি প্রকাশিত হল :—

"ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দেখালেন—গাছপালা অন্তরে দুঃখ ও বেদনা অনুভব করে।"

"আজ সন্ধ্যায় সরকারী বিভাগের কূটনৈতিক অভ্যর্থনা হলে (Diplomatic Reception Hall) ডাঃ জে. সি. বসু সেক্রেটারী ব্রায়ান ও একদল উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের সভায় পরীক্ষা করে দেখালেন যে ঠিক মানুষের মত উদ্ভিদেরও মান অভিমান, সুখ দুঃখ বোধ শক্তি আছে। জীবন্ত বৃক্ষ দিয়ে পরীক্ষা দেখান হল। কিন্তু সেক্রেটারী অব ষ্টেট সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিয়ে দেখে বিস্মিত হলেন যখন ডাঃ বসু গাছকে মদ পান করালেন এবং উদ্ভিদের দেহের ওপর তার ফল একটা চার্টের ওপর বৃক্ষ নিজে লিখে দিল।

এই বনচাঁড়াল গাছটি জগদীশচন্দ্রের সহিত
পৃথিবী ভ্রমন করিয়াছে।

"একটা সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্র দ্বারা ডাঃ বসু বৃক্ষের দেহে তাঁর পরীক্ষার ফল তাকে দিয়েই তার দেহের ঘাত-প্রতিঘাত, হৃদয়াবেগ লিখিয়ে নিলেন। তিনি পরীক্ষা দেখিয়ে বললেন, কোন ব্যক্তির হাতে যদি একটি চিমটি কাটা যায়, তা হলে একটা আবেগ তৎক্ষণাৎ তার মস্তিষ্কে গিয়ে সে খবরটি পৌছে দেয়। গাছের ক্ষেত্রেও সে'সে কথা সত্য, তাই দেখাবার জন্য যে সব গাছ ডাঃ বসু সঙ্গে করে এনেছেন, তাদের গায় একটা চিমটি কাটলেন। আর তৎক্ষণাৎ সেই গাছের সঙ্গে সংযুক্ত একটা লিভারে আঁটা একটা ছুঁচ উত্তেজিত হয়ে উঠে একখানা আয়নার ধোঁয়াটে দিকে দাগ কেটে মনের আবেগ প্রকাশ করতে লাগল। ডাঃ বসু একটা গাছকে পটাশিয়াম সায়োনাইড দিয়ে মেরে ফেললেন। সেক্রেটারী ব্রায়ান এবং অন্যান্য সকলে নির্বাক বিস্ময়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সেই বৃক্ষের মৃত্যু যাতনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।*

চিকাগোয় জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র যখন চিকাগোয় পৌছলেন তখন দেখলেন যে, সেখানকার কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দেবেন—এই নিয়ে সেখানে একটা বাদানুবাদ আরম্ভ হয়েছে। তারপর একটা আপোষ রফা হয়ে স্থির হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মীদের নিয়ে "সিগমা সি সোসাইটি" (Sigma Psi Society) জগদীশচন্দ্রের সম্মানে একটা ভোজ সভার আয়োজন

* "Indian Scientist Shows Plants' Emotions" In the Diplomatic Reception Room of the State Department this afternoon, Dr. J. C. Bose performed before Secretary Bryan and a group of State Department officials, experiments which showed that plants had sensitiveness just like human beings. Experiments were conducted with living plants but the Secretary of State shows the greatest interest when Dr Bose produced a chart that indicated in wavering lines the effect of alcohol on plant life.

By means of a delicate and complicated instrument Dr. Bose made plants record the emotion they experienced as the result of his actions. He explained that if a man was pinched in the wrist, a certain impulse was communicated to the brain. To demonstrate the same fact with reference to a plant, he pinched one of the growing things he brought with him and immediately a fine needle attached to a lever connected with the plant became agitated, exhibited its emotion by making dots on the smoked side of a plate of glass. Dr. Bose put one plant to death by giving it a dose of cyanide of potassium and Secretary Bryan and others watched the death struggle with bated breath."

করবে। এই ভোজ সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দেবেন। অধ্যাপক মিলিকান (Prof. Millikan) সেই সভায় সভাপতির আসন থেকে বললেন '১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে বক্তার সঙ্গে আমার দেখা হয়।' আর আজ তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকেই অধিকতর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে এই সভায় সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিদ বলে মনে করেন, তাঁদের জানা উচিত যে, তিনি পদার্থবিদ হয়ে আর একটা নূতন জ্ঞানের রাজ্য অধিকার করেছেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে সকলে তাঁর কাছে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

উনকন্‌সিন বিশ্ববিত্তালয়ে জগদীশচন্দ্র

জানুয়ারী মাসের শেষে জগদীশচন্দ্র উনকন্‌সিন সহরে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময় এখানকার শীত অত্যন্ত প্রচণ্ড। সমগ্র আমেরিকার মধ্যে এখানকার মত শীত আর কোথাও নেই। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রীতে ওঠে। আর শীতকালে যে ডিগ্রীতে জল জমে যায় তারও ৫৬ ডিগ্রী নিচে নেমে যায়। ইউরোপেও তাঁরা শীত পেয়েছেন। কিন্তু এখানকার প্রচণ্ড শীতের আর তুলনা নেই। নদী আর সরোবর জমে বরফে পরিণত হয়েছে। তখন এখানে গরম জামার ওপর গরম জামা পরে তার ওপর ফার কোট পরতে হত। কিন্তু নাক আর কান খোলা থাকলে সেগুলো যে বেশীক্ষণ টিকবে না, এ কথা সকলেরই মনে হত। এখানে জগদীশচন্দ্রের বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজ চড়ার অভিজ্ঞতা হয়।

মিচিগান শহরে জগদীশচন্দ্র

এর পরে জগদীশচন্দ্র মিচিগান শহরে এলেন। তিনি পূর্বেও এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন যে সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁরা বহু চেষ্টা করেও তৈরি করতে পারে নি। সেই জন্য তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, সেখানকার বিজ্ঞানের ছাত্রদের তাঁর কাছে কলকাতা পরীক্ষাগারে শিক্ষা দেবার কথা। এখানে তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য বহু দূর দূরান্তর থেকে শ্রোতা এল। তাদেরই মধ্যে একজন জগদীশচন্দ্রকে ডিট্রয়েট শহরে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করল। এই ডিট্রয়েট শহরে ফোর্ড মোটর কারখানা স্থাপিত। এত বড় বিরাট মোটরের কারখানা আর কোথাও ছিল না।

ইলিনয় ও আয়োয়ায়

এখান থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন ইলিনয় ও আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আয়োয়ায় জগদীশচন্দ্রের দৈনন্দিন লিপি দেখলেই তাঁর অসাধারণ কর্ম-ব্যস্ততা ও অপরিমিত পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এখানকার দৈনন্দিন লিপি—

সোমবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী

সকাল ৯-৩০ মিনিট—অধ্যাপক সিমেফ, অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট এবং বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক বসুকে অভ্যর্থনা করবেন এবং তাঁকে সভাপতির অফিসে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁকে সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সকাল ১০-১১টা—ফেকালটির সভ্যগণের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র একাডেমিক পোশাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করবেন। সভাপতি ম্যাকব্রাইড তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারপর তিনি এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন।

দুপুর ১২-৩০মি—৩টা—অধ্যাপক শ্যামবোর (Prof Shambaugh) বাড়ীতে লাঞ্চে যোগদান করবেন। তারপর মনোবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক-গণের সহিত সাক্ষাৎ করবেন।

বিকাল ৪টা—৫-৩০মিঃ—পদার্থবিদ্যা ভবনে পদার্থবিদ্যা সেমিনারে বক্তৃতা করবেন।

বিকাল ৬টা—৮টা—উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকগণ তাঁকে ভোজে সম্বর্ধিত করবেন।

রাত্রি ৮-৩০মি—১০টা হিন্দু ছাত্রগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা।

মঙ্গলবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী

১২টা-২টা—প্রেসিডেণ্ট ম্যাকব্রাইড এবং ফেকাল্টির সভ্যগণের সহিত লাঞ্চ।

৪টা—৫-৩০মিঃ—বিজ্ঞান ভবনে উদ্ভিদবিদ্যা সেমিনারে বক্তৃতা।

৬টা—৭-৩০মিঃ—অধ্যাপক সিমেফ ও শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক-গণের সহিত নৈশ ভোজন।

৮টা—১০টা—বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাচারাল সায়েন্স অডিটরিয়ামে বক্তৃতা।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই বক্তৃতা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর ক্লান্তি শেষ সীমায় পৌছত। শুধু তাই নয়। এক শহর থেকে অপর শহরে যেতে তাঁকে সময় সময় এক সহস্র মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করতে হয়। ট্রেনে অনেক সময় তাঁকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে থাকত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর স্পর্শকাতর গাছপালা। সেগুলির নিরাপত্তার ওপরই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করত। তার ওপরে ট্রেনে কৃত্রিম উপায়ে অত্যুষ্ণ আবহাওয়া থেকে ষ্টেশনে নেমে একেবারে বাইরের হাড়কাঁপানো শীতের আবহাওয়ার মধ্যে নামতে হত। এর ওপর শহরে পৌছেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পরীক্ষার আয়োজন করতে হত। সেখানে হয়ত পরীক্ষা প্রদর্শনের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকত না।

ক্লার্ক, হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ করে জগদীশচন্দ্র জাপান ঘুরে দেশে ফিরবার আয়োজন করছেন, এমন সময় কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা করবার এক আকুল আহ্বান এল। জগদীশচন্দ্র সে আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল থেকে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে যেতে হল। চার দিন চার রাত্রি লাগল তাঁদের সেখানে পৌছতে। যেখান থেকে জগদীশচন্দ্র যাত্রা শুরু করলেন সেখানে সারা দেশ তুষারাচ্ছন্ন। মাঝপথে দেখলেন বরফ আরও কঠিন হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দৃশ্যের পরিবর্তন হল। কালিফোর্নিয়ার সমতল ভূমি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত শস্য ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নীল আকাশের গায় সবুজ তাল গাছগুলি যেন ছবি এঁকে রেখেছে। সেই দৃশ্য দেখে তাঁর স্বদেশের কথা মনে পড়ে গেল।

১২ই মার্চ জগদীশচন্দ্র কালিফোর্নিয়া পৌছলেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথারীতি বক্তৃতাও করলেন।

তারপর লেলাণ্ড ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার আহ্বান এল। লেলাণ্ড ষ্টানফোর্ড একজন সেনেটের সভ্য। একদিন তিনি সেনেটের সভায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে পৌছল। তিনি সেইভাবেই ঘোষণা করলেন, কালিফোর্নিয়াই আমার পুত্রের স্মৃতিস্থান হবে। তিনি তাঁর পুত্রের স্মৃতিকল্পে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দান করলেন। পুত্রহারা জননী দিলেন তাঁর দেহ রিক্ত করে তার সব অলঙ্কার খুলে। সেগুলি বিক্রী করে ৫০ লক্ষ মুদ্রা হল।

তাঁরা স্থির করলেন এখানকার শিক্ষা হবে অবৈতনিক। তাঁদের এক সন্তানের পরিবর্তে শত শত পুত্র এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা পাবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। সে সভায় সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেণ্ট ষ্টার জর্ডন। সভার পরে উদ্ভিদের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জে পিয়ার্স জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে জানালেন, "সভায় সমবেত সকলকে আপনি যা দিয়েছেন, তা কেউ জীবনে ভুলবে না। একজন শিক্ষকের পক্ষে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? আর আবিষ্কারকের কাছে তাঁর জ্ঞানের আলোকে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, এর চেয়েই বা বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? মানুষের মঙ্গলকে আপনি কাছে এনে দিয়েছেন।"*

এইবার আমেরিকায় ভারতের বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শেষ হল। এখনও পৃথিবীর অর্ধেক ভ্রমণ বাকি। জগদীশচন্দ্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ "নিপ্পন মারু" নামে এক জাপানী জাহাজে দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

জাপানে জগদীশচন্দ্র

এখন থেকে নব্বই বছর আছে জাপান জাহাজের ব্যবসায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তার নবজাগরণের ফলে তার নিজের গবর্ণমেণ্ট জাপান-বাসীকে যে সাহায্য করেছে তারই পরিণামে জাপানীরা পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাপানীরা জাহাজের ব্যবসায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। তখন প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের সঙ্গে জাহাজের ব্যবসায় কোন জাতই পেরে ওঠেনি। জাহাজে যাত্রীদের প্রতি তাদের ভদ্রতার তুলনা ছিল না। তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

"May I attempt to express the grateful appreciation of the Members of the Department and of the President and other Members of this University of your kindness in coming to us and in delivering such an illuminating Address as the one you gave us last Tuesday afternoon; You had a very thoroughly intersted audience composed largely of students in the different departments of Biology and to each you gave something which will never be forgotten. Can there be any more satisfying reward for a teacher? And can there be any more satisfying reward for an investigator than the feeling that his researches have pushed our ignorance a little further back and brought human betterment a little nearer?"

জাপান বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় নি। সেইজন্য জগদীশচন্দ্র জাপানের পথে দেশে ফিরতে মনস্থ করলেন।

এই "নিপ্পন মারু" নামক জাপানী জাহাজে ২০শে মার্চ সানফ্রান্সিসকো থেকে বেরিয়ে জগদীশচন্দ্র সদলবলে ২৬শে মার্চ হনলুলুতে এসে পৌছলেন। হনলুলু প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একটি দ্বীপ। আমেরিকার এটি একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। আধুনিক যুদ্ধের সাজসজ্জায় সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত। তখনকার দিনে জগদীশচন্দ্র এই বন্দরে সাবমেরিণের সাক্ষাৎ পেলেন।

যে দিন জগদীশচন্দ্র এখানে এসে পৌছলেন সেদিন এখানে এক দুর্ঘটনা ঘটল। একখানা সাবমেরিন মহড়া দেবার জন্য জলের তলায় ডুবল। কিন্তু আর উঠল না। অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি হল না। সমুদ্র তোলপাড় করে ফেলা হল। কিন্তু কোনই ফল হল না।

আমেরিকানরা মনে করে হনলুলু প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের একটা শ্রেষ্ঠ যুদ্ধের ঘাঁটি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তখন মনে হত যে বহু জাপানী এখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসবাস করত। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। এখানকার অধিবাসী প্রত্যেক জাপানী ছিল রণনিপুণ। যুদ্ধবিদ্যায় পটু। খুব সন্দেহের বিষয় ছিল যে এখানে যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে আমেরিকানদের পক্ষে জাপানীদের সঙ্গে পেরে ওঠা খুব শক্ত হত।

হনলুলুতে জাহাজ পৌছবার আগেই জগদীশচন্দ্র এখানকার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের পক্ষ থেকে সেখানে বক্তৃতা করবার জন্য একটি বেতার বার্তা পেলেন। কিন্তু জাহাজ হনলুলুতে যে দিন পৌছল সেই দিনই সন্ধ্যায় এখান থেকে ছেড়ে চলে গেল। সুতরাং এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা দেবার সময় হল না।

এবার জাহাজ চলল ইয়োকোহামার দিকে।

প্রত্যেক দিন জগদীশচন্দ্রের সহকারী জাহাজে ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে তার পূর্বদিন জাহাজ কত মাইল পথ অতিক্রম করল, হিসেব করে দেখতেন। সেখানে সেটা সপ্তাহের কোন্ দিন, কোন্ তারিখ তার হিসেব থাকত। সেই চার্ট দেখে দিন-তারিখ সব জানা যেত।

শুক্রবার, ২রা এপ্রিল, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি রাত্রে নিদ্রা গেলেন। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে তাঁরা চার্টে দেখলেন—সে দিনটা রবিবার, ৪ঠা এপ্রিল। তাহলে শনিবার, ৩রা এপ্রিল পুরো একটা দিন কোথায় গেল?

শুক্রবারের পর কোন্ দেশের নিয়মে রবিবার হল। তবে শনিবারটা কোথায় গেল? একেবারে অবিশ্বাস্য কথা!

তাঁরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলেন যে, পুবদিক থেকে আসতে তাঁরা ১৮০° দ্রাঘিমা অতিক্রম করে এসেছেন।

তাঁরা চলেছেন সূর্যের সঙ্গে। সূর্য প্রত্যেক দিন একটু একটু করে পিছিয়ে আসছে। কেউ যদি পুবদিক থেকে পৃথিবী ভ্রমণ করে তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক দিন কয়েক মিনিট আগেই সূর্যের সঙ্গে দেখা হবে। এই রকম করে একটা দিন চলে যায়। একটা দিন কোথা দিয়ে চলে গেল এটা আপাতদৃষ্টিতে বড়ই কৌতূহলজনক। ম্যাথমেটিক্যাল রেখার পুব দিকে যখন শুক্রবার, তখন সেই রেখার পশ্চিম দিকে একটু দূরেই রবিবার।

এইবার জগদীশচন্দ্রের জাহাজ জাপানের নিকটবর্তী হতে লাগল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। সকলে আশা করেছিল যে সমুদ্র ভ্রমণে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু উন্নতি হওয়া দূরে থাক, দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল। তাঁর দেহ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

জাহাজের ডাক্তারকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন যে সমুদ্র ভ্রমণের জন্যই দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে।

জাহাজ ৭ই এপ্রিল ইয়োকোহামা এসে পৌছল। তখন জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র যখন হার্ভার্ডে ছিলেন তখন তাঁর জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বরটা ওষুধ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। সকলে মনে করলেন সেই জন্যই হয়ত শরীরের ভেতর কোন বিশেষ অনিষ্ট হয়েছে। তার জন্যই তাঁর দেহ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

সৌভাগ্যক্রমে এখানে আমেরিকান, ভারতীয় ও জাপানী বহু বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। তাঁরা সকলেই জগদীশচন্দ্রের যে কোন প্রকার সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র হলেন। সকলে মিলে স্থির করলেন যে জাপানের সম্রাটের ডাক্তারকে দেখান হবে।

ডাক্তার দেখলেন। তিনি বললেন যে, জগদীশচন্দ্রের অসুখ অত্যন্ত কঠিন। আর ওষুধে এই ব্যাধির কোন উপকার হবে না।

জগদীশচন্দ্রের সৌভাগ্যবশতঃ টোকিওতে আন্তর্জাতিক হাসপাতালের ডিরেক্টর প্রসিদ্ধ আমেরিকান ডাক্তার টেনব্লারের সঙ্গে দেখা হল। তিনি

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারসমূহের জন্য তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে যে কোন সাহায্য করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

তিনি জগদীশচন্দ্রকে অত্যন্ত যত্ন করে পরীক্ষা করলেন। তারপর মত প্রকাশ করলেন যে, গত এক বৎসর ধরে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিতে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং যে রকম মানসিক দুশ্চিন্তা সহ্য করেছেন—তারই ফলে তিনি এই কঠিন রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

আর কেউ হলে সকলে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর স্নায়ু দুর্বল নয়। আর তিনি ডাক্তারের প্রত্যেক উপদেশ মেনে চলবেন। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছু নেই।

ডাক্তার প্রতি দিন কখন কি করতে হবে—কি রকমভাবে চলতে হবে—তার একটা চার্ট করে দিলেন। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রের যে সব বক্তৃতা দেবার কথা ছিল, ডাক্তারের আদেশে সব বন্ধ করে দেওয়া হল। কেবল দুটি মাত্র বক্তৃতা তিনি করতে পারবেন। তাও এখন নয়। শরীরে বেশ শক্তি পেলে তবেই সে দুটি প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করতে পারবেন।

ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হল যে. জগদীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ জাপানে কামাকুরা নামক সমুদ্রোপকূলের স্বাস্থ্যনিবাসে চলে যাবেন। সেখানে তাঁর পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না। এই সমুদ্রকূলে জগদীশচন্দ্রের নির্জন বাসের ব্যবস্থা হল। সেখানে আছে শুধু সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অবিরত সমুদ্র গর্জন। আর মাথার উপরে নীল আকাশ নেমে এসে সেই বালুবেলায় মিশেছে।

সেখানকার হোটেলের ম্যানেজার জগদীশচন্দ্রের সুখশান্তির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পরিচর্যা, সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হল না।

হোটেলের কাছেই সমুদ্র। দীর্ঘ উপকূল।

জগদীশচন্দ্র মন থেকে পৃথিবীর সব চিন্তা মুছে ফেলে দিলেন। তিনি নিষ্পাপ সরল শিশুর মত সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে বেড়ান। তার তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করেন। তাঁকে ত এখন অসুখে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তাঁকে যে ভারতে গিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। তাঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকি।

তিন সপ্তাহ জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর সব চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

তিন সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল। তিনি শরীরে শক্তি সঞ্চয় করলেন। এইবার মনে হল তিনি বিখ্যাত ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে পারবেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১লা মে। জগদীশচন্দ্র ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন। ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার হল জাপানের মনীষী, জ্ঞানী, গুণীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেই বিরাট জনসমুদ্র তাঁর বক্তৃতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনতে লাগল। তার ওপর পৃথিবীতে অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব উপায়ে যখন জগদীশচন্দ্র গাছকে দিয়ে, প্রাণীকে দিয়ে, ধাতুকে দিয়ে তাদের নিজেদের হাতে তাদের ব্যথা ও বেদনা, দুঃখ ও যন্ত্রণা, আনন্দ ও হর্ষ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে লিখিয়ে জানাতে লাগলেন তখন সেই বিদগ্ধ মণ্ডলী বিস্ময়ে হর্ষে আনন্দধ্বনি করে উঠল। চোখের সামনে তারা যা দেখল, মদ খেয়ে প্রাণীও যেমন মাতাল হয়, গাছও তেমনি মাতালের ভাব প্রকাশ করল, আঘাত পেলে মানুষ যেমন মৃত্যু-যন্ত্রণা বোধ করে, গাছ ও তেমনি মৃত্যু-যন্ত্রণা বোধ করল। ক্লোরোফরম প্রয়োগ করলে গাছের দেহও অসাড় হয়ে এল—তারা মনে করল চোখের সামনে তারা যা দেখছে এ কি সত্য? একি ম্যাজিক, না ভোজবাজি? এত দিন লোকে জানত ভারতবাসী শুধু মনস্তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করতে পারে—তাই নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করতে পারে—তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল এই বিচার নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়—সে বিচারের আর শেষ হয় না—সেই বাঙ্গালী কিনা যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইউরোপীয়রা পৃথিবীর শিক্ষাগুরু—সারা জগৎকে পথ দেখিয়ে এসেছে—সেই গবেষণায় আজ বাঙ্গালী জাতি ইউরোপকে পথ দেখাচ্ছে—আমেরিকাকে পথ দেখাচ্ছে! এ কথা ত আজ অবিশ্বাস করবার উপায় নেই!

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। সমস্ত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তব্ধ।

বক্তৃতার শেষে ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ উকিটা ভাষণ দিতে উঠলেন। ভারত আজ তাঁদের যে নূতন বাণী শুনিয়েছে—বিজ্ঞানের বাণী—তা শুনে তাঁরা আজ মুগ্ধ। জগদীশচন্দ্রকে প্রশংসা করবার তাঁদের ভাষা নেই। আজই যে তাঁরা ভারতের মহান বাণী প্রথম শুনলেন তা নয়। বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই জাপান ভারতের বাণী শুনে আসছে। ভারতের সঙ্গে

তাঁদের মধুর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চলে আসছে। তাঁরা বহুকাল থেকে ভারতের জ্ঞানের কথা—আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনেছেন।

৪ঠা মে জাপানের মনীষী-প্রধান মার্কুইস টোকুগাওয়া জগদীশচন্দ্রের সম্মানে টোকিও শহরে তাঁর প্রাসাদে এক অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। সেখানে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও বিদগ্ধমণ্ডলী যাঁরা জাপানের শিক্ষা ব্যাপারে লিপ্ত আছেন তাঁরা সকলে সমবেত হয়ে জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব আবিষ্কারের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

বহুকাল থেকে জাপান তার তরুণ ও সবাপেক্ষা কৃতী যুবকদের ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে আসছে। এই সব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কৃতিত্ব দেখিয়ে দেশে ফিরে গেলে তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বরণ করে নিচ্ছে। এই পদের বেতন অত্যন্ত অল্প হলেও সম্মান ও পদমর্যাদা অল্প নয়। বিদেশ থেকে কৃতী ও যশস্বী হয়ে দেশে ফিরলে তারা নিশ্চিত জানে যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অধ্যাপকের পদ পাবেই। এই জাতীয়তাবোধই জাপানের বিশেষত্ব। আর এই আশ্বাসেই জাপানের শ্রেষ্ঠ ও কৃতী ছাত্রগণ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে গিয়েছে।

জাপানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সুতরাং এখানে দেখতে পাবেন রিক্শা-ওয়ালা পথের ধারে রিক্শা রেখে দিনের শেষের সংবাদ জানবার জন্য শেষের সংস্করণের খবরের কাগজ পড়ছে।

একদিন জগদীশচন্দ্রের সহকারী ডাঃ বশীশ্বর সেন তাঁর আর দুজন সঙ্গী নিয়ে একটা নার্সারীতে কয়েকটা গাছ কিনতে গিয়েছেন। দোকানের মালিক তাঁদের ভারতীয় বলে চিনতে পেরে বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার আর ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার কথা সোৎসাহে আলোচনা করতে লাগল। তারপর যখন সে শুনল যে তিনি জগদীশচন্দ্রের সহকারী তখন যে গাছগুলো তাঁরা কিনলেন তাদের দাম ত নিলই না, উপরন্তু বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জন্য কতকগুলো সুন্দর ফুল উপহার দিল।

জগদীশচন্দ্র জাপানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান দর্শন করতে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরীক্ষাগারের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাগারে কি কাজ হচ্ছে তা তাঁর কাছে বর্ণনা করল। ভারতবর্ষের পরীক্ষাগারে কোন বিদেশী দর্শক এসে আমরা আমাদের যা কিছু নূতন আবিষ্কার সব কিছুই

তাদের কাছে সোৎসাহে বর্ণনা করে থাকি। আমাদের সব কিছুর প্রদর্শনী করে দেখাই। কিন্তু জাপানীরা তা করে না। এমনকি অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে তারা বিদেশীদের তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকতে দেয়। কোন নূতন কিছু আবিষ্কার করলে তারা বিদেশীর কাছে প্রকাশ করে না। বিদেশী কোন জিনিস তারা কড়া ট্যারিফ বসিয়ে দেশে ঢুকতে দেয় না। দু' একটা নতুন জিনিস—তার কলকবজা, কারিকুরি দেখে নেবার জন্যই শুধু দেশের ভেতর ঢুকতে পায়। এই খানেই হল তাদের ব্যবসার রহস্য।

জাপানে না আছে শস্যের প্রচুর জমি, না আছে কোন ধাতুর আকর। অথচ জাপানীদের সহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, কর্মদক্ষতা, পরিশ্রম-ক্ষমতা এতই অসাধারণ যে তারা জাপানকে একটা উন্নত দেশে পরিণত করেছে।

*   *   *   *

জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করতে লাগল। কিন্তু তখনও তাঁর শরীরের অবস্থা জাহাজে দেশে যাবার উপযোগী হয় নি। ডাক্তারের উপদেশে জগদীশচন্দ্রকে মায়ানোসিটা নামে একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাসে আর এক পক্ষকাল থাকবার জন্য যেতে হল। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এটা হল আগ্নেয়গিরির দেশ। সুতরাং এখানে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

পনের দিন পরে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি হল। এইবার জগদীশচন্দ্র জাহাজে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথে জাভায় বিনটেনজর্গ নামক স্থানে বিখ্যাত উদ্যান দেখে তাঁরা কলম্বো গিয়ে পৌঁছলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহলে জগদীশচন্দ্র সদলবলে নেমে পড়লেন। সেখানে কলম্বো দেখলেন। সিংহলের বৌদ্ধ-তীর্থগুলিও পরিদর্শন করলেন। দন্ত মন্দিরও দেখলেন।

সেখান থেকে সাত মাইল জাহাজে সমুদ্র পেরিয়ে তাঁরা এলেন ধনুষ্কোটি। সেখান থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিব মন্দির রামেশ্বরম্ মন্দিরে পূজা দিলেন। মাদুরা, তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী ও শ্রীরঙ্গম—কিছুই দেখা বাদ গেল না। শ্রীরঙ্গপত্তমের মন্দিরে ভারতের তীর্থযাত্রীরা যা দেখেন তাঁরা তা ত দেখলেনই। তাছাড়াও মন্দিরের পূজারীগণ মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবদেবীর মূর্তি আছে সেখানটা তাঁদের সসম্মানে দেখালেন। জগদীশচন্দ্র পূজারীদের কাছে বললেন যে তাঁরা গোঁড়া হিন্দু নন। এমনকি তাঁরা জাতিভেদও মানেন না। অন্ততঃ

সমুদ্র যাত্রায় বিদেশ ভ্রমণের জন্য তাদের জাতি নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব মন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁদের প্রবেশ করবার কোন অধিকার নেই।

তার উত্তরে পুরোহিত বললেন, না না, আপনি একজন সাধু। আপনি মন্দিরের ভেতর আসুন।

এই রকমে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতদের মন্দিরে সর্বত্রই বেড়ালেন। তারপর বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ২৬০০ মাইল ভ্রমণ করে বিশ্ববিজয় অভিযান সম্পন্ন করে দুবছর পরে বাঙ্গালীর ছেলে একদিন ঘরে ফিরে এলেন।

রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য বসুর সম্বর্ধনা

শ্রাবণ, ১৩২২

রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। তিনি বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর রামমোহন লাইব্রেরীর সভ্যগণ তাঁকে এক সম্বর্ধনা সভায় সম্মানিত করেন। কমিটির পক্ষ থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল তাঁকে প্রশংসা করে এই সভায় বক্তৃতা করেন। দর্শনাচার্য শীল মহাশয় বললেন—মহাভারতে শান্তিপর্বে বৃক্ষের প্রাণবত্তা ও অনুভব শক্তির বর্ণনা আছে।

বায়্বগ্ন্যশনি নির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতি।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দ স্তস্মাচ শৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥

বায়ু, আগুন ও বজ্রের শব্দে বৃক্ষের ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়। কান দিয়ে শব্দ গৃহীত হয়। সুতরাং গাছেরা শ্রবণ করে।

বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
নহ্যদৃষ্টশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥

অর্থাৎ লতা গাছকে বেষ্টন করে। আর সর্বত্র যায়। যে নিশ্চিতরূপে দেখে না তার পথ নেই। সুতরাং পাদপরা দেখে।

শীল মহাশয় বললেন, শ্রোতৃবর্গ যেন মনে না করেন যে এই শ্লোক বলে না যে প্রাচীন ঋষিদের এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল বা তারা এ সব বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন। এটা হল তাদের গভীর ধ্যানধারণা বা বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অভিজ্ঞতা-প্রসূত। ইহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান অতি গভীর, অতি বিস্তৃত।

এই অভ্যর্থনার উত্তরে জগদীশচন্দ্র বললেন—এই চতুর্থ বার ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য বিদেশে পাঠান। এ বিষয়ে তিনি যে কৃতকার্যতা লাভ করেছেন তা তাঁর ধারণার অতীত। বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পেয়েছেন, সেটা তাঁর দেশেরই প্রাপ্য।

তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া ভিয়েনা, প্যারি, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, চিকাগো, টোকিও এবং আরও বহু দেশে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তাঁর আবিক্রিয়া প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে হলেও সকলেই তা গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হল যে সমস্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তিনি আবিষ্কার

করেছেন এবং তাদের সাহায্যে তিনি তাদের চোখের সামনে পরীক্ষা দেখিয়েছেন তা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এই সমস্ত আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান—উভয় বিষয় সম্পর্কিত। ঐ সমস্ত দেশ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে যে এই বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাদের বহুদূর পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে এবং তাঁদের এ সব বিষয় জানতে হলে ভারতের কাছে যেতে হবে।

ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে এ দেশে এসে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আবেদন করেছে। উচ্চ-বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হলে ভারতের সাহায্য ব্যতীত যে সম্ভব নয় ইউরোপের এই স্বীকার উক্তি ভারতের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানাদের অনুপ্রাণিত করবে। অসংলগ্ন বস্তু থেকে সত্য আবিষ্কারের তাঁর দেশবাসীর শক্তি আছে এবং তারা মনকে বিক্ষিপ্ত না করে মনসংযোগ দ্বারা নূতন ও সূক্ষ্ম বস্তু আবিষ্কার করতে পারে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশীলা, নালন্দা, কঞ্জীভরম পরিদর্শন করে জগদীশচন্দ্রের ধারণা হয়েছে যে ভারতে আবাব তার প্রাচীন জ্ঞানের গৌরব ফিরে আসবে। তাঁর আরও ধারণা হয়েছে যে ভারতে আবার শীঘ্রই জ্ঞানের দেউল গড়ে উঠবে যেখানে আচার্য সংসারে নিস্পৃহ হয়ে জ্ঞানের সাধনা করবেন ও সত্যের সন্ধানে রত থাকবেন এবং দেহাবসানে শিষ্যের হাতে তাঁর অর্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তুলে দিয়ে যাবেন। ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বিজ্ঞান ও ধর্মের ভেতর কোন বিরোধ নেই। এ দেশে জ্ঞানই ধর্ম বলে পরিচিত। ভারতে যদি আকাশকে জয় করা সম্ভব হত তাহলে মানবের ভেতর এই যে দেবতার প্রেরণা এর জন্য মন্দিরে মন্দিরে এদেশে পূজা দেবার ব্যবস্থা হত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আচার্যদেবের সম্বর্ধনা

ভাদ্র, ১৩২২

রামমোহন লাইব্রেরীর পর সাহিত্য পরিষদ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বর্ধনার আয়োজন করে। এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন এম এ বলেন—

"আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক, খ শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্ধনা উপলক্ষে কিছু বলিতে আমি সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আচার্য মহাশয় যে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদকে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয় তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান। সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ Scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

"জড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা অনেক স্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কানে শুনায় আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কানে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচার্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা সেই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একজন পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে "বৈজ্ঞানিক যাদুকর" আখ্যা দিয়াছেন। এ নাম তাঁর সার্থক হইয়াছে।

"এ দেশে যাহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি দ্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে :—

তে নে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।

"আচার্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

* * * *

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্রের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। তখন গবর্নমেণ্ট তাঁকে চিরদিনের জন্য পুরো বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ইমেরিটাস' অধ্যাপক বলে স্বীকার করলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নববর্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

কলেজ থেকে অবসর পেয়েও তাঁর কর্মজীবন শেষ হল না। তিনি দার্জিলিংয়ে এবং সিজবেড়িয়ায় তাঁর পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু এখনও তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়নি। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এইবার জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ৩০শে নবেম্বর, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উনষষ্ঠিতম জন্মদিনে তিনি তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। এই দিনই তেইশ বছর আগে তাঁর আর এক জন্মদিনে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করবেন স্থির করেছিলেন। তাঁর সেই সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেই জগদীশচন্দ্র এই দিনে তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার দিন স্থির করলেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা

সে আজ ৪৭ বৎসর আগেকার কথা। তখন আমি কলেজে পড়ি। আমার এক ভাই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। সে ২৯ শে নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাদের কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট থেকে দুখানা কার্ড এনে দেখাল। পরদিন ৩০শে নভেম্বর। আচার্য জগদীশচন্দ্রের উনষষ্ঠিতম জন্মদিন। সেইদিন বিকালে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা হবে। এই কার্ড হল সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার প্রবেশপত্র।

মহা উৎসাহে ৩০শে নভেম্বর বিকালে দুজনে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব আরম্ভ হবার অনেক আগেই গিয়ে উপস্থিত হলাম। বিজ্ঞান মন্দিরের খোলা জায়গায় বিরাট সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। টেবিল চেয়ার দিয়ে সভামঞ্চ সাজান হয়েছে। যথাসময়ে অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে জগদীশচন্দ্র সভায় এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে ভারতের দুই জগদ্বিখ্যাত বরেণ্য মনীষীর আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলাম।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরণে গরদের কাপড়। গায় গরদের পাঞ্জাবী। তার ওপর পাটকরা গরদের চাদর। তাঁর কাঁচা পাকা মাথার চুলগুলি বড় বড়। যেন একটু ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। সেই দিন আচার্যদেব উনষাট বছর বয়সে পদার্পণ করলেন।

আচার্যদেব দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে কৃচ্ছ্রসাধন করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এখানে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানের ছাত্ররা এসে বিবিধ বিষয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করবে।

যাই হোক, এই বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার বরেণ্য সন্তান মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও যুগলকিশোর বিরলা প্রভৃতি স্বেচ্ছায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে অর্থ সাহায্য করেছেন।

চাকরি থেকে অবসর পেয়েই আচার্যদেব এই বসু বিজ্ঞান মন্দির গবেষণাগার নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন। তখনও কিন্তু তাঁর গবেষণার বিরাম ছিল না। দার্জিলিংয়ে মায়াপুরীতে (৭০১০ ফুট) জগদীশচন্দ্রের একটি বিজ্ঞানাগার ছিল। সেখানে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। তারপর সান্দকফুতে (১২০০০ ফুট) ও মায়াপুরীতে কস্‌মিক রশ্মি বিষয়ে গবেষণা

চলেছে। সেখানে এখনও আলুবীজের কীট ও জমি মাইক্রোবাইয়োলজি বিষয়ে গবেষণা চলছে।

উলুবেড়িয়ার কাছে সিজবেড়িয়াতে আচার্যদেব বহু জমি সংগ্রহ করে একটি বাংলো নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেও তিনি একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও তিনি পরীক্ষার কাজ চালিয়েছেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তখন গবেষণার বিষয় ছিল ফিসিকস ও বাইওফিসিক্স, ফলিত রসায়ন ও বাইয়োকেমিস্ট্রি, উদ্ভিদবিদ্যার শারীর বিজ্ঞান, সাইটোজেনেটিক্স মাইক্রোবাইয়োলজি ও জুলজি। পরে পদার্থবিদ্যা ও ফলিত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি রসায়ন, উদ্ভিদ রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ শারীরবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জুলজি ও এন্থ্রপোলজি বিদ্যায় এখানে গবেষণা হয়ে আসছে।

এখানকার আয় হল জমা ৪৮,০০০ টাকার সুদ, ভারত গভর্নমেণ্টের বাৎসরিক সাহায্য দেড় লাখ টাকা, বাংলা গবর্নমেণ্টের বাৎসরিক সাহায্য ১,০৬,০০০ টাকা। বসু বিজ্ঞান মন্দির বিশেষ সাহায্য হিসাবে ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট ১,৮০,০০০ টাকা পায়, ট্রাষ্টীদের ফাণ্ড থেকে ১, ২০,০০০ টাকা। এই সব অর্থে নূতন বিজ্ঞানাগার, কারখানার যন্ত্রপাতি ও গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনা হয়ে থাকে।

আজকাল এইসব সাহায্য ছাড়াও কস্‌মিক রশ্মি ও নিউক্লিয়ার ফিসিকস বিষয়ে গবেষণার জন্য এটমিক এনার্জি কমিশন সাহায্য দিয়ে থাকেন। ভারতীয় সেণ্ট্রাল জুট কমিটি পশ্চিম বাংলা গবর্নমেণ্টের সাহায্যও বসু বিজ্ঞান মন্দির পেয়ে থাকে। সুতরাং এখানে বিজ্ঞানবিষয়ে গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে।

যাক্ আগেকার কথায় ফিরে আসা যাক। এই বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এ বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সব চেয়ে উৎসাহী বন্ধু রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। কিন্তু বিদেশ থেকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে তিনি লিখলেন,—"তোমার বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হলে আমার খুব আনন্দ হত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হলে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে এর

বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।……তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েও এই জন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞান সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করচ। তোমার মন্ত্রের গুণে তোমার তপস্যার বলে—দেবী সেই আসনে অচলা হবেন এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।……”

রবীন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "আবাহন" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, সেটিও সভায় পাঠ করা হল। কবিতাটি হল :—

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
জয় তপস্বী রাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!
এস বজ্র মহাসনে, মাতৃ আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ দুঃখ ভাগী,

এস দুর্জয় শক্তি সম্পদ
মুক্ত বন্ধ সমাজ হে !
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,—
নাশ ভারত লাজ হে !

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃ সূর্য উজ্জ্বল
কীর্তি অম্বর মাঝ হে !
বীর ধর্মে পুণ্য কর্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে !
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
জয় তপস্বী রাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে।

১৪ অগ্রহায়ণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩২৪

এইবার আচার্যদেব তাঁর ঋষিকল্প মূর্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর "নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। সেই বিদগ্ধ জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ ও নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর প্রবন্ধটি শুনল।

নিবেদন

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতু-নির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে; তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদজীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া—তাহা অর্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতায় কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বীগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোন দিনই তাহাদের নহে, সেই একই কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজপন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনের এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন-প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্মানীতে আচার্য হার্টস বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে কোন মতামত

প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমান কালের সর্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম। তাহাতে অবগত হইলাম যে আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণা-কার্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেই দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেমন অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিদ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন

আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহুবৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্য মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর। বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোন বৃহৎকার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেও বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্যটন

ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে তাহার নিয়ম উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দিনে আমাকে ম্রিয়মান করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সে দুর্যোগও একদিন অভাবনীয় রূপে কাটিয়া গেল। আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য ভারত গবর্নমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী ; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম-সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী

অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরী ভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন রীতিনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীর-ধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জুনের।

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব-সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোন দিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের দান

বিজ্ঞান ত সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্য জগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ্, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্ন রূপ সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের

বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের, পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্য দৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না; পর্যাযক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতু পাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের ভিতরের নির্মাণ কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি মাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্য-স্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে উদ্ভিদেও তাহাদের একই বিষক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদ পেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ কবিয়া তাহাতে হৃদয় স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানা পথ দিয়া পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, এমন কি মনস্তত্বও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণী সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিনাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোন দিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব, ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোন দিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্প দিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্মস্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশ বিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক

বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহু চর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব জাতির সকল নরনারীর জন্য মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তদ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি—ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষু-প্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইয়ের সংযোগস্থলে বর্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে?

অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদ-বিহীন উদ্ভিদ-জগতে, এই তুষ্ণীভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুঁত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, অথবা অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধন-ধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। **মানব চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি, মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই।** তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের **অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।** তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—**এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।**

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দির গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা স্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্বদিনের

মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম। কল্য হইতে পুনরায় কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, হৃদয় মন্দিরে। তাহার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।"

* * * *

এই **'নিবেদন'** শুনে জগদীশচন্দ্রের নিষ্কাম কর্ম সাধনা, তাঁর নিষ্কলুষ ভারতীয়তা, তাঁর জীবনের স্বরূপটি সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তারপর এই সভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর চাকরির প্রথম তিন বৎসর এক কপর্দকও বেতন না নিয়ে কি রকমে তাঁর আত্মসম্মান বজায় রেখেছেন, তাঁর পরবর্তী জীবন ভারতের বৈজ্ঞানিক সাধনায় কি রকমে উৎসর্গ করেছেন—তাঁর অন্তরের গোপন কক্ষে পতিত ভারতের উন্নতির জন্য কি বিপুল ব্যগ্রতা—বৈজ্ঞানিক হয়েও তিনি অন্তরে অন্তরে কত বড় কবি—সেই সব বর্ণনা করলেন। তাঁর মত স্বদেশপ্রীতি, আমরা খুব কমই দেখি। যে কেউ এই বিজ্ঞান মন্দিরে একবার পদার্পণ করলেই তাঁর চোখে পড়বে স্বদেশের ওপর তাঁর কি নিবিড় আকর্ষণ—সোনার ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কি মহান স্বপ্নই না তিনি দেখেন। বিজ্ঞানের সেবায় একনিষ্ঠ সাধক হয়েও তিনি স্বদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব-অভিযোগের কথা ভুলতে পারেন নি। কি প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি জগতের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ সুগম করেছেন।

পরিশেষে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে এই বিজ্ঞান মন্দির যেন দেশবাসীর বিজ্ঞানের তীর্থস্থানে পরিণত হয়—জগদীশচন্দ্রের এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন সার্থক হয়।

জগদীশচন্দ্রের ইউরোপে সপ্তম অভিযান

আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম বার ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যান। তখন তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর।

এবার ইউরোপ গিয়ে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের আহ্বানে বক্তৃতা দিলেন। তারপর রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনে বক্তৃতা দিলেন। অক্সফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশন তাঁকে বক্তৃতা দিতে সাদর আহ্বান জানাল। অতএব সেখানেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হল।

তারপর জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন রয়াল সোসাইটি অব আর্টসে। অক্সফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশনও বাদ গেল না।

ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা উপলক্ষে এক সংবাদপত্র লিখল—

"বৃটিশ এসোসিয়েশনের বিজ্ঞান বিভাগের একটি সভায় আচার্য বসু বক্তৃতা দেন। সভায় বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

"ঐ সভায় ভারতের বিজ্ঞানবিদ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হন। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে উদ্ভিদ জগতের জীবন-প্রণালী প্রাণিজগতের জীবন-প্রণালী হইতে বিভিন্ন—একটি সর্বদাই নিশ্চেষ্ট এবং অপরটি সর্বদাই কার্যশীল। বাহ্যদৃষ্টিতে এই উভয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা মনে হয় না।

"কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র এই বিষয়ে ক্রমাগত দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে এই মত যথার্থ নহে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, উদ্ভিদেরও হৃদয় আছে এবং তিনি স্পষ্টরূপে হৃৎস্পন্দন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন এবং উত্তেজক ও নিস্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া হৃদপিণ্ডের কার্যের তারতম্য করিতে পারেন।

ঐ সভাতে আচার্য জগদীশচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্পন্দনকারী উদ্ভিদে ঔষধ প্রয়োগে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা প্রদর্শন করেন।

"মানুষের শরীরে রক্ত যেরূপভাবে সঞ্চালিত হয়, বৃক্ষদেহেও রস সেই ভাবেই যে পরিচালিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র একটি

মৃতপ্রায় গাঁদা গাছ ইথারের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং অপর একটি মৃতপ্রায় গাঁদা গাছ মারাত্মক বিষের মধ্যে স্থাপন করিলেন। প্রথম গাছটি পুনর্জীবিত হইতে লাগিল, আর দ্বিতীয়টি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া মরিয়া গেল।

"অতঃপর একটি ছোট চারাগাছ বাঁচিবার জন্য যে বিপুল সংগ্রাম করিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করায় শ্রোতৃবৃন্দ গভীর বিস্ময়ে মগ্ন হন। একটি অন্ধকার গৃহে ঐ চারাগাছের নাড়ীর একটি প্রতিচ্ছবি প্রাচীরগাত্রে আলোকচিহ্ন দ্বারা প্রদর্শন করা হয়। ঐ চারা গাছটির মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা হইল। আলোক বিন্দু বাম দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে সরিয়া গেল। তারপর যখন ঐ চারা গাছটি মৃতপ্রায় হইল, তখন উহাকে ইথারের মধ্যে স্থাপন করা হইল। এক মিনিট পরেই আলোক বিন্দু স্থির হইল। তার জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তারপরই ঐ আলোকবিন্দু দক্ষিণ দিকে—অর্থাৎ জীবনের দিকে সরিয়া গেল। দক্ষিণের দিকে যখন আলোকবিন্দু সরিতে লাগিল তখন সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উপস্থিত হইল।

"উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী আচার্য জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব গবেষণা শুনিয়া ও তাঁহার যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভূত প্রশংসা করেন ও বেতার সহযোগে এই প্রশংসাবার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, জগদীশচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তার জন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির জগতে বৈজ্ঞানিকগণের একটি তীর্থস্থলে পরিণত হইবে।"

* * * *

ইংলণ্ড থেকে জগদীশচন্দ্র ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে প্যারীতে সোর্বন এণ্ড ন্যাচারাল হিষ্ট্রী মিউজিয়ামে বক্তৃতা দিলেন। ফ্রান্স থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন বেলজিয়াম। সেখানে ব্রসেলস ফাউণ্ডেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নূতন গবেষণার কথা বললেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন বেলজিয়ামের রাজা। তিনি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "Commandeur Ordre de Leopold" উপাধি দ্বারা ভূষিত করলেন।

সেখান থেকে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করতে গেলেন জেনেভায় লীগ অব নেশন্‌সের কমিটি অন ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর প্রথম সভায়।

তারপর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইনস্টাইন, লরেন্‌ৎজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমাবেশে তাঁর গবেষণার বিবরণ দিলেন

সেই সভায় অধ্যাপক আইনষ্টাইন জগদীশচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন—জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যতগুলি তথ্য দান করেছেন, তার যে কোনটির জন্য তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

* * * *

এইবার ইউরোপ-ভ্রমণের সময় জগদীশচন্দ্র "নার্ভাস মেকানিসম্ ইন প্ল্যাণ্টস" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই বইখানি তিনি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। ১৯২৬ সনের ২১শে এপ্রিল জগদীশচন্দ্র একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে এই কথা লিখে জানিয়েছিলেন।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর পত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিলাতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পেয়েছিলেন :—

"আপনার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর কথা শ্রবণ করিবার আমি যে সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং আপনি আপনার গবেষণা কার্যে যে বিরাট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনার প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগার যাহা আপনার নাম ও খ্যাতির যোগ্য—এবং উহার কার্যাবলীর বৃত্তান্ত আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে আপনার নিঃস্বার্থ উদ্যম এবং আপনার গবেষণার সাফল্য একদিকে যেমন আপনার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে, অন্যদিকে আপনার সম্মানে সমস্ত ভারতবাসী সম্মানিত হইয়াছেন। আপনার কার্য অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকুক এবং আপনার শ্রমের স্থায়ী ফল আপনি লাভ করুন, আমি ইহাই কামনা করি।"

* * *

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কার্যাবলী সম্বন্ধে ভারত সচিবের নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লেখেন :—

"জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের শাসনকর্তাদিগকে আমি জানাইতে চাই যে, আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভূতপূর্ব বক্তৃতা শুনিবার যে সুবিধা পাইয়াছি, তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—জেনেভা আগমনের ফলে কলিকাতা এবং জেনেভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেন সহযোগিতা স্থাপিত হয়। তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

ত্রিশ বৎসর গবেষণার ফল তিনি দর্শকদিগের সমক্ষে যেভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহতে দর্শকদের মনে বিশেষ সুফল ফলিয়াছে। আমরা তাঁহার গবেষণা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। আমরা আশা করি যে নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-রাজ্যে তাঁহার অবিষ্কারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন নিকটতর হইবে।"

* * * *

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসর জগদীশচন্দ্র অষ্টম বার ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যান। এবার তিনি ফরাসী দেশের দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। এই বৎসর লণ্ডনে আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিংসওয়ে হলে এই অধিবেশন বসে। জগদীশচন্দ্র এই অধিবেশনে "জীবন প্রক্রিয়া" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন।

লণ্ডন হতে জেনেভা গিয়ে তিনি 'লীগ অব নেশনসে'র অধিবেশনে যোগদান করেন। এই সময় লোকার্নোতে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। জগদীশচন্দ্র এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দশম বার্ষিকী

(২৯-১১-২৭)

২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬৷৷টার সময় বসু বিজ্ঞানমন্দিরের দশম বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র "উদ্ভিদের পরিচয়" শীর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, মাননীয় নবাব আলি চৌধুরী, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, ডাঃ বি. এল. চৌধুরী, রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু, অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

আচার্য বসু মহাশয় ছায়াচিত্র সহযোগে তাঁহার অভিভাষণের মর্ম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়ে দেন।

লণ্ডন রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতারত জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র (প্রৌঢ় বয়সে)

ইউরোপে নবম অভিযান

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র আর একবার ইউরোপ অভিযানে গেলেন। এটা হল তাঁর নবম অভিযান।

এবারে তিনি ভিয়েনায় বক্তৃতা দিলেন।

২০শে জুন, ১৯২৮! জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা শুনবার জন্য ভিয়েনার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েছিলেন।

তিনি ভারতীয় গাছগাছড়ার ওষধি শক্তি ও পুনরায় জীবন প্রাপ্তি প্রভৃতি দর্শকদের সামনে হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করে দেখান। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার দেখে বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকেরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। দর্শকমণ্ডলী এতে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তিনি ভিয়েনা একাডেমী অব সায়েন্সের তিনি একজন অনারারি সদস্য নিযুক্ত হলেন।

এইবার মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পরপর কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন।

'লীগ অফ নেশনস' কমিটি অন ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র যোগদান করেন।

জেনেভা স্কুল অফ ইন্টারন্যাশন্যাল স্টাডিস-এ "সংবেদনশীল সত্তা হিসেবে উদ্ভিদ" শীর্ষক তিনি আর একটি বক্তৃতা দিলেন।

তারপর মিশর সরকারের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র মিশর পরিদর্শন করতে গেলেন। তাদের কৃষিমন্ত্রী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন।

সেখানে মিশরের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন।

মিশরের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা লিখল,—"হে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, তুমি প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমাকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।"

নানা দেশের বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের মাথায় তাঁর জয় ও সাফল্যের মুকুট পরিয়ে দিলেন। গবেষণার মৌলিকতার জন্য সেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানীগুণীরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধা জানালেন।

ইউরোপের দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখক রোমা রোঁলা ও বার্নার্ড শ' তাঁকে তাঁদের গ্রন্থ উপহার দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। রোঁলা তাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ'

গ্রন্থের উপহার দেবার সময় তার পাতায় লিখে দিলেন—"নূতন একটা পৃথিবীর আবিষ্কারককে এ গ্রন্থ উপহার দিলাম।"

বার্নার্ড শ' তাঁর গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে লিখলেন, "পৃথিবীর নিকৃষ্ট শারীর-বৃত্তবিদের কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শারীরবৃত্তবিদের কাছে।"

জগদীশচন্দ্র যশের মুকুট মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। নিয়ে এলেন প্রশংসা ও স্তুতির মালা। সেইসব জননী জন্মভূমির চরণে নিবেদন করলেন। ভারতমাতার কৃতী সন্তান ভারতবাসীর কলঙ্কমোচন করলেন। ভারতবাসী আর ভাবালু নয়। প্রাচ্যের যাদুকর আবিষ্কারে মন্ত্রমুগ্ধ করে এলেন প্রতীচ্যের আত্মম্ভরিতাকে। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা দীপ-বর্তিকার মত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের পথ দেখাতে লাগল।

দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

এই বছর দেশে ফেরার পর দেশবাসী তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ নীলরতন সরকার, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বাংলার যত মনীষী আর তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন :—

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয় কর কমলেষু—

বন্ধু,

যে দিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদ শব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে।
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্ব ধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তণুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি ; নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনা গান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মত জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই ; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তর বেদনা

শুনেছ একান্তে বসি' ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা, নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে,
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
—তরুর মর্ম্মের সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
—হে সাধক শ্রেষ্ঠ. তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিতে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিল ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রা দীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে।

সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যা ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে. ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদীশচন্দ্রের এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে সরলা দেবী একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন—

"বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিণি!"

জগদীশচন্দ্র অতি সুললিত বাংলায় এই সম্বর্ধনার উত্তর দিয়েছিলেন।

দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ইউরোপে তাঁর তৈরি কৃত্রিম চোখের ওপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কাজ অবিকল প্রাণীদের চোখের মত পরীক্ষা করে দেখালেন তখন বিজ্ঞানীরা এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে ইংলণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ বেতনে এক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে সেখানে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উচ্চবেতন, গবেষণার সুযোগ প্রভৃতির পরিবর্তে জগদীশচন্দ্র কিছুতেই তাঁর জন্মভূমিকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "তোমাদের স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই, আমার আর কে আছে?"

এই কথাগুলি থেকে তাঁর অন্তরের গভীর দেশপ্রেম সকলের চোখের সামনে স্পষ্টই ফুটে ওঠে।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কত অসুবিধার মধ্যে যে গবেষণা করেছেন গবর্নমেণ্ট তাঁর গবেষণার পথে কত যে অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন তা পরাধীন ভারতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অন্তরের নীচতারই পরিচায়ক।

ভগিনী নিবেদিতা ১৮ই এপ্রিল, ১৯০৩ তারিখের একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"The college routine was made as arduous as possible for him so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence and flagrant misrepresentation." বিদেশী গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে ব্যক্তিগত গবেষণার কাজে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগার ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:—

"একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশ বাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার নূতন

তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুরা রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।...'

এত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র দেশমাতৃকার সেবাকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছেন। উচ্চ বেতনে ইউরোপের এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাগারে গবেষণা করার সুযোগও দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র অবহেলায় ত্যাগ করেছেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ছাত্রগণ যখন অধ্যাপক ওটেনের অপমানজনক কথা ও রূঢ় ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে ধর্মঘট করেছিলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রই ছাত্রদের সেই ধর্মঘটে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে বলেছিলেন, "তোমরা ঠিক করেছ।" তিনিই ছিলেন সেই ধর্মঘটের নৈতিক শক্তি (moral force)।

জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে দেশপ্রেমে কি রকমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। জগদীশচন্দ্রের পত্রের অংশ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচয়িতা উদ্ধৃত করেছেন।

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সে দিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভারবহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালকে জগদীশচন্দ্র তাঁর কয়েকটি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা নিজের ভাষায় বলেছেন—

"আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত একবার সেই আদর্শ এই বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জিয়াইয়া-মাতাইয়া তুলুন।"

মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল ; এবং তাহারই ফলে মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান সঙ্গীত—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।" রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক—প্রাচ্যের বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক। সোনার ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন।

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বাংলায় যে সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারই কতকগুলি সংকলন করে ১৩২৮ সালে 'অব্যক্ত' নামে তিনি একখানি বই প্রকাশ করেন। তাতে কুড়িটি প্রবন্ধ একত্র গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

জগদীশচন্দ্র নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখে বইখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন :—

কলিকাতা
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

বন্ধু,

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাই তাঁর একটি যন্ত্রের বাংলা নাম রেখেছিলেন "শোষণগ্রাফ।"

তাঁর বহু প্রবন্ধ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলি পরিশিষ্টে একত্র করে দেওয়া হল। সেই প্রবন্ধগুলি পড়লে দেখা যায় যে তাঁর ভাষা ছিল কবিত্বপূর্ণ। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল সুস্পষ্ট।

জগদীশচন্দ্র যদি বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করে সাহিত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতেন তাহলেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করে নিজে যশস্বী হতে পারতেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাসী' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। এটি মাসিকপত্রে জগদীশচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত বাংলা প্রবন্ধ।

ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে বেরিয়ে তিনি দেখলেন সব কিছুই ওই মহাদেবের জটা হতে আসছে। সেই জলকণা সূর্যের তেজে গরম হয়ে উপরে উঠছে। বজ্র প্রায় ঝড়ে আরো উপরে উঠে জটাজালের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। আবার

পাহাড়ের শিখরে তুহিন হয়ে ঝরছে। এ গতির বিরাম নেই, শেষ নেই। জটাজালের ভেতর যে মহাশক্তি লুকিয়ে আছে সেই শক্তিই সব কিছুর মূল।

প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এপর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে যে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক-খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

জগদীশচন্দ্র এই প্রবন্ধে যা লিখেছেন কোন সাহিত্যিক ছাড়া আর কারও দ্বারা এই রকম প্রকৃত ও উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

জগদীশচন্দ্র "কুমুদিনীর নিশি জাগরণ" প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। প্রবন্ধটি অতি অপূর্ব। এতে জগদীশচন্দ্র তাঁর অনবদ্য সাহিত্যের ভাষায় অতি সুন্দর করে বলছেন—"বৈজ্ঞানিকও কবির ন্যায় এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডে এক মহান ছন্দ এবং বিরাট ঐক্যের সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাই বৈজ্ঞানিক ঘন তমসাবৃত অমানিশায় কুমুদিনীর স্বরূপ দেখিবার ভার লইলেন; প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে প্রিয়সখার অদর্শন্ জনিত কোন চিহ্নই তিনি কুমুদিনীতে দেখিতে পাইলেন না। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন, কুমুদবন্ধু আকাশে দেখা দিল আর না দিল প্রতি রাত্রেই কুমুদের সেই একই উন্মেষ, সেই একই উল্লাস,—আরও দেখিলেন যে রবিকর স্পর্শ মাত্রেই কুমুদিনীর সঙ্কোচ ঘটে না, তাহার সুষুপ্তি আসে সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে।"

জগদীশচন্দ্র তারপর লিখছেন—

"একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষাচৈব উভয়ে তৈলদায়িকে।
তর্পণে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকশ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে।

গাজনে ঢাক দরকারং ঢোলং নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিয়ৎ মিলিত।" এই রচনার মধ্যে রস-সাহিত্যের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট।

আচার্য জগদীশচন্দ্র একবার মৈমনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করে বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বাৎসরিক সভায় তিনি বাংলা ভাষায় সভাপতির অনবদ্য অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি রামমোহন লাইব্রেরীরও সভাপতি ছিলেন। সেখানেও তিনি বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

তিনি কুন্তলীন পুরস্কারের যে রহস্যমূলক কাহিনীটি রচনা করেছিলেন সেটি প্রমাণ করে যে সাহিত্যরস তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় ছিল। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন।

স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য তিনি কখনও কারও কাছে মাথা নীচু করেন নি। আমরা তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞানের প্রথম পরিচয় পাই প্রেসিডেন্সী কলেজের তাঁর চাকরির সূচনায়। তখনকার দিনে ইংরেজদের ধারণা ছিল—বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়েও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব। সেইজন্য তখনকার দিনের বাংলার শিক্ষা-অধিকর্তা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., ট্রাইপস, লণ্ডনের বি. এস-সি জগদীশচন্দ্রকে ভাইসরয় লর্ড রিপনের আদেশেও শিক্ষা বিভাগে চাকরি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বড়লাটের বারবার তাগিদে তিনি জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের অস্থায়ী চাকরি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর বেতন নির্দিষ্ট হল একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের এক তৃতীয়াংশ।

জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতার আয়ের ওপর নির্ভর করে চার বৎসর বিলাতে লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন। তারপর বিলাত থেকে ফিরে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি নিয়েছেন তখনও প্রথম তিন বৎসর তিনি কোন বেতন গ্রহণ করেননি। অথচ সেই সময় তাঁর পিতার ঋণ পর্বত-প্রমাণ হয়েছে। সংসার চালাতে তাঁদের সে সময় যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সেটা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়।

জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয় যখন তখনকার ছোটলাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্য উচ্চবেতনে একটা পদ সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাতে তিনি গবেষণা করবার যথেষ্ট অবসর পাবেন। জগদীশচন্দ্রকে জানান হল যে কয়েক-দিনের মধ্যেই তিনি এই পদে নিয়োগপত্র পাবেন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্যই তাঁর সে পদ আর সৃষ্ট হল না। তার জন্য তিনি অন্তরে বেদনা পেলেন বটে কিন্তু দুঃখিত হলেন না।

আরও একবার জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক জানালেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সভায় আলোচ্য বিষয়-সূচীতে একটা বিষয় বিবেচনার জন্য আসছে। সে বিষয়ে গবর্নমেণ্ট একটা বিশেষ মত পোষণ করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় উপস্থিত হননি। তার জন্য গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালেন।

জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে একখানা চিঠিতে জানতে চাইলেন যে গবর্নমেণ্ট কি মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় উপস্থিত হয়ে গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাঁকে যে বিষয় যে ভাবে ভোট দিতে বলবেন, তাঁর সুনির্বাচিত মত যাই হোক না কেন, তাঁকে সেইদিকে ভোট দিতে হবে। যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করলে, গবর্নমেণ্ট মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো হিসেবে কর্তব্য করা হচ্ছে না, তাহলে তাঁকে ফেলো-পদ ত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হোক।

ছোটলাটের বিবেচনার জন্য এ বিষয়টি তাঁর কাছে উপস্থাপিত করা হোল। তিনি জগদীশচন্দ্রের মত অনুমোদন করলেন।

*　　*　　*　　*

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যখন শারীর-বিজ্ঞানী সার জন বার্ডন স্যাণ্ডারসনের আপত্তিতে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হল না তখন তাঁর কলেজের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। অথচ জগদীশচন্দ্র যদি তাঁর মৌলিক গবেষণা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত না করেই ভারতে ফিরে আসেন তাহলে তাঁর সারা জীবনের গবেষণা নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক যশ ও খ্যাতি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তখন জগদীশচন্দ্র ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়ে তাঁর ডেপুটেশনের ছুটি বাড়িয়ে দিতে বললেন। কিন্তু ভারত সচিব তাঁকে এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। তখন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র ভারত-সচিবকে জানিয়ে দিলেন যে ছুটি না পেলে তাঁকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হবে। তখন তাঁর ছুটি মঞ্জুর হল।

*　　*　　*　　*

প্রেসিডেন্সি কলেজে নূতন রসায়নাগার 'বেকার লেবরেটরীর' দ্বার উদ্ঘাটিত হবে। দিন স্থির হয়ে গেল। নিমন্ত্রণপত্র বিলি হয়ে গেল। লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল এসে দ্বার উদ্ঘাটন করবেন। জগদীশচন্দ্র বেকার লেবরেটরীর অধ্যক্ষ। অথচ তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানলেন না। তাঁর এক ছাত্র অধ্যাপক এসে জগদীশচন্দ্রকে এই সংবাদটি দিলেন। জগদীশচন্দ্র এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। কলেজের অধ্যক্ষের এই কাজের কি করে প্রতিশোধ নিতে হয় তা তিনি জানতেন।

বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কয়েকদিন আগে জগদীশচন্দ্রকে একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি একদিন জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে এসে

তাঁর নূতন গবেষণা দেখতে খুব আগ্রহী। তিনি তাঁকে একটা দিন স্থির করে এ বিষয় জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বেকার লেবরেটরীর দ্বার উদ্ঘাটনের কয়েকদিন আগেই একটা দিন স্থির করে সেইদিন লর্ড কারমাইকেলকে তাঁর পরীক্ষাগারে এসে তাঁর নূতন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

লাটসাহেবের সেক্রেটারী জগদীশচন্দ্রের নির্দিষ্ট তারিখ অনুমোদন করে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে ও কলেজের অধ্যক্ষ জেমসকে তাঁর কলেজে আগমনের সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

জেমস্ চিঠি পেয়ে ত অবাক। লর্ড কারমাইকেল বেকার লেবরেটরীর যে দিন দ্বার উদ্ঘাটন করবেন তাঁর আগেই তিনি আসছেন বেকার লেবরেটরীতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার দেখতে।

জেমস ছুটলেন জগদীশচন্দ্রের কাছে। এ কি কাণ্ড।

জগদীশচন্দ্র তখন জেমসকে লাটসাহেবের চিঠি দেখিয়ে বলে দিলেন যে লাটসাহেবের অনুরোধে তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কবে বেকার লেবরেটরীর দ্বার উদ্ঘাটন হবে তা তো তিনি জানেন না। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি কি করতে পারেন?

জগদীশচন্দ্র এই রকম করে অধ্যক্ষ জেমসের ওপর তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

আচার্যদেবের দেহাবসান

জগদীশচন্দ্রের বয়স হয়েছিল। এইবার জরা তাঁকে আক্রমণ করল। এতদিন ব্যাকুল আগ্রহে ও ঐকান্তিকতায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি দুর্জয় মনের আবেগে, উৎসাহে ও ঐকান্তিকতায় জীবনের সার্থকতা এনেছেন। হীনচেতা বৈজ্ঞানিকরা জোট বেঁধে এসেছে, তাঁর আবিষ্কার, তাঁর গবেষণা ব্যর্থ করে দিতে। অবশেষে তারা পরাজয় স্বীকার করেছে।

বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতমাতার কলঙ্কমোচন হয়েছে। ভারতবাসীর কলঙ্ক দূর হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে ছাত্রেরা বিজ্ঞানের গবেষণা করতে ভারতে এসেছে। তিনি তাদের গবেষণার পথ দেখাচ্ছেন।

অটল স্বাস্থ্য নিয়ে ভারতমাতার সুসন্তান জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞান অভিযানে জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন। ভারতমাতার জয়মাল্য নিয়ে এসেছেন। দেশে ফিরেও বিশ্রাম নেননি। কিন্তু এবার তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। সিজবেড়িয়ার মনোরম বাগানবাড়ী, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আবাসকক্ষ, দার্জিলিং-এর ৭০০০ ফুট উঁচু হিমালয়ের বুকে 'মায়াপুরী'—কিছুই তাঁর স্বাস্থ্য ধরে রাখতে পারল না। তাঁর বন্ধু নীলরতন সরকার এলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই যে দীপশিখা জ্বলছে, একে নিভতে দেওয়া হবে না। তাহলে ভারতের আলো নিভে যাবে। ভারতের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ভারত অন্ধকার হয়ে যাবে। ভারতমাতার গর্বের ধন মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাবে—তা হবে না।

নীলরতন আচার্যদেবকে গিরিডির আবহাওয়ায় বিশ্রাম নিতে বললেন।

লেডি বসুকে নিয়ে আচার্যদেব গিরিডিতে এক রায় বাহাদুরের বাড়ী গেলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। চিকিৎসক নীলরতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রতি সপ্তাহে তিনি গিরিডি এসে আচাযদেবকে দেখে যেতেন। আর ফিরে গিয়ে তাঁর কাকার কাছে আচার্যদেবের স্বাস্থ্যের খবর দিতেন।

স্থানীয় ডাক্তার চৌধুরী আচার্যদেবকে প্রত্যহ দেখতে আসেন। স্বাস্থ্যের গতি লক্ষ্য করেন। ইনসুলিন ইনজেকসন দেন।

লেডি বসু সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে আচার্যদেবকে ঘিরে রেখেছেন। সর্বদাই তিনি এবং রায়বাহাদুরের পরিবারের সকলেই তাঁর সেবায় তৎপর।

নীলরতন একদিন বললেন রক্তের চাপ দেখা দরকার। সব দিকে নজর রাখতে হবে।

আচার্যদেব তাঁর অসুস্থতার দিনগুলি নানা আলাপ আলোচনা দিয়ে মনোরম করে রেখেছেন। দেশের নানান সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তাদের সমাধানের কথা চিন্তা করেন।

রায় রাহাদুরের বাড়ী চায়ের টেবিল বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠের আলোচনায় ও আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। ওদিকে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের নানা শিষ্যের গবেষণার খবরও আসে। আচার্যদেব স্বপ্ন দেখেন শত কোকিলের কলরবে ভারত একদিন বসন্ত-মুখরিত হয়ে উঠবে।

২৩শে নবেম্বর, ১৯৩৭। আচার্যদেব ভাবলেন আর সাতদিন পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন কলকাতায় যেতে হবে।

প্রভাতে সকলে চায়ের টেবিলে আচার্যদেবের জন্য অপেক্ষা করছেন। আচার্যদেব স্নানের ঘরে ঢুকেছেন অনেকক্ষণ।

এত দেরী হচ্ছে কেন? লেডি বসু প্রভৃতি সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। অধীর প্রতিক্ষায় মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে।

লেডি বসু আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাথরুমের ভেজানো দরজা ঠেললেন। দরজা খুলে গেল।

তিনি সামনে যে দৃশ্য দেখলেন, তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। আচার্য দেবের অচৈতন্য দেহ বাথরুমের মেঝের ওপর পড়ে আছে। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। সেই আর্তনাদ শুনে সকলে ছুটে এলেন। সকলে ধরাধরি করে আচার্যদেবের দেহ বাইরে নিয়ে এলেন।

চেতনাহীন দেহে চেতনা ফেরাবার চেষ্টা হল। ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীতে লোক ছুটে গেল। তিনি খবর পেয়েই ছুটে এলেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন। সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

না, কোন আশা নেই!

ডাক্তার কোন আশাই দিতে পারলেন না।

সব শেষ। আচার্যদেব নেই। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আর সজ্ঞানে কলকাতায় ফিরবেন না। প্রতীক্ষিত প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

২৩শে নভেম্বর বিজ্ঞান জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আকাশ থেকে খসে পড়ল। জগতে হাহাকার উঠল। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের জীবনের অবসান হল। দিনের শেষে দিনমণি অস্ত গেল।

পরদিন তাঁর মরদেহ কলকাতায় ফিরে এল। হায় সবশেষ!

জগদীশচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলীর তালিকা

১৮৫৮, ৩০শে নভেম্বর—জন্ম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে—ফরিদপুর বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে—বর্ধমানে জগদীশচন্দ্র।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে—কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে—প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে—এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে—ইংলণ্ড যাত্রা।

১৮৮০-৮১—লণ্ডনে ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে—কেম্ব্রিজে ক্রাইস্ট কলেজে অধ্যয়ন ও বৃত্তি লাভ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (প্রকৃতি বিজ্ঞানে ট্রাইপস)।

—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে—প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—দুর্গামোহন দাশের কন্যা শ্রীমতী অবলাদেবীর সহিত বিবাহ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে—প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়ীভাবে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি উপাধি লাভ।

১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—প্যারিতে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহা-সম্মেলনে বক্তৃতা।

১৯০২—"Response in the Living & Non-living" —প্রথম পুস্তক প্রকাশ। দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯০৩—সি. আই. ই উপাধি লাভ।

১৯০৬—'Plant Response as a Means of Physiological Investigation'—দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ।

১৯০৭—'Comparative Elecrto-Physiology'—তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯০৮-৯—ইউরোপ ও আমেরিকায় তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযান।

১৯১১—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর মৈমনসিংহ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১২—সি. এস. আই. উপাধি লাভ।

—ডি. এস. সি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৯১৩—"Researches on the Irritability of Plants —চতুর্থ পুস্তক প্রকাশিত।

—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

১৯১৪-১৫—ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বৈজ্ঞানিক অভিযান।

১৯১৫—নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে অবসর গ্রহণ।

—পুরা বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্য "ইমেরিটাস" অধ্যাপক পদে নিয়োগ।

১৯১৬—কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসে উদ্বোধনী ভাষণ।

১৯১৭—ফরিদপুর শিল্প প্রদর্শনীর সভাপতির অভিভাষণ দান।

—নাইট উপাধি লাভ।

৩০শে নবেম্বর—বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৯১৯-২০—ইউরোপে পঞ্চম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

১৯২০—লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত।

—'অব্যক্ত' প্রকাশিত।

১৯২৩-২৪—ইউরোপে ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অভিযান।

১৯২৪—"The Physiology of Photo-synthesis" —পঞ্চম পুস্তক প্রকাশিত।

১৯২৬—ইউরোপে সপ্তম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—"The Nervous Mechanism of Plants" নামক ষষ্ঠ পুস্তক প্রকাশিত।

১৯২৭—"Collected Physical Papers"—সপ্তম পুস্তক প্রকাশিত।

—ইউরোপে অষ্টম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—"Plant Autograph and their Revelations —অষ্টম পুস্তক প্রকাশিত।

—"Motor Mechanism of Plants"—নবম পুস্তক প্রকাশিত।

১৯২৮—ইউরোপে নবম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—মিশর পরিদর্শন।

—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এস. সি উপাধি লাভ।

৩০শে নবেম্বর সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উৎসব।

১৯২৯—ইউরোপে দশম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—দশম পুস্তক "গ্রোথ এণ্ড ট্রপিক মুভমেণ্টস্ অব প্লাণ্ট্স" প্রকাশিত।

১৯৩১—কলিকাতা পৌরসভা কর্তৃক মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে নাগরিক সম্বর্ধনা

১৯৩৩—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস. সি উপাধি লাভ।

১৯৩৫—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস. সি উপাধি লাভ।

১৯৩৭—২৩শে নবেম্বর গিরিডিতে দেহাবসান।

—২৪শে নবেম্বর কলিকাতায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন।

জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা

কুমুদিনীর নিশি জাগরণ

জগদীশচন্দ্র বসু

বৈজ্ঞানিকের আগেই কবি আসর লইয়াছেন। 'ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী'তে কুমুদিনীর উন্মেষ ও দিবসে 'নির্মল উজ্জ্বল সূর্য্য করের' প্রভাবে নলিনীর বিকাশ দেখিয়া কবি গাহিলেন

'গিরৌ ময়ূরাঃ গগনে পয়োদাঃ
লক্ষান্তরে ভানুঃ জলে চ পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু—
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্॥'

কবি এইখানে থামিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও কবির ন্যায় এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডে এক মহান ছন্দ এবং বিরাট ঐক্যের সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাই বৈজ্ঞানিক ঘন তমসাবৃত অমানিশায় কুমুদিনীর স্বরূপ দেখিবার ভার লইলেন; প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে প্রিয় সখার অদর্শনজনিত কোন চিহ্নই তিনি কুমুদিনীতে দেখিতে পাইলেন না। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন কুমুদবন্ধু আকাশে দেখা দিল আর না দিল প্রতি রাত্রেই কুমুদের সেই একই উন্মেষ—সেই একই উল্লাস, আরও দেখিলেন যে রবিকরস্পর্শ মাত্রেই কুমুদিনীর সঙ্কোচ ঘটে না, তাহার সুষুপ্তি আসে সূর্যোদয়ের অনেক পরে।

একখানি ফরাসী অভিধানে কাঁকড়া সম্বন্ধে লেখা ছিল: কাঁকড়া একটি ছোট লাল মাছ যাহা পিছন দিকে চলে। অভিধানকার কাঁকড়ার এই বর্ণনা যথাযথ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কুভিয়ারের নিকট যান; কুভিয়ার শুনিয়া বলিলেন—চমৎকার, শুধু এইটুকু তফাৎ—কাঁকড়া মাত্রেই ছোট নয়, সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহা লাল নয়, ইহা মাছ নয় এবং আর যে দিকে যাউক ইহা পিছনে চলে না, এই যা প্রভেদ। নচেৎ বর্ণনা একেবারে হুবহু হইয়াছে।

কবি বর্ণিত কুমুদিনীর প্রণয়েতিহাসও অনেকটা এইরূপই। চন্দ্র না উঠিলেও কুমুদ ফোটে এবং সূর্য উঠিলেই ইহা মুদিয়া যায় না।

'বেলা গেল সন্ধ্যা হল ফুটল ঝিঙ্গার ফুল' গান শুনিয়া আর এক জাতীয় পুষ্পের বিকাশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গঙ্গার ধারে সিজবেড়িয়ার বাগানে খানিকটা জায়গায় মালী ঝিঙ্গা গাছ দিয়াছিল। সকালের সেই বাগানকে আর অপরাহ্নে যেন চেনাই যায় না। সূর্যের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য-প্রস্ফুটিত ঝিঙ্গা ফুল নব রং-এ রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এখানেও ফুলগুলি সমস্ত রাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিয়া সকাল বেলা মুদ্রিত হয়।

উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়াল মাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এই রূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে, রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এবিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে।

একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষাচৈব উভয়ে তৈল দায়িকে
তর্পণে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকঞ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকারং ঢোলং নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না ফোটা সম্বন্ধে এই রকমের কৈফিয়ৎ মিলিত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এই কি শেষ কথা থাকিবে? কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে এবিষয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষার ফল হইতে কি তথ্যে উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক।

টবশুদ্ধ একটা গাছকে কাৎ করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তো দেখা যায় ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোন গাছে খুব বেশী, কোথাও বা উহা খুব কম।

মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদ্ আলোকস্পর্শে পাতা উঠাইয়া নামাইয়া নানা রকমে সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কোন গাছে উহারা আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে থাকে। একটি মাদার গাছের পাতার উপর আলো ফেলা

হইল, পাতাটি এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়াছিল, আলোক পাইবামাত্র মন পুলকিত হউক বা যাহাই হউক এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী লতা এইরূপ অবস্থায় যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোকজনিত উত্তেজনা—মাত্র এই দুইটি শক্তি যদি উদ্ভিদের উপর কাজ করিত তাহা হইলেও উহাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন সংঘটিত করিত। কোথাও একটি শক্তি অপরটির বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে, কোথাও বা তাহারা পরস্পর সহায়তা করিতেছে; এবং প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়ার পরিমাণ কত বিভিন্ন। সুতরাং কোন উদ্ভিদে এই দুই ভিন্ন শক্তির সমবেত ফল দেখিয়াই বলা চলে না কোনটা কতটুকু কাজ করিতেছে; তজ্জন্য পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃপণ ১৫ টাকা রোজগার করিয়া তাহার মধ্যে ১০ টাকা জমায়; দাতা ১৫০০ টাকা রোজগার করিয়া আবার মাসের শেষে ধার করে; সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখিয়া কোন গৃহস্থের আয়ব্যয়ের অঙ্কের পরিমাণ দেওয়া চলে না; তজ্জন্য তাহার হিসাবের খাতা দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কুমুদের এই পাতা খোলা বা পাতা বন্ধ পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটিতেছে কিনা। একটি অর্ধ প্রস্ফুটিত কুমুদ ফুল লওয়া হইল; পাপড়িগুলি যদি উপরের দিকে উঠে তো ফুলটি মুদিয়া যাইবে, যদি নিচের দিকে নামে তো উহা আরও খুলিবে; কিন্তু ঠিক বিপরীত হইবে যদি ফুলটিকে মাথা নীচু ও ডালটি উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা যায়; তখন পাপ্‌ড়িগুলির উপরে উঠার ফলে ফুলটি আরও খুলিয়া যাইবে এবং নীচে নামিলে ফুলটি বন্ধ হইবে। সুতরাং একটি ফুলকে যদি মাথা নীচু করিয়া রাখা যায় তো যখন তাহার ফুটিবার কথা তখন সে বুজিয়া যাইবে, যখন তাহার মুদিবার কথা তখন সে খুলিয়া যাইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সে সোজাই দাঁড়াক বা উল্টিয়া থাকুক যখন ফুটিবার কথা তখনই কুমুদ ফোটে, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সুতরাং কুমুদ যে মধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় ফোটে না তাহা দেখা গেল। এইবার আলোর ক্রিয়ার ফল অনুসন্ধান করা যাউক।

একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মিত হইল যাহাতে পরীক্ষাকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার অনুপস্থিতিতেও ফুলের পাপড়ির উঠানামা মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার

পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন স্বতঃই লিপিবদ্ধ হইতে চলিল। দেখা গেল সূর্য উঠিলেই রবিকরস্পর্শে কুমুদিনী মুদ্রিতা হয় না, বেলা ১০।১১ টার পর তাহার পাপ্‌ড়ি বুজিয়া আসে।

সুতরাং ইহা আলোকের উত্তেজনার ফলেও নয়। ফুলের এই নিম্নলিখিত লিপির সাক্ষ্য হইতে একটা জিনিস লক্ষ করা যায় যে উহা সন্ধ্যা ৬টার সময় খুলিতে আরম্ভ করে এবং রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া যায়। আর বেলা ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে বুঁজিয়া যায়। আরও দেখা যায় সন্ধ্যার সময় হইতে তাপমান যন্ত্রের পারদ বেশী নামিতে থাকে এবং সকাল হইতে উত্তাপ বাড়িতে থাকে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ তবে কি বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে?

পূর্বের ঐ যন্ত্রটির গায়ে আর একটি যন্ত্র লাগাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে ফুলের ঐ লিপির পাশে পাশে সমস্ত দিবারাত্রির তাপ পরিবর্তনের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন এইরূপ লিপিসাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। পরে মিলাইয়া দেখা গেল যে দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ এক, মিশাইলে চেনা যায় না যে দুইটিতে দুইটি বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়; এবং যে কারণে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নোয়ায় এবং প্রাতঃকালে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, সেই একই কারণে সমস্ত পৃথিবীর কুমুদ রাত্রে বিকশিত হইয়া দিবসে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সেই একই করেণে গঙ্গার ধারে সিজবেড়িয়ার বাগানে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঝিঙ্গাফুলের রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি রাত্রের শৈত্য বজায় রাখা যায় তো দিবসেও রাত্রের ন্যায়ও কুমুদ প্রস্ফুটিত থাকে, পক্ষান্তরে রাত্রে যদি উহার চতুর্দিকে দিনের উত্তাপ সমপরিমাণে রাখিতে পারা যায় তো আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইলেও কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিবে না।

কিন্তু একটা কথা—এই কুমুদিনী যখন বিকশিতা তখন নলিনী, মালিনী কেন, আবার কমলিনীর উন্মীলনে কুমুদিনী মুদ্রিতা কেন? বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য কিরূপে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতেছে?

একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল ; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে, অথচ প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বাড়িবার জো নাই বলিয়া ফলে সমস্তটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক যদি আর একদিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে, পাতার একদিক আর একদিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মত হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখিবার জন্য নবনির্মিত ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ্ যাহা অত্যধিক শক্তিশালী অনুবীক্ষণের দৃষ্টির অতীত গাছের বৃদ্ধিকে কোটিগুণ পরিবর্ধিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে, সেই ক্রেসকোগ্রাফে একটি গাছ বসান হইল ; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারিদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার বরফজল ফেলিয়া গরমজল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল্। বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপড়িও বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু এই পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশী কমনীয়, সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশী বাড়িবে, ফলে সমস্ত পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে, সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে, তবে এবার উহা উল্টা দিকে বাঁকিবে, ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে।

সুতরাং একই উত্তেজনা যে ভিন্ন জাতীয় পুষ্পকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠনবৈচিত্র্যের ফলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে নিম্নতম প্রাণীর সাড়া দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বহু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। জীব মাত্রেই বাহিরের যাবতীয় আঘাতে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ, কেবল উদ্ভিদকে যে দিকে নাড়াও সেই দিকেই নড়িবে, যে দিকে বাড়িবার শুধু সেই দিকেই বাড়িবে, বহির্জগতের আঘাতে সাড়া দিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, কেবল লজ্জাবতীর ন্যায় কয়েকটি স্পন্দনকারী উদ্ভিদ ভিন্ন

যাবতীয় উদ্ভিদই নীরব নিস্পন্দ এবং এই অস্পন্দতাই যেন উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম এই কথাই মনে করা হইত। কিন্তু উদ্ভিদকে কত অবস্থা-পরম্পরার মধ্যেই না বাড়িতে হইয়াছে। নিয়ত পরিবর্তনশীল আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য, পৃথিবীর আকর্ষণ ও ঝঞ্ঝা কতই না তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, কত ভাবেই না সে তাহার অন্তর্নিহিত বেদনা জ্ঞাপন করিতেছে, কিন্তু মানবচক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ আপনি আপনি আপনার অদৃশ্য বেদনার কাহিনী নিজ হাতে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহা এমন ভাষায় লিখিবে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেবলমাত্র তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হইল যে উদ্ভিদ মাত্রেই, কেবলমাত্র লজ্জাশীলা লতা নয়, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় অভিভূত হয়। আজ সেই লিপির সাক্ষ্যে আমরা বলিতে পারি যে এই ভূমণ্ডলে শুধু মানবই যে বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় আক্রান্ত হইতেছে তাহা নয়, নীরব উদ্ভিদও সমভাবে উহা অনুভব করিতেছে এবং কত কাল কত যুগ ধরিয়া কত অশ্বত্থ বট, কত তাল তমাল সেই আঘাত উত্তেজনার ইতিহাস নিজেদের দেহে বহন করিতেছে।

অদৃশ্য আলোক

[প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৮ ; কষ্টিপাথর পৃঃ ৯৯]

আচার্য সার জগদীশচন্দ্র বসু, এফ. আর. এস

সেতারের তার অঙ্গুলি তাড়নে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। দেখা যায় তার কাঁপিতেছে ; সেই কম্পনে বায়ু রাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে স্বর উপলব্ধি হয়। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। কম্পন সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয় অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। "কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক স্বর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ-স্পন্দনে সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক স্বর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক, আকাশের অগণিত স্বরের মধ্যে এক সপ্তক স্বর মাত্র দেখিতে পাই। আকাশস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারিশত লক্ষ কোটির উর্দ্ধে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি ? অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ আবশ্যক। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ— দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে ; সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

এখন দেখা যাউক দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

(১) ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

(২) ধাতুনির্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

(৩) আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়।

(৪) সব আলোকের রং এক নহে, কোন আলো লাল, কোনটা পীত, কোনটা সবুজ এবং কোনটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রংএর পক্ষে স্বচ্ছ কিম্বা অস্বচ্ছ।

(৫) আলো বায়ু হইতে অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইয়া বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাঁচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাঁচ-বর্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৬) আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোন শৃঙ্খলা নাই, উহা সর্বমুখী অর্থাৎ কখনও ঊর্দ্ধাধ, কখনও বা দক্ষিণে বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিক জাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে। তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম পরে বলিব

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ সে সম্বন্ধে পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে, তাহার প্রমাণ এই যে বিদ্যুতোর্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে এক পাশে ধরিলে কোন উত্তেজনা চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে এবং সেই প্রত্যাবর্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোও সেইরূপ এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোক দ্বারাও যে আণবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

জানালার কাচের কোন বিশেষ রং নাই, সূর্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ; জলও

স্বচ্ছ। কিন্তু ইটপাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম! তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় আছে। ইটপাটকেল যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে আলো এক স্বচ্ছ বস্তু অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিম্বা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপ প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচবর্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট পাটকেল দিয়াও সেইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে। বস্তু বিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আবার আলো বিকীরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে চীনা বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোন দিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয়, তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন সৌখীন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালাপিরীচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

প্রদীপের অথবা সূর্য্যের আলো সর্ব্বমুখী অর্থাৎ তাহার স্পন্দন একবার ঊর্দ্ধাধ, অন্যবার দক্ষিণ বামে হইয়া থাকে; লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরাল ভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়, কিন্তু একখানি অন্যখানির সম্মুখে আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে।

মনে কর দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্টা জীব কচ্ছপ। সর্বমুখী অদৃশ্য আলোক'ও এইরূপ দুইপ্রকারের স্পন্দন সঞ্জাত। সম্মুখে লোহার গরাদে খাড়াভাবে ধরিলে সহজেই দুই প্রকার জীবদিগকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই বাধা পার হইয়া যাইবে, কিন্তু চেপ্টা কচ্ছপ গরাদের এপাশে পড়িয়া থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদগুলোকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটা গরাদে অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে, দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়াও যাইবে—তখন দ্বিতীয় গরাদেটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদেটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয়, তাহা হইলে কোন কোন বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে, কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা প্রমাণিত হইল।

অদৃশ্য আলোক ইটপাটকেল, ঘর বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ১৯০১ সালে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়।

মোসলেম ভারত (ভাদ্র)

বিজ্ঞানে সাহিত্য

[বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশন]

সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসুর অভিভাষণ (১৯১১)

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদু স্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্ল ভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরুপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তি বলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি। জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলা দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীর

ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই; বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মেলন-যজ্ঞে যাহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞান রাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে। তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপরদিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা একস্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশকাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য সম্মিলন সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক

মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন, সেই সেই মহলেই বুঝি তাহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্য আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেই জন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোন অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোক রশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি

এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই।'

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রং তাহার চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ-বর্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহুদূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ সঙ্গীতের অসংখ্য সুর সপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের

অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষ জীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অন্তরের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেই জন্য রুদ্র জ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এইরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এ জন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে, ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় কোন প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম।

সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত—অশিক্ষিত কিম্বা অর্ধ শিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমতঃ গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়তঃ গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাহায্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞা পালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। তবে, বহু

বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্য সমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোন মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

যদি গাছ লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা ত দিবাস্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজ সাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতি দেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দন ধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা—সঞ্চিত শক্তি বলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতি দেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানে বাধা

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট পরীক্ষাগারেব অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত, তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই

আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে, কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেত পদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয় পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠন প্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে, তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল

এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম **"বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া।"** কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয় সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধঅন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, **আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহা শিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড় দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।** সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি; **কখন শিল্পকলায়, কখন সহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।**

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবি-কল্পনা, কোথাও যুক্তি-বিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সব দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনী শক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। **আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।**

সেই আমাদের সৃজন শক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গলা সাহিত্য পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তর দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব প্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী

জগদীশচন্দ্র বসু

মানুষের অঙ্গভঙ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকাল বেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তি হেতু তাহা পরিবর্তিত হয়। সুখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্তন-জনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা ফণিনী মুহূর্তেই সংহাররূপিণী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সংস্থিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকাল বেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে সূর্যমুখী গাছটি পূর্ব্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে প্রত্যেক পাতার উপরে যেন সূর্যরশ্মি পূর্ণরূপে পতিত হয়। ইহার জন্য কোন পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিম্বা বাম দিকে পাক খাইয়া সূর্য কিরণ পূর্ণ মাত্রায় আহরণ করে। বৈকাল বেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিম গগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল? বাহিরের সহিত ভিতরের একি অদ্ভুত সম্বন্ধ! সূর্য ত প্রায় পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল?

উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, সূর্যমুখীর এই ব্যবহার 'হীলিও ট্রোপিজ্‌ম্' জনিত। হীলিও ট্রোপিজ্‌মের বাংলা অনুবাদ, সূর্যের দিকে মুখ

হওয়া। সূর্যমুখী কেন সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হয়? কারণ "সূর্যের দিকে মুখ" হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোন বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন কোন দুর্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে সেই মন্ত্রটি সংস্কৃত, লাটিন কিম্বা গ্রীক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাঙ্গলায় কিম্বা অন্য আধুনিক ভাষায় হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। এই জন্যই গ্রীক হীলিও ট্রোপিজ্‌ম মন্ত্রে সূর্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল।

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এইসব অঙ্গভঙ্গী অদৃশ্য জীব বিন্দুর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত হয়। জীববিন্দুর পরিবর্তন অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহু চেষ্টার পর বিদ্যুৎ বলে সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই বিষয়ে দুই একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসান একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধ্র দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক রেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসান লতাটি যদি জানালার নিকটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরায় নূতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং কোন গুলি বামদিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থূল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখন ডানদিকে কিম্বা কখন বামদিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশীর আকুঞ্চন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে লজ্জাবতীর পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশী আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশীর দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর একটির দ্বারা নীচের দিকে নামে, অন্য একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, পালক দ্বারা উপরের পেশীটুকুতে সুড়সুড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই ঊর্ধ্বগতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বামদিকে বা ডানদিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে ঐরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্যের আলো এইরূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায়। তবে সূর্যের আলোক ত সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্র মূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড় ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোট ডাঁটা সংযুক্ত এবং সেই ছোট ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে। আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরেই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়াত সেই দূরের স্থূল পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোট পাতাগুলি অনুভব জনিত উত্তেজনায় কি সঙ্কেত কোন্ পথ দিয়া দূরে পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে চারিটি ছোট ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্যন্ত চারিটি স্নায়ুসূত্রে প্রসারিত। তাহা দ্বারাই খবরাখবর পৌঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতাগুলিকে কোন রূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সূত্র দিয়া পত্রমূলের এক নম্বর পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বাম দিকে পাক খাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ঐরূপে উত্তেজিত করিলে ডান দিকে পাক খায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড় পাতাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বলগা টানিয়া সঙ্কেত পাঠায়?

কেবল তাহাই নহে। কোন নির্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য একটি বলগা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশাহীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক দাঁড়ের নৌকার ন্যায়

কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে, কেবল তখনই দুইটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং সে সোজাপথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্য একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন সোজাসুজি আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমান ভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে জীবনে কিম্বা মরণে!

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব-দিগ বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে, কখনও উর্দ্ধে, কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার জন্য অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতী পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ না চারিটি ডাঁটার পত্র-সমষ্টি সমান ভাবে আলোকমুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বলগার টানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিম্বা বামে, উর্দ্ধে কিম্বা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে? দিবাকর নিজকে, কোটি কোটি অংশে বিভক্ত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্যদেবের শত শত মূর্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বলগা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলি কণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি-জীব বিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরশ্মিকে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন!

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ পৃঃ ২২৮—২৩২

কচুরী পানা

জগদীশচন্দ্র বসু

কচুরী পানার (Water Hyacinth) উৎপাতে আমাদের বাংলা দেশের কৃষিকার্যের যে কি প্রকার অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জন্মিয়া ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহার দ্বারা যে কৃষিকার্যের বিঘ্ন হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। এখন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কৃষিযোগ্য ভূমিই এই পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গেরও স্থানে স্থানে ইহার উৎপাত অনুভূত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের ভূমি উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেখানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না; চাষের হাঙ্গামাও সেখানে খুব কম। তাই সেখানকার জমিতে সোনা ফলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কচুরী পানার উৎপাত যে প্রকারে বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের উর্বরতা যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না।

কচুরী পানার উৎপাত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে তাহা নহে, আমেরিকাতেও ইহার উৎপাত কম নয়। সেখানে আজও এই উৎপাত নিবারণ করা যায় নাই। ইহা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—তবে আর কি, যাহাদের এত টাকা, এত আয়োজন, তাহারা যখন পানা নষ্ট করিতে পারিল না, তখন আমাদের চেষ্টা বৃথা। আমরা এই প্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, আমেরিকা পারিল না বা অপর কোন দেশ পারিল না বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা ফলবতী হইবেই। এখানে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে,—অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই আধিপত্য ছিল, তখন আমাদেরই পূর্ব পুরুষেরা উদ্ভিদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া অরণ্য ভূমিকে কৃষিক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন অরণ্য মানুষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া এইক্ষণে উদ্ভিদেরই এক বংশধর মাথা চাড়া দিয়া আজ আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের হাতে অস্ত্রের ত অভাব নাই। উদ্ভিদের সহিত মানুষের এই প্রকার সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। কোন প্রাণী বা কোন উদ্ভিদ নিজের বংশ বিস্তার

করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দখল করিয়া বসুক ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই কোন জীব যাহাতে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে তাহার জন্য প্রকৃতিতে অনেক ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় অনেক জীব মারা যায়। তাহার পরে এক জাতীয় জীব আর এক জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, মানুষের সহিত পশুর এবং প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের নিয়তই সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে যে জীব যতই অধিকার পাইবার যোগ্য তাহা আপনা হইতেই পায়। যদি কোন কারণে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্রুত বংশ বিস্তারের কোন বাধা না থাকে, তবে তাহাই হইয়া দাঁড়ায় উৎপাত। অষ্ট্রেলিয়াতে খরগোস ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানে এক জোড়া খরগোস ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র জন্তুর বংশবিস্তারে অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এত খরগোস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহাদের উৎপাতে কৃষিকার্যের ক্ষতির আশঙ্কা হইতেছে। কোনো এক খেয়ালী লোক ইংলণ্ড হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর ছিল। অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই পোকাদের বংশধরগুলি এখন আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে ভয়ানক বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে মূল্যবান পাইন গাছ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাকেই বলে উৎপাত। আমাদের দেশে কচুরীপানাও কতকটা এই রকমেরই উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের শৈশব উপাখ্যানের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্র সেই প্রকাণ্ড রাক্ষসটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ রাক্ষসটার প্রাণপুরুষ ছিল চৌদ্দ হাত জলের তলায় স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরে লুকানো। আমাদের ও অন্য দেশের রাজপুরুষেরা কচুরিপানা বিনাশের জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজপুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতই বৃথা হইয়া যাইতেছে। কারণ ইহারা কেহই জানেন না পানা রাক্ষসীর প্রাণপুরুষটা কোথায় লুকানো আছে। এই জন্য লক্ষ্য স্থির না করিয়া লক্ষ্য ভেদের চেষ্টার ন্যায় ইহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। কচুরী পানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া, কি প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং কোন অবস্থা তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল, এই সকল তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই সকল তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাই পানা বিনাশের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে,

সেগুলি অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ প্রায়ই বিজ্ঞানকে যাদুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে ভীত হইয়া পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই, মন্ত্রবলে উৎপাতের শান্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকেরা সুযোগ ছাড়ে না। তাহারা বৈজ্ঞানিক সাজিয়া নানা আড়ম্বরে জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। লোকে ভাবে ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী। কোন অজ্ঞাত ব্যাপারের মূল কথা জানিয়া কার্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভড়ং দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি অনুসন্ধানের বাহ্য শাখা-প্রশাখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করেন। কত অবান্তর ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে তাহার ইয়ত্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞানিক এই সকল অবান্তর ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মূলতত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র। গাছের রস কি প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা এ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যার একটি প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া ছিল। পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অবিরাম চেষ্টার পরে এখন রস প্রবাহের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবান্তর ব্যাপারগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং পরে সেই লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া আবিষ্কারের মূলসূত্র।

কচুরীপানার গাছটি কিরূপ এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। গঙ্গার তীরে সিজ্‌বেড়িয়া নামক স্থানের একটি খালে নিবিড় পানা আছে। গাছগুলি কখন কখন দুই হাত পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং স্থানে স্থানে সেগুলি এমন নিবিড় ভাবে জলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে পানার উপর দিয়া মানুষও হাটিয়া চলিতে পারে। একটি বিচ্ছিন্ন কচুরীপানার গাছ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন পাতা সমেত গাছটি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ। এক একটি গাছে কখন কখন দেড় শতেরও অধিক শিকড় থাকে। কেবল ইহাই নয়, এই পানাগুলি আবার জলের তলায় লতাইয়া চলে এবং ইহাতে তাহাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচুরী বংশ বিস্তারের ইহাই একমাত্র উপায় নয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। কচুরীপানার পাতার ডাঁটাগুলিও অদ্ভুত,—সে গুলি ফাঁপা ধরনের,—তাই জলে ভাসে।

যাহা প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের মন সর্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ অনেক। ইহাতে আসল কথা চাপা পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বাঁধা নিয়মে কচুরীপানা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে আসলকে ঠেলিয়া ঝুটাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন। পানার চকচকে পাতা ও ফুলগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তাঁহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে পাতা ও ফুল নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু গাছ মরে নাই। গাছগুলি যে লম্বা শিকড় চালাইয়া জলের তলা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহা ইহাঁদের নজরে পড়ে নাই। এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পুষ্করিণী হইতে পানা উঠাইয়া ফেলিলে দেখা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা আবার পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে দুই চারিটা শিকড় জলের তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নূতন পাতার উৎপত্তি করে। জলের ভিতরকার শিকড় নষ্ট করিতে না পারিলে এই শত্রুর বিনাশ নাই। যাহারা পানা নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। কচুরীপানার একটি ক্ষুদ্র শিকড় হাজার হাজার নূতন গাছের সৃষ্টি করিয়া দশ বিঘা স্থানকে কয়েক মাসের মধ্যে আচ্ছন্ন করিতে পারে।

এখন কচুরীপানা বিনাশের উপায় কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি উপায়ের কথা মনে হয়,—

(১) পানার গায়ে ছত্রক জাতীয় (Fungal Parasites) পরাসক্ত জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।

(২) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করা।

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা।

(৪) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্ট করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। বিষস্য বিষমৌষধম্ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। পানা মারিবার জন্য যে ছত্রকের আমদানি করা হইবে, তাহা ধান, পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা বলা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। সাপ মারিবার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিস্ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আমদানি করা হইয়াছিল। ইহাতে সাপের উপদ্রব কমে নাই, কিন্তু বেজিদের উৎপাতে লোকের হাঁস বা অপর পাখী পোষা দায় হইয়াছে।

কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের শাস্তি করিতে গিয়া আর এক নূতন উপদ্রবকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। পানা মারিবার জন্য ছত্রকের আমদানি করিলে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকা বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে। আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তা ছাড়া ল্যাংলে আকাশযান উদ্ভাবন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকাতে ঝুটা বিজ্ঞানের আড়ম্বরে আসল বিজ্ঞান চাপা পড়িতে বসিয়াছে। ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সে কচুরীপানা নষ্ট করিবার জন্য জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গায়ে লাগানো হইয়াছে। পানা নষ্ট করার এই পদ্ধতির প্রশংসা খবরের কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে। বহু ব্যয়ে বর্মাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানেই সুফল পাওয়া যায় নাই। গরম জলীয় বাষ্প নলের মুখ হইতে বাহির হইয়া কেবল পাতাগুলাকে ছিঁড়িয়া এবং বিবর্ণ করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই। আশা ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, তাহারা আর জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নষ্ট করিবার পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অদম্য; সাধারণ উপায়ে গরম জলীয় বাষ্প দ্বারা পানা মরিল না দেখিয়া তাঁহারা কলকারখানা বসাইয়া যতদূর সম্ভব চাপ প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্প পানাগাছের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ইহারও ফল পূর্ববৎ হইল, পানা মরিল না। আমাদের দেশেও পানা মারার এই অভিনয় অনুকৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রকার একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্বে কত উষ্ণতায় পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না।

জখম হইলে গাছের পাতা ও ডাল প্রভৃতির অবস্থান্তর ঘটে। দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ গুলি সত্যই মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর লক্ষণ লইয়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কোন্ গাছ জীবিত অবস্থা ছাড়িয়া ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যুর কোঠায় পা দিল, তাহাও বৈদ্যুতিক উপায়ে সেখানে নিরূপিত হইয়াছে। কচুরীপানা মৃত্যুলেখ যন্ত্রের (Death Recorder) আধারস্থ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া জলের উষ্ণতা ধীরে ধীরে বর্ধিত করা হইয়াছিল। যখন জলের উষ্ণতা সেন্টিগ্রেডের ৬০ অংশ (অর্থাৎ ফাহরন্ হিটের ১৪০ অংশ) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে

[illegible] মৃত্যুরেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কচুরীপানা ১৪০ অংশ উত্তাপ পাইলেই মরিয়া থাকে, তাহা পানা নাশকারী সরকারী কর্মচারীরা জানিতেন না। তাঁহারা যে জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নাশ করিতে গিয়া অজস্র অর্থ নাশ করিয়াছেন তাহা উষ্ণতার অভাবে হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প দ্বারা জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই। কাজেই উপরকার পাতাগুলি ঝলসাইয়া গেলেও পানা মরে নাই। মৃত্যুকালে যেমন প্রাণীদের সর্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায়, উদ্ভিদের মৃত্যু সময়েও ঠিক সেই প্রকার আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন অনেক বিষপদার্থ আমাদের জানা আছে। বিষ মিশ্রিত জল পিচকারীর মত কোন যন্ত্র দ্বারা পানার গায়ে ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া যায় নাই। নিবিড় পাতার আবরণ ভেদ করিয়া বিষজল গাছের সর্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে নাই। সিক্ত করিলেও বিষ শিকড়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বিষ প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয় বাষ্প পানার পাতাই ঝলসাইয়াছিল, ইহাতে পাতা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের তলার শিকড় মরে নাই,—কাজেই গাছও মরে নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষজল ছিটাইয়া দিলে তাহাতে উহার শিকড় মরিবে কি? সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ডগায় বিষ লাগাইলে তাহা গোড়ায় গিয়া পৌঁছিবে, ইহা অনুমান করিয়া কর্তৃপক্ষেরা বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া রস প্রবাহ চলাচল করে, তাহা ঐ সকল গবেষণার ফলে স্পষ্ট জানা গিয়াছে। এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের দেহে বিষ প্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার রসপ্রবাহের সহিত নীচু হইতে উপর দিকে চলে,—বিষ উপর হইতে নীচু দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা কখনই ঘটে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বিষ দিয়া পানা মারিতে হইলে বিষজল পানার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই মোটা কথাটি না জানার জন্য যে সময় ও অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয়। পূর্বে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা আমরা অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া বলি নাই। পরীক্ষাতে উক্তিগুলির সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। শিকড়ে বিষজল প্রয়োগ করিলে তাহা রসপ্রবাহের সহিত উপরকার সর্বাঙ্গে ছড়ায়।

তাই গাছটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের দিক হইতে মরিতে আরম্ভ করে। বিষ প্রয়োগে কেবল যে কচুরীপানারই এই প্রকারে মৃত্যু ঘটে তাই নয়। একটি সতেজ চন্দ্রমল্লিকার গাছের মূলে বিষ প্রয়োগ করিলে রসের সহিত গোড়ার বিষ উপরের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গাছটিকে মারিয়া ফেলে।

গাছের গোড়ায় বিষ প্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় লাগাইলে কি হয়, এখন দেখা যাউক। আগায় বিষজল ছিটাইয়াই কচুরীপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লোহা বা অপর ধাতব বস্তুর আগা গরম করিলে ক্রমে তাহার গোড়া গরম হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া বিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হয় না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কচুরীপানার একটি ডাঁটা সমেত পাতাকে বিষজলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল বিষ নীচের দিকে নামে নাই—যে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল কেবল তাহাই মরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। কেবল কচুরীপানাতেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নহে, চন্দ্রমল্লিকার একটা ডাঁটাকে ঠিক ঐ প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া অবিকল ঐ ফলই পাওয়া গিয়াছিল।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে, কচুরী পানার বিনাশকে লোকে যে একটা মহাসমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল এখন তাহা মনে করার হেতু নাই। পাতা, ফুল বা ফল নষ্ট করিলে ইহা মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে—সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই এখনকার কর্তব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের গবর্নমেণ্ট সাবধান হইতে পারিবেন। আশা করি, সাধারণের অর্থ আর মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যয়িত হইবে না।

কি করিয়া পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ করা উচিত ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এ সম্বন্ধে এই মত যে কচুরীপানা জল হইতে সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করাই আমাদের এখনকার কর্তব্য। ইহাতে খরচপত্র আছে জানি, কিন্তু এই খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্পই হইবার কথা। তা ছাড়া এই শ্রম ও অর্থব্যয় কখনই বৃথা হইবে না। দেশের টাকা প্রজাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হইবে। কচুরীপানা নষ্ট হইলে কৃষি কার্যে যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় এই ব্যয় অতি সামান্য। একই সময়ে সকলের সমবেত

চেষ্টায় এক একটি স্থান একবারে পানা-বর্জিত করিতে হইবে। নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিষ্কৃত স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরীপানা যে কি সর্বনাশ করিতেছে কৃষিজীবীরা তাহা বুঝিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়া একত্র পানানাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য আইন জারির প্রার্থনা করিতেছেন। আইন মাত্রেই কঠিন ও নির্মম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হয়, তাহার জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে। সকলে একত্র খাটিয়া পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি এই ভাবটি মনে বদ্ধমূল করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করা যায়। যাহা হউক, রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শান্তি হইবে।

'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতেছিল। সেই কার্য বন্ধ রাখিয়া আমরা কচুরীপানা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কার্যে যোগ দিব। কচুরীপানা সম্বন্ধে গবেষণা আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে এই উদ্ভিদের জীবনের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা কি প্রকারে বংশবিস্তার করে তাহা আরও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে কচুরীপানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আমাদের কোন লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিতে পারা যায় কিনা। এই প্রকারে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে; তাহা হইলে পানা তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়া যাইবে। যাঁহারা এই সকল অনুসন্ধানের কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের সত্যই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কিনা তাহা সর্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে চলিবে না। সুবিবেচনা করিয়া হাতে কলমে কাজ করিবার দক্ষতা ইহাদের থাকা চাই। তাহা ছাড়া যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে তাঁহাদের গবেষণার কার্য বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞেরা ইহাতে তাঁহাদের কার্য কোন্ পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কার্যের সমালোচনা করিবারও সুযোগ পাইবেন। সম্প্রতি

একজন সহকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্পনা করিতেছেন, কচুরীপানাকে কাগজ প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে কোন উদ্ভিজ্জ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাগজ প্রস্তুতের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়। এই প্রক্রিয়ার খরচা উঠাইয়া সেই উপাদানে এখনকার মত সস্তায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে কিনা, ইহা সর্বাগ্রে দেখা কর্তব্য। তাহা না করিলে সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আর একটি জনরব শুনিয়াছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি আর কতগুলি উদ্ভিজ্জ সামগ্রীকে লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আজকাল আর তাহার কথা শুনিতে পাই না।

যাহা হউক, কচুরীপানা আমাদিগকে যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে তাহা সামান্য নয়। ঘোর বিপদের সময়েই লোকে একত্র হয় এবং একত্র হইয়া বিপদ নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখন তাহারা প্রত্যক্ষ করে। এই মনুষ্যত্বই বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে খর্ব করে এবং শেষে জয়ী হয়। অতীত যুগে এই মনুষ্যত্বই বন জঙ্গলাদির ধ্বংস করিয়া এই পৃথিবীকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল এবং তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়াছিল। আজ আবার সেই মানুষকেই আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মপটু ও মিতব্যয়ী হইয়া এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমস্ত মানবের অকল্যাণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তাহাতে অকল্যাণ দূর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহির ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার বল সঞ্চিত হইবে।

(বসুবিজ্ঞান মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[পৌষ, ১৩৩২, প্রবাসী পৃঃ ২৮৯]

[গত এক বৎসরের মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। গতমাসে দার্জিলিং-এর গবর্নমেণ্ট হাউসে লর্ড লিটনের নিমন্ত্রণে যে সভা আহূত হয় তাহাতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের পেশীমণ্ডল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিনের অষ্টম বার্ষিক উৎসব সভায় তিনি উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ও রস সঞ্চালন সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ইংরেজী মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত বক্তৃতা ও আচার্য বসুর অন্যান্য প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইল।]

বত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি অদৃশ্য বৈদ্যুতিকরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। হার্জ (Hertz) আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অতি বৃহদাকার বলিয়া, সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আলোর উর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা প্রেরিত আকাশ-উর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া থাকে। অদৃশ্য আলো উপলব্ধি করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কল তৎকালে ছিল না। আমা কর্তৃক গ্যালিনা রিসিভর উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা হইল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি সর্বসমক্ষে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিদ্যুৎ উর্মি গবর্নরের বিশাল গৃহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। তাহা একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল।

জীব ও অজীব

তারহীন কল লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপ বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

উদ্ভিদের সাড়া

ইহার পরে আমি উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনধারার মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। আহত হইলে প্রাণী দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে; তাহার হৃদয়যন্ত্র সর্বদা স্পন্দিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাণী, ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্যদ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারে। অপর পক্ষে বৃক্ষাদির সঙ্কোচন বা প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাতে কোন স্পন্দন নাই, তাহারা স্নায়ুহীন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। দুইটি জীবন-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, অথচ তাহাদের জীবনে কোথাও ঐক্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহুদিন যাবৎ উদ্ভিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে দিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষ চেতনার সাড়া দিল, সেই দিনই তাহার অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ জীবন যাত্রা প্রণালী অবগত হওয়া সম্ভব হইল। ক্রমে ক্রমে এই সাড়াকে লেখায় পরিণত করিবার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, সেই লেখা পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এই নূতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের জীবন একই প্রকার। মানুষের যেমন হৃৎস্পন্দন আছে, বৃক্ষলতাদিরও ঠিক সেইরূপ হৃৎস্পন্দন আছে। প্রাণী যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদও সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উত্তেজক ঔষধ বা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই

একই প্রকার। ইহা হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজ্জীবন সম্পর্কিত এই নূতন গবেষণার ফলে ঔষধ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকার্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্ধনের ধারা অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এই ধারার রহস্যও অনাবৃত হইয়াছে।

সাধনা

এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। এক দিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বর্ষ একাগ্রতার সহিত সাধনা করিয়াই ইহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আট বৎসর পূর্বে যখন আমি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কার্যে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল ও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোন কার্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম—এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য সেই তথাকথিত কলঙ্ক কালিমা মুছাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অন্তর্দৃষ্টি

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণের দক্ষতা ও অনুসন্ধান করিবার কৌশল জানা আবশ্যক। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্যশালী করে ও সত্যের অনুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞানমন্দির।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রাণ যন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তর্দৃষ্টি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য; কারণ অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে বিপথগামী করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয় না, তখনও

আমাদিগকে অদর্শনীয়ের অনুসরণ করিতে হয়। কারণ যাহা আমাদের দৃষ্টি-পথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্য। সেই অদৃশ্যরাজ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফের (Crescograph) আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জিনিসই তাহার আসল মাপ হইতে দশ কোটি গুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে দৃষ্টির বহির্ভূত জীবনের মূল গতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণরূপ মনের অধীন করিতে হইবে। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিসীম এবং মনের বল দ্বারা যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞানমন্দিরে ২০০টি বিষয়, এই কারণে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে।

বৃক্ষে রস সঞ্চালন

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুই শত বর্ষের অধিক কাল অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু কোন সুমীমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপরে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহু দিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস সঞ্চালন কি জড় শক্তির প্রভাবে হয় না জীবনশক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য স্ট্রাস্‌বুর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবনশক্তি দ্বারা ঐরূপ রস সঞ্চালন হইতে পারে না। জড় বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোন নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দেশক। রসের দ্রুত-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া ঊর্ধ্বে

উত্থান এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা ঢলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষীভূত হয় না। আমি অপ্টিক্যাল লিভার (Optical lever) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডের একদিক একটি সূত্র দ্বারা পাতার সহিত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সহিত একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপ পাতার অতি সামান্য উত্থান পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই পাচ হাজার গুণ পরিবর্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে স্ট্রাসবুর্গারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।*

নাড়ীর স্পন্দন প্রতিফলিত আলোকরশ্মির সাহায্যে বড় করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কব্জির নিকটস্থ নাড়িটি বাহিরেই অবস্থিত, সুতরাং নাড়ীর স্পন্দন সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে হৃদযন্ত্র সতেজ হয় ও তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রেকর্ডারে (Recorder) উর্ধ্বরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের সময় অধোরেখা দীর্ঘতর হয় এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই নাড়ী মাংস পেশীতে নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ নির্ণয় করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রস চাপ কি বর্ধিত কিম্বা অবসন্ন হয়? এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের দরুন যে সঙ্কোচ প্রসারণ হয় অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পেশীর মধ্যে বৃক্ষ হৃদয় নিমজ্জিত। সুতরাং এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে?

উদ্ভিদের হৃদয় সন্ধান

তবে বৃক্ষের হৃদয় কোথায়? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ শলাকা দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। নিস্পন্দিত পেশীর সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিঃস্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদযন্ত্রের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্পন্দনের অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। বৃক্ষের হৃদয়ের অধিষ্ঠান স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত

* এই স্থানে আচার্য বসু একটি বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়া সর্বসাধারণ সমক্ষে দেখাইলেন যে, বৃক্ষের চেতনা এবং রসসঞ্চালনের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।

আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে ধাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে মুহূর্তে ঐ শলাকা স্পন্দমান স্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ঐ সাড়া গ্যালভ্যানোগ্রাফ (Galvanograph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণকালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিয়া লয় এবং সঙ্কোচের সময় উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হৃদয়যন্ত্র নিম্নশ্রেণীর জীবের হৃদয়যন্ত্রেরই অনুরূপ।

হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করার যন্ত্র

ইহার পর অন্য সমস্যা মনে উদিত হইল। বিদ্যুৎ শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের হৃদয়-স্পন্দন কি কোনদিন আমাদের অনুভূতি গ্রাহ্য হইবে? যখন স্পন্দিত রসপ্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষণিকের জন্য প্রসারিত করে; ঢেউটি চলিয়া গেলে বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব আকার ধারণ করে। এই অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য স্পন্দন মনুষ্য-প্রত্যক্ষ গোচর করিবার জন্য কল্পনারও অতীত অনুভব যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই অনুভব যন্ত্রে দুইটি দণ্ড আছে—একটি স্থির, আর একটি চালনশীল। বৃক্ষটি এই দণ্ড দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত করিলে, প্রসারণ তরঙ্গ, চালনযোগ্য দণ্ডখানিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তবে ইহা চোখে দেখা যায় না। এই সংকোচন প্রসারণ এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম। সুতরাং আমার ম্যাগনেটিক অ্যামপ্লিফায়ার (Magnetic Amplifier) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এক কোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের চুম্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় পতিত হয়। বৃক্ষটির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজক বা ক্লান্তিজনক ঔষধ প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের গতি বৃদ্ধি অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনী শক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কম্পিত আলোক-রেখা দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে এইরূপ সর্বপ্রথমে প্রচারিত করিল।

অভাব ও দৈন্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। ইহা

করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে। যেমন আর্থিক দুরবস্থা ইউরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে—ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকানিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়—দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত, এই সুযোগে বাহির হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুঠিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, যে অকূল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না? ধরিত্রী মাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননী ও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। **দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।** তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

বীরধর্ম

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব—নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল এবং যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেইই তাহার জয়লব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দান দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। **ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ ইহাই আমাদের চিরসাধনা হউক।**

উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র*

আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩

পৃঃ ৪৬৪-৪৬৯

পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্বে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদ্ভিদ-জীবনের অনুসন্ধানের ফলে প্রাণী জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুই এর জীবন-ক্রিয়ার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন প্রাণীকে আঘাত করিলে সে শিহরণ দ্বারা আঘাতের অনুভূতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গে ক্রমাগত আঘাত করিলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। প্রাণীর চেতনেন্দ্রিয় আছে, বাহিরের আঘাতের ফলে উত্তেজনার স্পন্দন ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আন্দোলিত করে। উদ্ভিদের এইরূপ কোন সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল। প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে। রক্ত সঞ্চালন করিবার জন্য জীবদেহের মধ্যে এই যন্ত্র অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে। উদ্ভিদের এইরূপ কোন যন্ত্র আছে এরূপ কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। সুতরাং সকলে মনে করিতেছে যে, যদিও এই দুইটি জীবন-প্রবাহ পাশাপাশি বহিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে কুত্রাপি কোন ঐক্য নাই। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—এই সব ভ্রান্ত মতই এতদিন জ্ঞানের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছিল।

উদ্ভিদ-জীবনীতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রতিপদেই প্রবল বিঘ্ন, কারণ উদ্ভিদের জটিল জীবনী-ক্রিয়ার পরিচয় জানিতে হইলে ইহার প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক। যখন অণুবীক্ষণের দৃষ্টি ব্যর্থ হয় তখন আমাদিগকে অদৃশ্যের পথ অনুসরণ করিতে হয় এবং সেইজন্য এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করা আবশ্যক যাহার সাহায্যে আলোক-ঊর্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর করা ও তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নয়। আমার বিজ্ঞান মন্দিরে স্বয়ংলেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই

* এই প্রবন্ধ ইংরেজী মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সাম্বাৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। আচার্য বসু মহাশয়ের বিশেষ নির্দেশক্রমে লিখিত। ৩০শে নবেম্বর, ১৯২৬।

দুরূহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই যন্ত্র সাহায্যে ক্ষুদ্রতম জীবন স্পন্দন এক কোটি হইতে পাচ কোটি গুণ বর্দ্ধিতরূপে দৃষ্ট হয়। সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেই একটা নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের সহায়তায় ভবিষ্যতে বহুবিধ অত্যাশ্চর্য সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমার আবিষ্কৃত এই যন্ত্র সমূহ প্রাণী জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যাবতীয় প্রাণ-যন্ত্রের ক্রিয়া একই নিয়মে চালিত হইতেছে।

ইউরোপে বিজ্ঞান-অভিযান

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্র সমূহের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা প্রসূত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ জীবনীরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে আমি ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞানানুশীলন কেন্দ্র সমূহ হইতে বক্তৃতা দেওয়ার ও আমার অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন করাইবার জন্য আমন্ত্রিত হই। বিদেশে এই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া অতীব দুরূহ হইয়াছিল। অন্যের হস্তে এই সমস্ত যন্ত্র দেওয়া যায় না, কারণ সামান্য অসাবধানতার দরুন যন্ত্রগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই অনেক স্থলে আমাকেই উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটি অব আর্টসের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করি। তৎপরে রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে নানাবিধ ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদাঘ বাসরে "বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতের দানের গুরুত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করি। আমার বক্তৃতার বিষয়গুলি যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখাইবার ফলে সর্বত্রই বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করি তাহার সম্পূর্ণ অংশ তৎক্ষণাৎ বেতার সাহায্যে জগতের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকালেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত কাগজে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার গবেষণা প্রসূত তথ্যসমূহ শুধু জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নহে সাধারণেরও চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণও পাইয়াছি।

শীঘ্রই আমার উদ্ভিদতত্ত্বের আবিষ্কার সমূহ সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ ভাষায় লিখিত হইয়া আমেরিকা ও ইউরোপে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসর বেলজিয়ামের সম্রাট ভারত ভ্রমণ কালে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাকার্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি সেই সময়েই আমাকে বেলজিয়ামে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারই উদ্যোগে বেলজিয়ামের ফন্‌দেশিও ইউনিভারসেতায়ারে (Foundation Universataire) আমার প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বক্তৃতা সভায় সপারিষদ সম্রাট ও বেলজিয়মের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে আমার পরীক্ষাকার্য সাফল্যমণ্ডিত হয় এই জন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব হইতেই নানা প্রকার পরীক্ষাপোযোগী উদ্ভিদ জন্মান হইয়াছিল।

প্যারিসের সোর্বোন (Sorboune) এবং ন্যাচারেল হিস্ট্রী মিউজিয়মে আমার বক্তৃতা হয়। এখানেও বিজ্ঞ চিকিৎসকবর্গ ও বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদগণ আমার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিন ভাষাভাষী দেশসমূহে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহার ফলে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশক গথিয়ার ভিলার্স (Gauthier Vallars) আমার রচিত পুস্তকগুলির ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর আমি জেনিভার বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে যোগদান করি। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে আমার একটি বিশেষ ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা সভায় অধ্যাপক লরেঞ্জ (Lorenz), আইনস্টাইন প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। এই সময়েই জগৎ-বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ভারত সচিবকে লিখিয়াছেন যে, আমার ত্রিশ বর্ষব্যাপী সাধনার ফল তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণা সমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছে যে, নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠতর হউক।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বিদ্যামন্দিরের পক্ষ হইতে মসিঁয়ে

লুশার (M. Luchair) বলেন যে, সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরনের তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, মনীষীদের চিন্তা প্রণালীর ভিতর ঐক্য রহিয়াছে এবং মানুষের প্রতিভাপ্রগতি কোনরূপ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে ও কোন প্রকার বাধা নিষেধ মানব মনের অগ্রসরশীল গতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যে ভারতবর্ষকে তাঁহারা এতদিন কেবল কল্পনাপ্রবণ বলিয়া মনে করিতেন এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, সেই সকল কল্পনাই বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার করাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস যে, আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের মনীষীবর্গের যে ভাবের আদান প্রদানের আয়োজন হইতেছে তাহার ফলে মানব সভ্যতার শৈশব লীলা-নিকেতন এশিয়ার বহুদিনের পুঞ্জীভূত চিন্তারাশি বিশ্বজগতের নিকট উন্মুক্ত হইবে।

সুবিজ্ঞ সমালোচকবর্গের নিকট হইতে এই প্রকার উচ্চ প্রশংসা আশ্চর্য বলিতে হইবে কারণ পাশ্চাত্য দেশে এতদিনের প্রচলিত মত এই যে, "ভারতবর্ষ শুধু ঐন্দ্রজালিক ও তান্ত্রিকদের সাধনাক্ষেত্র।" এইরূপ অসম্ভব ও ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে। এবং এক্ষণে ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতা সর্ববাদীসম্মত হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর বিপুল প্রয়াস, জীবন বিজ্ঞানের রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত ভারতীয় কারিগরের সুপরিকল্পিত ও সুনির্মিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কিত যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহ জগৎ সভায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে নির্দিষ্ট করিয়াছে।

জীবন-মৃত্যু রেখা

মৃত্যুর লক্ষণ কি এবং জীবন-মৃত্যু দ্বন্দ্বের সন্ধিস্থল সঠিক ধরা যায় কিনা আমি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমি এমন কয়েকটি সঠিক উপায় নির্ণয় করিয়াছি যাহা দ্বারা মরণোন্মুখ উদ্ভিদ তাহার মৃত্যুরেখা নিজেই অঙ্কিত করিতে পারে। চারা গাছকে প্রথমে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া রাখা হইল। জলের উষ্ণতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা হইল। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উঠিল। গাছটি আর উত্তাপ সহ্য করিতে পারিল না, কারণ ৬০ ডিগ্রী উষ্ণতা গাছটির পক্ষে মারাত্মক। ফলে সাধারণ প্রাণীর মৃত্যুকালীন

বিক্ষেপের মতন গাছটিরও ভীষণ বিক্ষেপ আরম্ভ হইল। জীবন-মৃত্যু, সংগ্রামের এই সন্ধিক্ষণে গাছ হইতে একটি প্রবল বিদ্যুৎ তরঙ্গ বাহির হইয়া আসিল।

অনুসন্ধানরত হইয়া আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি তাহা অতীব বিস্ময়কর। একটি চারাগাছকে উষ্ণজলে ডুবাইয়া রাখিলাম তাহার প্লাবনশীলতা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিল ও জল ক্রমে ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত হইলে তাহার জীবনী লক্ষণ একেবারে লোপ পাইল এবং চারাগাছটি জলে ডুবিয়া গেল।

বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী আছে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। আমার গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃক্ষের বেশ স্নায়ুমণ্ডলী আছে এবং বৃক্ষে চেতনার স্পন্দন যে ভাবে সঞ্চালক-স্পন্দনে পরিণত হয় তাহা হইতেই বেশ ধরা যায় যে বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী অতীব জটিল। পরিমাণ ওজন করিবার কোন যন্ত্র না থাকায় অতীতে বহু ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

জলের নল বা স্নায়ু

সকলেই অবগত আছেন যে বাহিরের বিষ বা উত্তেজক দ্রব্য নলের মধ্য দিয়া প্রবহমান জলের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। নলটির উপর ক্লোরফর্ম প্রদান করিলেও উহার সংজ্ঞা লোপ হইবে না বা জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে না এবং ইহার চতুর্দিকে বিষাক্ত ঔষধের প্রলেপ দিলেও উহার কার্যকরী শক্তি লোপ পাইবে না। কিন্তু প্রাণীদেহে এই সমস্ত ঔষধপ্রয়োগে স্থায়িভাবে বা সাময়িক ভাবে প্রাণক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আমার গবেষণা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, প্রাণীদেহের স্নায়ুমণ্ডলী যে উপায়ে উত্তেজনা বহন করে উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীও ঠিক সেইভাবে কার্য করে।

বদ্ধ পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-পত্র

কোন পতঙ্গকে আলোকের সম্মুখে বাঁধিয়া রাখিলে সে যেমন একবার উপরে উঠিতে চেষ্টা করে আবার নীচের দিকে উড়িয়া আসে এবং বারংবার দক্ষিণে ও বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আলোকের দিকেই আসে উদ্ভিদ পত্রও আলোকের সম্মুখে ঠিক ঐরূপ করে।

রক্তসঞ্চালন ও উদ্ভিদ রস সঞ্চালন

উদ্ভিদদেহে কি উপায়ে রস সঞ্চালন হয় এই সমস্যা বহুকাল যাবৎ অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। এই রস সঞ্চালন জড় না চৈতন্যের ক্রিয়া? ট্রাসবার্গার একটি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে বিষক্রিয়ার ফলে বৃক্ষের রস সঞ্চালনে কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ইহার ফলে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিষয়টি ঠিক ভাবে বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। জীবনীশক্তিবর্দ্ধক কয়েকটি পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঐ সকল পদার্থ প্রয়োগে বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিতে পারা যায় এবং কতকগুলি বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে সজীব বৃক্ষের প্রাণহানি ঘটে। ইহা হইতে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, একটি স্পন্দনশীল তন্ত্রী সাহায্যে বৃক্ষের রস-সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। **এই তন্ত্রটিই বৃক্ষদেহে যুগপৎ হৃদযন্ত্র ও নাড়ীর ক্রিয়া সম্পাদন করে।**

মহীলতা (কেঁচো) প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে। উহার সাহায্যেই উহাদের দেহে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চ-স্তরের প্রাণীদেরও একটি বিলম্বিত হৃদ্‌যন্ত্র আছে। আমি পরীক্ষা করিয়া ধরিতে পারিয়াছি যে উদ্ভিদ দেহে রস সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে জড় ক্রিয়া নহে ইহা চৈতন্য ক্রিয়া এবং প্রাণিদেহে রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির সহিত উদ্ভিদ দেহের রসসঞ্চালন ক্রিয়ার কোন পার্থক্য নাই। প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা:—

(১) হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।

(২) বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদ্‌যন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

(ক) কর্পূর প্রয়োগে হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

(খ) পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদক্রিয়ার হ্রাস হয়।

(গ) ষ্ট্রিকনিন অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয় এবং বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌ক্রিয়া অতি মাত্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে হৃদক্রিয়া একেবারে লোপ পায় এবং রক্ত ও রস সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক শলাকা দ্বারা উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্রের অধিষ্ঠান স্থল নির্ণীত হইয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ প্রয়োগে রসসঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় সেই সমস্ত পদার্থ প্রয়োগে বৈদ্যুতিক স্পন্দনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

যে সকল পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর হৃদযন্ত্রের ঐক্য প্রমাণিত হয় এক্ষণে সেই সমস্ত পরীক্ষার কথা বর্ণনা করিব।

ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফাইটোগ্রাফ

ইতিপূর্বে উদ্ভিদ্‌রস কিভাবে সঞ্চালিত হয় তাহা ঠিক করিবার এবং ঐ রসধারার অধিরোহণ বেগ মাপিবার কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হইল যে, একটি বিলম্বিত বৃক্ষপত্রকে প্রসারিত হস্তের মতন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে কারণ, এই পত্রের উত্থান-পতন দৃষ্টে বৃক্ষে রস-সঞ্চালন হইতেছে বলিয়া বোঝা যায়। জলাভাবে যখন বৃক্ষের রস-সংগ্রহ শক্তি কমিয়া যায় তখন পত্রটি ঝুঁকিয়া পড়ে আবার রসসংগ্রহ শক্তি বৃদ্ধি পাইলে উহা সোজা হইয়া উঠে। এই উত্থান পতন এত ধীরে ধীরে হয় যে হঠাৎ দেখা যায় না। আমার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক লেখনী দ্বারা এই উত্থান পতন খুব বড় করিয়া দেখা যায়। ঐ লেখনী অদূরে বিলম্বিত পর্দার উপর আলোক বিন্দুপাত করিয়া পত্রের আন্দোলন জ্ঞাপন করে। পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে উদ্ভিদের হস্তখানি (বিলম্বিত পত্রটি) যে ঝুঁকিয়া পড়ে, পর্দার উপর তাহার আলোক রেখাপাত হয়, আবার উত্তেজক (কফি) প্রয়োগে যে অবসাদগ্রস্ত বৃক্ষে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখাপাত হয়। এই ভাবেই মৌন প্রাণ সুস্পষ্ট সঙ্কেতে স্বীয় অস্তিত্বের ও জীবনযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কার্ডিওগ্রাম ও স্ফিগমোগ্রাম্

প্রাণীর হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং ঔষধ প্রয়োগে ঐ ক্রিয়ার পরিবর্তন কার্ডিওগ্রাম যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিছুদিন পরীক্ষা করিবার পর আমি দেখিতে পাই যে, এই যন্ত্র লিখিত ফলের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ভুল থাকিয়া যায়। কারণ লেখনী ও লিপিধারকের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ হওয়ার ফলে লিখনকার্যে বিঘ্ন ঘটে। তাহা ছাড়া উহাতে হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণের স্থিতিকাল ঠিক ঠিক মাপা যায় না। এই জন্য আমি রেজোনেন্ট রেকর্ডার (Resonant Recorder) নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। উক্ত যন্ত্র সাহায্যে এক সেকেণ্ডের এক শতভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে হৃদযন্ত্রের কতবার সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় তাহা ধরা যায়।

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্ (Sphygmograph) নামক যন্ত্র সাহায্যে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারাও পরোক্ষভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইলে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায় আবার ক্রিয়া হ্রাস হইলে রক্তচাপও হ্রাস হয়। মণিবন্ধের নিকটস্থ শিরাটির স্পন্দন সহজেই ধরা যায় কিন্তু যেখানে শিরাটি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেখানে ইহার স্পন্দন উপলব্ধি করা অসম্ভব।

অপ্টিক্যাল স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্

বৃক্ষের নাড়ী পরীক্ষা কার্য্য স্বভাবতঃই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার জন্যই যদি বৃক্ষে রসসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে সর্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারাও ঐ যন্ত্রের সঙ্কোচন প্রসারণের পরিমাণ মাপা সম্ভব নহে। পরন্তু বৃক্ষের প্রাণময় কোষসমূহ উহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই অদৃশ্য অব্যক্তকে কি উপায়ে ব্যক্ত করা যায়?

আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। উদ্ভিদ রস যখন কাণ্ড আশ্রয় করিয়া উপরে উঠিতে থাকে সেই সময় বৃক্ষের কিরূপ হৃদস্পন্দন হয় আমি সর্বপ্রথমে তাহাই ধরিতে চেষ্টিত হইলাম। স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের কাণ্ড খুব সামান্য ভবে স্ফীত হয়। স্পন্দন তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার পরেই আবার কাণ্ড পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবর্ধক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষের রসসঞ্চালন বেগ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ কাণ্ড স্ফীত হইবে এবং বিপরীত ঔষধ প্রয়োগে বিপরীত ফল দৃষ্ট হইবে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-প্রসারণ পরিমাপের নিমিত্ত আমাকে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। প্ল্যাণ্ট্ ফীলার (Plant Feeler) বা অপটিক্যাল্ স্ফিগ্‌মোগ্রাফ (Optical Sphygmograph) নামক যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি তাহার সহিত সচল ও অচল দুইটি শলাকা যুক্ত রহিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ডটি এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয়। সচল শলাকাটির অগ্রভাগ ঈষৎ নাড়িলে যাহাতে সেই স্পন্দন পাঁচ কোটি গুণ বড় করিয়া দেখা যায় ও তাহার রেখাপাত হয় আমি এইরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি। মৃত বৃক্ষকে এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে আলোক-রেখা নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে—কারণ মৃত বৃক্ষের হৃদস্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দন আলোক রেখার কম্পন দেখিয়া বোঝা যায়। জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দনের হার প্রতি সেকেণ্ডে একবার। অবসাদ-প্রদায়ক

ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষের রসচাপের হ্রাস পায়; ফলে আলোক রেখা বাম দিকে (মৃত্যুর দিকে) আবর্তিত হয়; আবার উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে আলোক রেখা দক্ষিণ দিকে (জীবনের দিকে) আবর্তিত হয়। এই সঙ্করমান আলোক-রশ্মিই সর্বপ্রথম উদ্ভিদ জীবনের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস ও অবসাদ ব্যক্ত করিল।

উপক্ষার (Alkaloids) ও নাড়ী-স্পন্দন

প্রাণী ও উদ্ভিদের নাড়ী স্পন্দনে ওষধি ও উপক্ষারের প্রভাব একই প্রকার। যে সমস্ত ঔষধ প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে ঠিক সেই সমস্ত ঔষধই উদ্ভিদের রসসঞ্চালন শক্তি বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে অবসাদজনক ঔষধ প্রয়োগে উভয়ের দেহেই অবসাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সর্প বিষের ফল

প্রাণীদেহে অতি সামান্য মাত্রায় গোখুরা সর্পের বিষ প্রয়োগ করিলে মারাত্মক লক্ষণ দেখা যায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উদ্ভিদ দেহেও সর্প বিষের ক্রিয়া ঐরূপ। ভারতবর্ষে প্রায় সহস্র বর্ষ যাবৎ প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্প বিষ হইতে প্রস্তুত সূচিকাভরণ ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, অতি সামান্য পরিমাণ সর্প বিষ উদ্ভিদের হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম

প্রাণযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, অদৃশ্য জগৎকে দৃশ্যমান করা, মৌন জগতের ব্যাকুলতা শ্রবণ করিতে সমর্থ হওয়া—এই সমস্ত অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করা কি অত্যাশ্চর্যজনক নহে?

মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম অতিশয় করুণ—বৃক্ষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামও সেইরূপ করুণ। আমার যন্ত্র সাহায্যে উদ্ভিদ জগতের এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। বিষ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষ কিরূপ দ্রুতগতিতে মৃত্যু-রেখার দিকে ধাবিত হয় আবার উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিলে মরণোন্মুখ উদ্ভিদের প্রাণ কিরূপে আবার আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহা চক্ষুর সমক্ষে প্রতিফলিত হয়।

অবিচলিত চিত্তে জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ এরূপ, শক্তি অর্জন করিতে পারে যাহা দ্বারা সে প্রাণযন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহাকে অবসাদগ্রস্ত বা উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়।

কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য রচিত

আচার্য জগদীশচন্দ্র একবার 'কুন্তলীন' পুরস্কারের জন্য একটি রস সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

হাওয়া অফিস, সিমলা
২৭শে সেপ্টেম্বর।

"বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হবার সম্ভাবনা।"

২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতার লোক ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় পড়ল।

পরদিন আবার সংবাদ বেরুল—হাওয়া অফিস, আলিপুর থেকে।

"দুদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হবে। ডায়মণ্ড হারবারে ঝড়ের নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ত্রিশ তারিখে কলকাতার লোক আলিপুর হাওয়া অফিসের দেওয়া খবর পড়ল।

"আধ ঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দু ইঞ্চি নেমে গেছে। আগামী কাল দশটার মধ্যে কলকাতায় এমন প্রচণ্ড ঝড় হবে যা বহু বছরের মধ্যে হয়নি।"

কলকাতার লোক সে রাতে ঘুমুতে পারল না। সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। আগামী কাল কি যে হবে কে জানে!

১লা অক্টোবর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল। দু চার ফোটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। বেলা চারটার দিকে কেটে গেল মেঘ, পরিষ্কার হল আকাশ। ঝড়ের কোন চিহ্নই রইল না।

পরদিন হাওয়া অফিস আবার জানিয়ে দিল, গত কাল যে ঝড় হবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে ধাক্কা খেয়ে তা অন্যদিকে চলে গেছে।

চারদিকে লোক ছুটল, ঝড় কোথায় খুঁজতে। কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

শহরের সেরা ইংরাজী কাগজ লিখল, এতদিনে বুঝা গেল, বিজ্ঞান একদম মিথ্যে। অন্য কাগজ লিখল, তাহলে গরীব করদাতাদের পীড়ন করে হাওয়া অফিসের মত অকেজো অফিস রেখে লাভ কি। অন্যান্য কাগজও চীৎকার করে বলে উঠল, উঠিয়ে দাও অমন অফিস।

সরকার পড়লেন বিপদে। এই সে দিন এত সব জিনিস আনা হয়েছে। আজ সে সবই ভাঙ্গা কাঁচের ওজনেও কেউ কিনবে না। আর কিইবা করা যায় এখানকার বড় সাহেবকে নিয়ে। এখন কলকাতা মেডিকেল কলেজে সাহেবকে লিখে দিলেন, ভেষজ বিদ্যার একজন নূতন অধ্যাপক দরকার। তিনি হাওয়ার চাপের সাথে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে বক্তৃতা করবেন। কলেজের বড় সাহেব লিখলেন, হাওয়ার চাপে মানুষের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে পারে। কলকাতার লোক, তবে কিনা, আরো অনেক চাপে খাবি খাচ্ছেন। কাজেই দু এক ইঞ্চি হাওয়ার চাপ কমলে মানুষের পক্ষে বোঝার ওপর শাকের আঁটি স্বরূপ হবে। অধ্যাপক নিয়ে উপকার হবে বলে বোধ হয় না। তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ কম। সেখানে এই অধ্যাপককে নিলে উপকার হতে পারে।

সরকার চুপ করে গেলেন। হাওয়া অফিসও বেঁচে গেল। আসল কথা, সেদিন তুফান কোথায় পালিয়ে গেল তার কোন খোঁজও হল না। কিন্তু একজন মাত্র জানে সে কথা, সে আমি।

গেল বছর আমার ভীষণ জ্বর হয়। মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম। ডাক্তার বললেন, সমুদ্র যাত্রা করতে হবে, নৈলে যদি জ্বর আবার জড়িয়ে ধরে বাঁচবে না।

আমিও লঙ্কায় যাবার জন্য তৈরি হলাম। জ্বরে জ্বরে আমার মাথার ঘন কালো চুলগুলি প্রায় উঠে গিয়েছিল। আট বছরের মেয়ে আমার চকচকে মসৃণ টাকের ওপর দু এক গোছা চুল দেখে বলত. দ্বীপ। তার আশঙ্কা, যত্ন না নিলে আমার মাথায় আর কোন দ্বীপই থাকবে না। সমুদ্র যাত্রায় নোনা জল লাগবার ভয় আছে আর নোনা জল চুলের ক্ষতি করে। তাই মেয়ে আমার ব্যাগে এক শিশি কুন্তল কেশরী দিয়ে বলল, রোজ ব্যবহার করো। এই কুন্তল কেশরীও আবার যেমন তেমন তৈল নয়। কেশর ঝরে যাওয়া এক সার্কাসে-সিংহের কেশর গজিয়েছিল। সার্কাসের সাহেবের একান্ত অনুরোধে আর সেবায় তুষ্ট হয়ে জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্নে পাওয়া এই তৈল সাহেবকে দেন। তৈল ব্যবহারের হপ্তার মধ্যেই সিংহের আবার কেশর গজায়।

সেই তৈল ব্যাগে নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর চুসান জাহাজে সমুদ্র যাত্রা করলাম। দুদিন ভালই গেল। ১লা তারিখ ভোর থেকেই সমুদ্রের মূর্তি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। বন্ধ হয়ে গেল হাওয়া। সমুদ্রের জল

সীসার মত বিবর্ণ হয়ে গেল। মুখ কালো হয়ে গেল কাপ্তেনের। ভীত হয়ে পড়লাম আমরা। তিনি বললেন, শীগগিরই প্রচণ্ড ঝড় আসবে দেখছি, জাহাজ যে কূল থেকে অনেক দূরে! ভগবান ভরসা! শুনে বুঝি সবারই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। আর্তনাদে ভরে গেল জাহাজ।

দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক অন্ধকারে কালোয় কালোয় একাকার হল। দূর হতে এক একটা ঝাপটা আসছে আর কেঁপে উঠছে জাহাজ।

তারপর যা ঘটল সে আর বলা যায় না। কোথা থেকে যেন রুদ্ধ দৈত্য সব ছাড়া পেয়ে পৃথিবী সংহারে উদ্যত হল। সমুদ্রের গর্জন বায়ুর গর্জনের সাথে হুঙ্কার মিলিয়ে সংহার মূর্তি ধরেছে। তারপর অনন্ত উর্মিরাশি একের উপর অন্যে এসে একসাথে আক্রমণ করল জাহাজ। এক মহাউর্মি জাহাজের উপর এসে পড়ল। মাস্তুল লাইফবোট ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

অন্তিমকাল উপস্থিত। এমনি সময়ে কত পুরোনো কথাই না মনে পড়ে। আমারও মনে পড়ল টাক নিয়ে মেয়ের পরিহাস আর সেই কুন্তলকেশরী তৈলের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তৈল চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে।

অমনি ব্যাগ থেকে তৈলের শিশি বের করে অতি কষ্টে ডেকে উঠে এলাম। জাহাজ টলমল করছে। ওপরে উঠে দেখি সাক্ষাৎ যমের মত পর্বত-প্রমাণ ফেনিল এক মহাউর্মি জাহাজকে গিলে খাবার জন্যে ছুটে আসছে। আমিও জীবনের আশা ত্যাগ করে সেই কুন্তল কেশরীর ছিপি খুলে ছুড়ে মারলাম সমুদ্রে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তৈল সমুদ্রের বুকে।

কার যেন যাদু দণ্ডের ছোঁয়ায় হাওয়াও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটু পরেই দেখা দিল সূর্য!

এইজন্যেই সেদিন কলকাতার দিকে ঝড় ছুটে আসেনি। কত হাজার হাজার মানুষ যে বাঁচল, কে তার হিসাব করবে!

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

[আচার্য জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে যে সব চিঠি দিয়াছেন তারই কয়েকখানি চিঠি এখানে দেওয়া হল।]

আমি আর একটি নূতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে Practical Wireless Telegraphyর অনেক প্রকার সুবিধা হইবে মনে হয়। Dr Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কারগুলি গোপনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিক্ক আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না, আমি কি এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য নূতন তত্ত্ব একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সে সব আমি এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; সেগুলি দিন দিন পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন সেই সত্য লাভের জন্য ধ্যান করিতে হইবে। সেই একাগ্রতার ভাব যদি কোনরূপে disturbed হয়, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আর এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, আরও অনেক আছে। কিন্তু সে সব করা অনেক সময় ও অর্থসাপেক্ষ। যেরূপ করিয়া, যেরূপ সম্পূর্ণরূপে কার্য করিতে হয় তাহা করিতে আমি সুবিধা পাই নাই। আমার কার্যগুলি এরূপ অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে আমার বড় কষ্ট হয়। Dr. Waller, যিনি ভেকের চক্ষু লইয়া investigate করিতেছেন তাঁহার নিজের Laboratory দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সব দেখিয়া আমি ঈর্ষা জর্জরিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং, দুইজন assistant (ইহার মধ্যে একজন Doctor of Science) এবং তাঁর সহধর্মিণী, এই চারজন প্রত্যূষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যহ কার্য করিতেছেন। সেই Laboratoryর এক কোণে আহার্যদ্রব্য রহিয়াছে, যেন আহারের সময় কার্য বিরাম না হয়। আর সেই Laboratoryর বর্ণনা তোমাকে কি করিয়া দিব! সমস্ত সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা তাঁহাকে lecture দিতে হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে, এজন্য কাজ ছাড়িয়া দিবেন বলিতেছেন। Experiment এর ফল photography দ্বারা স্বতঃ recorded

হইতেছে। এইরূপ সম্পূর্ণতার সহিত কাজ চলিতেছে—আর আমার কাজ ভাবিয়া দেখ।

*   *   *   *

আমাকে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এদেশে আসিয়া আমার কার্য সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত সংস্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না, কারণ তাহা হইলে আমার কার্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধানকার্যে তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। তবে কত দিন প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকিতে পারিব, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তোমার
জগদীশ

*   *   *   *

লণ্ডন, ১৭ই মে, ১৯০১

বন্ধু,

বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব? আর Experiment গুলিও অতি কঠিন। কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তারপর একটি ঘটনা হইল, সে কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপুরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম; আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল; তোমাদের এত দিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য নির্মূল হইবে, এ কথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি।' তারপর মুহূর্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর

ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না। যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল।

হিন্দুর সূক্ষ্ম বুদ্ধি একবার patronising রূপে পূর্বে শুনিয়াছি, আমি আমার সেই জাতীয় গুণের জন্য আজ অহঙ্কার করিব। কারণ, সেই পূর্ব পুরুষদের গুণে বঞ্চিত হইলে আমি এত তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতাম না। আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্যে অভিভূত হইয়াছি, কে আমাকে যেন এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে! তবে হিন্দুর practical বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও Electrician এ দেখিবে। আমার বক্তৃতার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ক্রোড়পতি proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি।" অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে Patent form আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না, "There is money in it. Let me take out a patent for you, you do not know what money you are throwing away," ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit—I will finance it," ইত্যাদি।

এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistant এর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

আমার বক্তৃতা এখনও প্রকাশ হইবে না, কারণ Royal Society আমাকে তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। They made a special case, for they never accept anything read before any other society। সেদিন যত physiological expertরা থাকিবেন। Sir Michael Foster নিজে আমার paper communicate করিবেন। আমি experiment করিয়া দেখাইব।

তবে আমার সম্মুখে বহু বাধা আছে। প্রথম—Commercial interest। অনেক patent আমার কার্য দ্বারা ও আমার নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে অকর্মণ্য হইবে। দ্বিতীয়—যাঁহারা Coherer theory বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন। তৃতীয়—physiologistরা জীবন বলিয়া একটা নূতন অতি মহৎ একটা কিছু বুঝেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান mere physics, এ কথা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। চতুর্থ—কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু ত্রস্ত হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

Dr. Waller, যিনি জীবনের শেষ লক্ষণ বাহির করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় মর্মপীড়িত হইয়াছেন। সুতরাং আমাকে একাকী এত বিপক্ষের সঙ্গে যুঝিতে হইবে। কি হইবে জানি না।

তবে যাঁহাদের কোন Self interest নাই তাঁহারা অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন, তবে তাঁহারা বলেন, "You must remember that the greatest discovery of the last century—the mechanical equivalent of Heat by Joule—was rejected by the Royal Society as unscientific; but twenty years after the Royal Society published the same paper in their transactions. You have brought forward a great discovery having far-reaching consequences. Have you the courage and persistency to fight for it and force it to be universally accepted? You who see it so clearly alone can do it; there is none else who can take up your work. If you leave it in its present state, it will be lost.

কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য করিতে পারি তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটি দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেশে ফিরিলে কিরূপ কার্যের সুবিধা হইবে তাহার নমুনা স্বরূপ একখানা চিঠি পাঠাই।.........

আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি। Sir William Crookes বলিলেন যে, Royal Institution হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে, তখন যেন শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই। "I have scarcely heard anything so grand."

Sir Robert Austen, the greatest authority on metals আহ্লাদে অধীর হইয়া আমাকে বলিলেন, **"I have all my life studied the properties of metals. I am happy to think that they have life."**

তারপর বলিলেন, সে কথা আমাকে আবার শুনিতে দিন। তারপর বলিলেন, "Can you tell me whether there is a future life—what will become of me after my body dies?"

তোমার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(রবীন্দ্রনাথকে লিখিত)

C/o Messrs Henry S. king & Co.
65 cornhill E. C.
12. 2. 1902.

কয়েকজন বিখ্যাত Physiologistএর থিওরি বোধ হয় আর টেকে না, সুতরাং তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বাধা দিবেন। কিন্তু তাহাদের বালির বাঁধন টিকিবে না। তবে সময় চাই। আমার একখানা পুস্তক প্রায় শেষ হইয়াছে আমার পূর্ব কার্য সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক পত্রে বিশেষ প্রশংসা হইতেছে —সর্বপ্রধান আমেরিকান Engineering কাগজে—Leaderএ।

A field of inquiry of most extraordinary interest has been opened by Dr. J. Chander Bose ইত্যাদি তিন কলম।

অদৃশ্য মানসিক তরঙ্গের সংঘাত ও তজ্জনিত বিবিধ অদ্ভুত কাণ্ড—ও সেই সংগ্রামের autographic ইতিহাস! আমি আর কি বলিব, আমি এ জীবনে কিছু শেষ করিতে পারিব না।

বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরী, ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। .

আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।·· ···

ইউরোপের একজন প্রধান Physiologyতে অগ্রণী Burden Sanderson এর নাম শুনিয়াছ। Sanderson এবং Waller এই দুই জন Physiologyর উচ্চ সিংহাসন অনেক কাল যাবৎ নির্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাকে দেখাই যে নির্জীব জন্তরও responsiveness একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, "আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু that ordinary plants should give électric response is simply impossible. It cannot be, আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied Physiological terms in describing his physical effects on metals, though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use our physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর এই সব phenomena এক সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologists-এর প্রাণপণ চেষ্টায় conspiracy of silence হইল। কারণ আমার এই বিরোধী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকের theory একেবারে চূর্ণ

হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্তী, একবার আমি সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এ বিষয়ে একেবারে নিরাশাস হইয়াছিলাম কারণ "Whom are we to believe—Physiologists—or a young physicist who comes all of a sudden to upset all our convictions? সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতিমধ্যে Linnean Societyর President Prof. Vines এর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক vegetable physiologists এর মধ্যে সর্বপ্রধান। আর Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্বপ্রধান Society. Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal College of Science) কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, "I wish Huxley had been living now, he would have found the dream of his life fulfilled."

তারপর Vines as President of Linnean Society, আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত Physiologists—Botanist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষ কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি?

একেবারে নিরুত্তর। তারপর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন যে we have nothing but admiration for this wonderful piece of work. Presidentও অনেক সাধুবাদ করিলেন।

অবলা বসুর পত্র

1 Birch grove, Acton
London W.
27. 3. 1902

Botanist ও Biologistরা তাহার theory অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, কেবল Physicistরা এখনও অগ্রসর হন নাই, সে জন্য বোধ হয় France ও Germanyতে যাইতে হইবে। ইংরেজরা এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত Conservative। আমরা দূর হইতে ইউরোপকে সমুদয় সদগুণের আধার বলিয়া মনে করি। কিন্তু দুই তিন বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যা পাওয়া যায় আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific men যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ তাহা শুনিয়া অবাক হই।

আজকাল এখানকার বৈজ্ঞানিক যুবক সম্প্রদায় অধ্যাপক মহাশয়ের theory লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, সে দিন একজন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অনুপস্থিত কালে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত আমার নিকট তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, যেমন Darwin Biology কে revolutionize করিয়া দিয়াছেন তেমনই Prof. Bose's theory will revolutionize our whole idea of molecular Physics। লোকটি ত একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, if only Prof. Bose will allow, a dozen of us who thoroughly know our subject all willing to fight for him.

(জগদীশচন্দ্রের পত্র)

Hotel Observatorie
Paris,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯০২

বন্ধু, Paris আসিবার সময় ক্ষণভঙ্গুর কল—কেহ হাতে, কেহ পিঠে লইয়া নয় ঘণ্টা কাটাইয়াছি। সহযাত্রীদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি।

এখানে চার স্থানে বক্তৃতার জন্য আহুত হইয়াছি। গত রাত্রে এক বড় বৈজ্ঞানিক সভায় Dinner এ আমি Principal Guest ছিলাম। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহারা আমার এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য উৎসুক।

* * * *

লণ্ডন

আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার তিন জায়গায় বক্তৃতা ছিল, সকল স্থানেই বক্তৃতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলে অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন এবং আরও জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এত বড় বিষয়টা ২।৪ দিনে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিবার আশা করি না। তবে Germany হইতে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে।

* * * *

৮ই মে, ১৯০২

Royal Societyতে গত বৎসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম তাহা Waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার এই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর Paper ছাপা হইবার কথা যখন council এ উঠে তখন Waller এর বন্ধুরা তথায় আমার paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন—এই বলিয়া যে Waller গত নভেম্বরে এ কথা publish করিয়াছেন। Council-এর কথা Confidential সুতরাং এ সব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Societyর paper বাহিরে প্রচার হয় নাই সুতরাং প্রমাণাভাবও বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Institution এর Lectureএ এ কথা

ছিল এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর Secretaryর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে আমার কাগজ ছাপা হইবে।

President আমাকে লিখিয়াছেন, "There are many queer things you have yet to learn. I am glad that you now have had fair play.

*　　*　　*　　*

London, ৩০ শে মে, ১৯০২

আমার এখানকার সংবাদ ভালই। স্রোত বোধ হয় অনুকূলেই পরিবর্তন হইতেছে।

সে দিন Linnean Society র বাৎসরিক অধিবেশনে আমার কার্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে। Germanyর Bonn University তে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ আসিয়াছে।

আগামী সপ্তাহে Photographic Society তে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল অপরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য experiment এ সফলতা লাভ করিয়াছি।

*　　*　　*　　*

লণ্ডন
৬ই জুন, ১৯০২

বন্ধু,

আজ এক বৎসর পূর্বে রয়াল সোসাইটিতে Inorganic Response সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা যে প্রকাশিত হয় নাই তাহা জান। ঠিক এক বৎসর পর আজ জানিলাম আমার জিৎ হইয়াছে। রয়াল সোসাইটি আমার সেই আবিষ্কার সম্পূর্ণাকারে অবিলম্বে প্রচার করিবেন।

ভালকথা, আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার আবিক্রিয়া চুরি করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে পূর্বে লোকে মনে করিত যে কেবল sensitive plant ই সাড়া দেয়; But these notions

are to be extended and we are to recognise that any vegetable protoplasm gives electric response."

"I have used all kinds of vegetable protoplasm."

We are to recognise ; কাহার discoveryর দ্বারা ইহা হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই।

তারপর আমার পুস্তকে physiologistদের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরিয়া দিয়াছিলাম—আমার আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে তাহাদের গোড়ায় গলদ—যাহা তাহারা negative বলে তাহা positive। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক ভুল আর কি হইতে পারে ? তাহার উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী লিখিয়াছে (আমার নাম করিতে নাই—আমার নাম physicist) !

"But in the present state of our physiological literature, is it wise to attempt to use the proper expression ? No doubt the confusion is very great, no doubt the main bulk of our electro physiological literature is totally unintelligible to physicists. Shall we not, however, lay the foundation of a further mass of worse-confounded confusion by any sudden and unauthorised endeavour to call white white and black black when for the last 20 or 30 years our leaders have been content to call white black and black white ?"

আমরা এতদিন whiteকে black বলিয়াছি। Unauthorised physicist আসিয়া আমাদিগকে শিখাইতে চায় white is white ! কি ভয়ানক !

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে বিলাতে Web of Indian life পুস্তকের বহু প্রশংসা হইতেছে—ভারতবিদ্বেষী কাগজও লিখিতেছে যে Kipling ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র ত ঠিক নয়, ভেতরের যথার্থ চিত্র এইরূপই হইবে।

Prof. Jagadish Chandra Bose in America

Dr. Sudhindra Nath Bose M.A. Ph.D.
Professor, University of Iowa.

It was when the crimson sun of January was sinking rapidly beneath the horizon that I first met, at the Hotel Del Prado in Chicago, Prof, Jagadish Chandra Bose, the Indian Scientific wizard who makes plants record their own feelings. "Come," he said in a low tone in response to my second sharp rap at the door.

"Well, well, how were you able to find me out here ?" was his friendly greeting which was accompanied by a cordial smile.

While in America, Jagadish Chandra Bose has simply been swamped with letters and telegrams for lecture engagements from Maine to California. (He has had so many calls for lectures for various learned Scientific societies, Colleges, Universities) that if he could speak twice a day and every week in the day and everyday in the week, he could not hope to comply with all of these invitations in much less than a year. As it is, he will be in the United States only a few weeks.

(Prof. Bose has spoken before such learned bodies as the New York Academy of Sciences, the American Association for the advancement of science, the Brooklyn Institution of Arts and Sciences, the Philosophical Society of Philadelphia, the joint meetings of the Academy of Science, the Botanical Society and the Bureau of Plant Industry at Washington. Among the larger Universities, he has given addresses at Harvard, Columbia, Iowa, Illinois, Chicago, Michigan and Winconsin.)

One of the largest and most appreciative audiences that have greeted him was at Cosmos Club in Washington city. The meeting was to commence at 8 in the evening, but long before the scheduled time the big lecture hall was literally packed: there was no standing room any-

where. Prominent men and women were seen perched upon the window sills or even seated on the floor. Dr. Graham Bell, the inventor of the telephone came 20 minutes before time. But the crowd at the door was so large that he could not get within a half block of the hall. The enthusiasm of the indomitable inventor was not chilled for on the following day he called together a group of the noted savants of Washington at his home in honour of the distinguished Hindu Scientist.

Everywhere Dr. Bose has met with a hearty welcome from the people of the American Republic. Even the Hon'ble Secretary of State, William Jennings Bryan, invited him to give a demonstration of his work at the State Department in Washington—an honour of unusual significance. Wherever he appears with his "cunningly simple instruments", wherever he gives a demonstration, he is immediately recognised as one of the really great men of science, whose labours promise to open a new era in Anatomy, Botany and perhaps also in Psychology. Dr. Bose has been made the subject of many magazine articles, newspaper editorials, cartoons and poems. It was his recent visit to New York that inspired the following song to *Sensitive Plant* which appeared in New York times :—

"Be kind to the hypochondrical plant !
Its nervous and ladylike qualms,
Its delicate frailty you surely must grant,
For it faints at all songs except psalms.

Speak low near a maiden fern ! You will note
It trembles with fright if you shout,
It flourishes best when you have got a sore throat,
As is pleased by the very devout.

Be firm with a rubber plant ! Put it away
When your friends come to make a call.
It is dreadful to find how a secret will stray
When you thought no one knew it at all.

Be gay near begonias ! Their gorgeous array
Betokens a sensitive blush.
To secure best results, a story risque
Will bring the desirable flush.

Then be good to the plants ! For a great botanist
Says their sensitiveness is tense.
They are shocked if a girl should chanced to be kissed,
And will die at a moral offence."

As is well-known in India, Prof. Bose had been sent by the English Government to present to the countries of Europe the results of his scientific investigations ; it is purely a scientific mission that has brought him to the West. On the Continent, he lectured at Vienna and Paris and was on the point of going to Germany when the present world cataclysm burst forth.

(While in England he spoke, among other places in London, before the Royal Institute, at Oxford and Cambridge Universities, at the Imperial College of Science in London and before the Royal Society of Medicine.)

His discoveries evoked great enthusiasm in England and while in London, his private laboratory was the Mecca of such leaders of English thought as Sir Arthur Balfour, the former Prime Minister, Sir William Crookes, President of the Royal Institute, Prof. James, A. H. Murray, editor of the noted Oxford New English Dictionary, Sir James Reed, the King's Physician, Bernard Shaw, the famous dramatist and Lord Crewe.

The general topic of Prof. Bose's lecture is plant autographs and their revelations. His lecture is illustrated with lantern slides and experiments. (He tells in his discourse that the plants feel pain and exhilaration as do animals, that the stimulus to motion in plants is of the same nervous 'character as in animals.') All plants he avers, are sensitive and in some of them there are tissues which beat simultaneously like the heart beat of the animal.

These heart-throbbings are affected by drugs in the same manner as are the pulsations of the animal heart. The experiments which he shows include the measurement of the perception time of the plant, the speed of its nervous impulse and reactions to various anæsthetics and poisons. The records of these experiments prove the existence of throbbing, pulsating organs in plants.

Prof. Bose is not an orator. Nor does he care to be one. He is simply a clear, forceful and convincing speaker. He walks slowly to the edge of the platform, stands very still with the left hand behind him and looks at the audience for full half a minute. Everybody is perfectly quiet. One could hear a pin drop. Men and women lean forward to catch his first words. "Ladies and gentlemen," he says and then plunges at once into his subject. In spite of the rather formal "Ladies and Gentlemen" he is very informal. He does not "orate," he talks. He has discovered some wonderful things, and he is very much in earnest when he tells his audience about these discoveries in his gentle, quiet tone of voice. Robert Burns made poetry out of his works and days. Jagadish Chandra Bose finds a poem, a drama and an epic in his scientific researches. He is intoxicated with the fascination of his work. He speaks, therefore, out of the fullness of his heart. He has no time for the gaudy arts of the professional spell-binders. He talks to his hearers—just talks. At times they laugh a little, but for the most part they just listen, forgetting even to applaud. Mr. Bose may safely be pronounced a success on the platform. And his sucess is to be attributed largely to the earnestness and the magnetic presence of the man.

Prof. Bose is the despair of American reporters. From the journalistic point of view, he is a difficult "subject" to handle. One would sooner "cover" a dozen diplomats from Tokio, Petrograd or London than interview Mr. Bose. He does not like the lime-light. He has a dread of American

publicity. If he can sense that a newspaper man is after him for a "story" he is sure to keep quiet. When asked questions of which he does not approve, Prof. Bose withholds his answer laughingly. But he does it in such a pleasant way that no one can take offence. Of course, Dr. Bose cannot be blamed for he has reasons to be distrustful of some of the American journals. Not long ago, a newspaper in the city of Detroit copied a chapter from one of his books in such a way as to make it appear as though the story were a special article on Plant Response, "written by the author for the exclusive use of that paper."

There is something peculiarly attractive about his personal appearance His thick wavy hair which is tinged with gray, has a tendency to project itself on either side of his massive forehead in poetic fashion. There is a bit of pride about his burning black eyes, that look life squarely in the face and challenge it. His face is the face of a man sure of himself, the face of a high-bred, intelligent, confident, successful, yet not altogether satisfied man. It is a handsome face, full of expression. Prof. Bose has a strong physique and a slow and resolute stride. Even with some signs of middle age in his face and figure, he gives one the impression of a man of great physical energy. He has deep chest and broad shoulders. Yet he is not an athlete ; everything about him suggests the students.

In describing the English statesmen, Charles Fox and William Pitt, Napolean Bonaparte once remarked, 'in Fox, the heart warmed the genius ; in Pitt, the genius withered the heart." Prof. Bose seems to be more like Fox than Pitt.

Dr. Bose is pre-eminently a scientist. He is not however a scientist of that type that possesses a brilliant but a gelid intellect encased in an insulated covering. Profoundly intellectual as he is, Mr. Bose is more than a thinking machine. He has a throbbing, feeling heart : he is human. very much so. He sees deeply and like Lincoln.

knows that the essential brotherhood of man is a glowing reality, not a mere lofty abstraction. A born democrat, Bose seems to be just as much at home with the go-ahead "plain' people" of the United States as with those mossgrown European aristocrats who wear outlandish knee breeches, powdered wigs and lace ruffles. To be sure he is absorbed as not to have a smile for the lucky or a tear for the helpless.

His passion as a humanist is India—the people of our India. No matter where he is, a goodly share of his heart is always out there in the plains of Hindusthan. It is probably for this reason that he is so popular among the Indian students in America. Wherever he goes he is entertained by the local Hindusthan Associations. Wherever he visits he is sought out by the Indians for his friendly advice and suggestions. "Have one definite idea...one definite dream of your life", says Prof. Bose with proper emphasis. "Work till you realise your vision. Make your dream come true. Nothing is possible, if you have power to will. Nothing great is ever done without suffering ; and you may have to suffer a great deal. But then it is your privilege to suffer, to win, to achieve. Every man is potentially great. Genius ? Yes, yes ; it is nothing but strong, hard, well-planned work. You can have genius if you will."

Dr. Bose talks quietly. He does not saw the air with his hands or beat the desk by way of emphasis. In some mysterious way he succeeds in conveying an impression of sincerity.

"Keep yourself for some service in India", he says impressively. "Be a man and help others become manly. Life is short. You should therefore make every minute count. Fill your life to the brim with sweetness and light and activity." This is characteristic of the man who has an air of doing something all the time.

Prof. Bose, who has consistently refused to be a money-making man, denies that commercial success is any fair

testimony to a man's true ability. He scoffs at the idea that monetary success is a true measure of a man's intrinsic worth. With Robert Louis Stevenson, Jagadish Chandra Bose holds that 'Salary' is not the most important thing under the sun. Mr. Bose cares little just for a riband to stick in his coat." A tinsel medal, a title of Knighthood, a Nobel prize is not particularly in his line of ambition. Indeed, it seems to be beyond the pale of his thoughts. "Science should be studied for the sake of science. Don't look for reward. Where you have done something, don't expect that the world is going to set off fire-works about it immediately; don't fool yourself into thinking that there will be band playing and banner-waving right away. Learn to work without looking for money."

That smooth-running high-powered, high-ranged intelligence of his becomes highly keyed up when he talks of Indian unity and Indian nationality. "Be an Indian first. Make that part of your religion. Outgrow provincialism. Try to think in terms of the vast continent of India. It is stupid to imagine that one province is better than another; it is worse than folly to think that a man of one province is naturally superior to that of another. In the New India there will be no Punjabis, no Marhattas, no Bengalis. We are all going Hindusthanis. Do you understand me clearly."

One day a son of a Wealthy Bikaner merchant came to his hotel for an autograph. Prof. Bose intimated that he was not in the habit of giving autographs and that his price for it was high. "But", he asked the young Bikaner student with a slight wink, "How much will you give me?" "I will give my life to the service of India."

All turned toward Mr. Bose. His dark eyes sparkled and snapped at the young man. "Good", he exclaimed, "you can have my autograph."

None of the friends of this scientist would claim that he is a politician. Indeed, he adroitly avoids entering into any discussion of a political nature. "Politics is not my forte," he says with an earnest smile.

We had a number of interesting conversations with Prof. Bose. To be more exact, he talked and I questioned and listened.

"What do you think of America for Indian youths ?" No Indian student should come to this country who has not already obtained his B.Sc. degree in India. I doubt very much the wisdom of sending a ship-load of our students to this country without any reference to their character or capacity. What we should bear in mind in encouraging our young men to come to America is quality, not quantity. American education for our brightest and most promising students is desirable."

How do the American Universities compare with those of England ?

"I like both the English and American Universities. Both have their advantages and disadvantages. I think, however, that the American Universities are more richly endowed ; their laboratories are more splendidly equipped. In the United States, there are many brilliant professors ; but they seem to be overlooked—at least they work harder than their students. America is a free country and its educational facilities are more accessible to the common people than they are in England. But this new country lacks traditions."

In his visit to the United States, Prof. J. C. Bose is accompanied by his wife and his private Secretary B. Sen.

Mrs. Bose is a lady of picturesque and quiet personality. Unlike most of the Indian ladies who go abroad, Mrs. Bose has retained her Indian costume. Her gold embroidered soft sari draped over a pink silk waist is both appropriate and artistic. She has a broad and open brow crowned with beautiful thick hair and her black brown eyes are filled with wonderful illumination. This lady although born and bred in India, easily holds her place in Western Society.

A charming conversationalist with a softly modulated voice is Mrs. Bose. She always has something interesting

to say because she has seen the inside life of both Europe and America. Her friends take some pride in the fact that she is not blinded by the glamours of Western civilisation. She seems to think that the round of western life is made up of incessant toil and moil. People are pre-occupied with the worship of Mammon, of titles, of brute force and engaged in sordid social struggles. "The West like the East, has its caste," she says with feeling. While the western caste is based on dollars and the colour of the skin, the Eastern caste rests on birth. The whole western social fabric is today being violently shaken by naked, volcanic, eruptive materialistic force...

NEW PLANTS HAVE A CHANCE

[Prof. J. Chunder Bose of Calcutta has shown that plants respond to thetics and stimulants,—News item.]

No longer does the gentle rose, in palsied, pallid fear,
Avoid the deadly prunning knife or clumsy garden shear,
No longer does she hide her head as she is tidied up ;
Or wait to weaping heaven above, alike an iujured peep.
Instead she blandly smiles a smile that's cheerful, wise and warm.
Then takes a long refreshing sniff of good old chloroform.

THE NIGHTINGALE AND THE ROSE

[The nightingale according to Arabic poets is the personification of eloquence and to the Persian, the Passionate Lover of the Rose. Omar Khayyam makes it prescribe wine to the beloved as a remedy.]

Divorce thy eloquence, O nightingale !
Wed Silence for a Bride ; forsake the vale ;
Repair to cages, with thy anthem,—Love ;
Nor tell—as wont of yore—thy Pehl'vi tale ;

Henceforth, with dumbness greet New Year's Day,
Sing not the Rose, that masterpiece of May—
She hides no more thy secret in her scent
She may soon speak them out to Bose—she may.

Aye ! suffer thy beloved rose to pine ;
Wine can't her paling cheeks incarnadine.
Wine is a poison to the rose—says Bose.
Alas ! to thy melodious ; "Wine ! Wine ! Wine !"

Nay ! nightingale ! nay, Lover of the Rose !
Part not thy eloquence—thy heart disclose
And sing thy songs of Love—but end them thus ;
Long live ! Long live ! this Life Revealer Bose !

—*W. F. Boustamy*

ডাঃ কুঞ্জ্ (Dr. Kunz) ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আমেরিকান পদার্থবিদ। তিনি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তার মতামত কলকাতার "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় লিখে পাঠান :—

"Bose showed that these short electrical waves have the same properties as a beam of light, exhibiting reflection, refraction, even total reflection, double refraction, polarisation and rotation of the plane of polarisation. The thinnest film of air is sufficient to produce reflection of visible light with its extremely short wave-lengths ; but with Bose's short electric waves, the critical thickness of the air-space was determined by the refracting power of the prism, and by the wave-length of the electric oscillations. He found the special crystal Nemalite, which exhibits the polarisation of electric waves in the very same manner as a beam of light is polarised by selective absorbtion in crystals like Tourmaline, which Bose found to be due to their different electric conductivity in two directions. The rotation of the plane of polarisation was demonstrated by

means of a contrivance twisted like a rope, and the rotation could be produced to left or right, just as different sorts of sugar rotate the plane of polarisation of ordinary light towards one direction or the other. The index of refraction of these electrical waves was determined for different materials; and a difficulty was eliminated which presented itself in Maxwell's theory, as to the relation between the index of refraction of light and the dialectric constant of insulators. Bose also measured the wave-length of the various oscillations. In order to produce the short electrical oscillations, to detect them and to study their optical properties, he had to invent a large number of new apparatus and instruments; and he has indeed enriched physics by a number of apparatus distinguished by simplicity, directness and ingenuity."

Dr. J. C. Bose at the Rammohan Library

(*The Modern Review, Aug. 1915, P. 213*)

INITIATIVE GUESSES OF THE HINDUS OF PLANT PHYSIOLOGY.

Last month, the Rammohan Library and Reading Room of which Prof. J. C. Bose is the President entertained him at an evening party. Babu Bhupendra Nath Bose and Dr. Brojendra Nath Seal ,welcomed him on behalf of the Committee of the Library. In the course of his remarks Dr. Seal drew attention to an interesting passage in the Mahabharat (Santi Parva) which ascribes certain specific forms of sensibility and neutral action to plant organisms e. g. response to some vibrations, as thunder etc.

বায়্বগ্নাশনি নির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেন গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃন্বন্তি পাদপাঃ ॥

The sense of direction and (implied) response to light

বল্লী বৈষ্টয়তে বৃক্ষ সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছন্তি।
যত্নত্রষ্টুশ্চ মার্গোন্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ।

The sense of smell as evidenced by favourable influence (or unfavourable influence) of various scents ; also channels of conduction of nerve force ; and finally pleasure and pain and a sort of comatose consciousness gives a list of plants that exhibit the phenomena of what is popularly known as sleep and waking.

Dr. Seal proceeded :—

Let none of my hearers imagine that all this amounted to scientific knowledge or discovery. This was felicitous intuition earned by intense meditation and guided by intelligent observation ; but the gulf between this stage and the positive experimental knowledge of science is profound and cannot be traversed except by means of difficult and delicate methods of quantitative analysis and

measurement such as have culminated, in the Department Plant Physiology in the researches of Dr. Jagadish Chandra Bose.

In reply to the words of warm welcome and appreciation addressed to him by Babu Bhupendra Nath Bose and Dr. Brajendra Nath Seal, Prof. J. C. Bose delivered an important address. He expressed his thanks for the great interest shown in different parts of India in the success of his work.

Dr. Bose said—

This was the fourth occasion on which he had been deputed to the West by the Govt. of India on a scientific mission and the success that has attended his visit to foreign countries has exceeded all his expectations. In Vienna, in Paris, in Oxford, Cambridge and London, in Harvard, Washington, Chicago and Columbia, in Tokyo and in many other places his work has uniformly been received with high appreciation. In spite of the fact that his researches called into question some of the existing theories, his results have notwithstanding received the fullest acceptance. This was due to a great extent to the convincing character of the demonstration afforded by the very delicate instruments he had been able to invent and which worked under extremely difficult tests with extra-ordinary perfection. Even the most critical savants in Vienna felt themselves constrained to make a most generous admission.

In these new investigations on the border land between physics and physiology, they held that Europe has been left behind by India to which country they would now have to come for inspiration. It has also been fully recognised that science will derive benefit when the synthetic intellectual methods of the East co-operate with the severe analytical methods of the West. These opinions have also been fully endorsed in other countries of learning and Dr. Bose had received applications from distinguished universities in Europe and America for admission of foreign post-graduate scholars to be trained in his Laboratory

in the new scientific methods that have been initiated in India.

This recognition that the advance of human knowledge will be incomplete without India's special contributions must be a source of great inspiration for future workers in India. His countrymen had the keen imagination which could extort truth out of a mass of disconnected facts and the habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself. Inspired by his visits to Taxila, at Nalanda and at Conjeevaram, Dr. Bose had the strongest confidence that India should see a revival of those glorious traditions. There will soon rise a temple of learning where the teacher cut off from wordly distractions would go on with his ceaseless pursuit after truth and dying, hand on his work to his disciples. Nothing would seem too laborious in his enquiry ; never is he to lose sight of his quest, never is he to let it be obscured by any territorial temptations. For his is the Sannasin spirit and India is the only country where so far from there being a conflict between science and religion, knowledge is regarded as religion itself. Such misuse of science as is now unfortunately in evidence in the West would be impossible here. Had the conquest of the air been achieved in India her very first impulse would have been to offer worship at every temple for such a manifestation of the divinity in man.

Japan

One of the most interesting events in his tour round the world was his stay in Japan where he had ample opportunity of becoming acquainted with the efforts of the people and their aspirations towards a great future. No one can help being filled with admiration for what they have achieved. In materialistic efficiency, which in a mechanical era is regarded as an index of civilisation, they have even surpassed their German teachers. A few decades ago, they had no foreign shipping and no manufacture. But

within an incredibly short time their magnificent lines of steamers have proved so formidable a competitor that the great American lines will soon be compelled to stop their sailings. Their industries again, through the wise help of the state and other adventurous aids, are capturing foreign markets. But far more admirable is their foresight to save their country from any embroilment with other nations with whom they want to live in peace and they realise that any predominant interest of a foreign country from any embroilment with other nations with whom they want to live in peace and they realise that any predominant interest of a foreign country in their trade or manufacture is suwe to lead to misunderstanding and friction. Actuated by this idea they have practically excluded all foreign manufactured articles by prohibitive tariffs.

And it ought to be borne in mind in this connection that none of the continental European countries (barring Russia) which does not yet count in the tale of economic expansion) has any political ambition, possibilities or spheres of influence in this country, while as much cannot be said of any of the powers in the far East.

Is our country slow to realise the danger that threatens her by the capture of her market and the total destruction of her industries ? Does she not realise that it is helpless passivity that directly provokes agression ? Has not the recent happenings in China served as an object lesson ? There is therefore, no time to be lost and the utmost effort is demanded of the Government and the people for the revival of our own industries. The various attempts that have hitherto been made have not been as successful.

বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ

শ্রীঅবলা বসু

ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কোন গুণই আমার ছিল না কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশ সেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সেকথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসরে আচার্য বসু মহাশয় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য বৃটিশ এসোসিয়েশনে আহূত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা। ইহার পর পাঁচ ছয় বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণ কালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানাভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইউরোপে কত পরিবর্তন দেখিলাম। এদেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্তন কখনও দেখা যায় না।

বিলাতে পৌছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে Sir J. J. Thomson, Oliver Lodge ও লর্ড কেলভিন ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল ত ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহু কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে যে কি হইল সে সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোন ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁর গ্লাসগোর ভবনে

নিমন্ত্রণ করিলেন। ওলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুইজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।

ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানা স্থানে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাডসটোন এর বাড়ীতে এইরূপে নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া ভোজন সভাতে বসিয়া শুনিলাম একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক (যাঁহাকে ভারত সচিব বিশেষজ্ঞ স্বরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন) পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন—"এই 'চন্দ্র বসু' লোকটি যাহার কথা আজকাল লোকে বলিতেছে, সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাকে ছোট টেস্ট টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেস্ট টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা করিতে পারে না—ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্তু বিচার বুদ্ধি খাটাইয়া হাতে কলমে ব্যবহার ত কখনও করিতে পারে না!" পার্শ্বের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যামসে। তিনি বলিলেন—"চুপ করো—তুমি কিছুই জানো না—ভারতবাসী বহু শতাব্দীর সাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে ইহারা এ পর্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন শিখিবে তখন বৃটেনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই 'চন্দ্র বসু' দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।" ক্রমে গ্ল্যাডস্টোন পরিবারের সহিত আত্মীয়তা বাড়িয়া গেল, তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতে লাগিলাম। ডাক্তার গ্লাড্‌সটোন বিপত্নীক ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সেবার জন্য বিবাহ করেন নাই; ইংলণ্ডে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়; কখনও কন্যা পিতার জন্য, কখনও পুত্র মাতার জন্য আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করেন। বর্তমান বাঙ্গালী রাসায়নিক-দের গুরু Donnan সাহেব বিবাহ করেন নাই, মাতা ও কুমারী ভগিনীদের লইয়াই তাঁহার পরিবার। বিবাহের কথা তুলিলেই হাসিয়া বলেন, এমন মা ও বোন থাকিতে আমার তত্ত্বাবধান করিতে অন্য কাহারও কি আবশ্যকতা? বিবাহ করার খাতিরেই বিবাহ করার ভক্ত ইহারা নহেন। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহারা জীবনপথে অগ্রসর হন।

এই পরিবার ইংলণ্ডের অভিজাত বংশের (aristocracy) সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং শ্রমজীবিদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে পূর্বে বেশ কুসংস্কার ছিল। কিন্তু এই পরিবারেই এমন ঘটনা হইল যে তাঁহাদের এক কন্যা আভিজাত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া এক দরিদ্র শ্রমজীবিকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার জীবন শ্রমজীবিদের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিলেন। সেদিন হইতে কন্যার পরিবারে ঘোর বিষাদ—তাঁহার নাম আর কেহ করিতে পাইত না। কিন্তু কন্যা পতিগৃহে নব উৎসাহে শ্রমজীবিদলের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন। তাঁহার দরিদ্রগৃহে নানা দেশের কর্মীরা আশ্রয়, উৎসাহ ও বিশ্রাম পাইতেন। এই কন্যা যাঁহার সহধর্মিণী হইয়াছিলেন, তিনিই দুবৎসর পূর্বের ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড্।

ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য নিমন্ত্রিত হন। এই স্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন। তরলগ্যাসের (Liquid gas) আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ Sir James Dewar তখন ইহার কর্তা ছিলেন। তিনি রয়েল ইন্‌স্টিটিউশন-এরই উপরের তলাতে বাস করিতেন। সেদিন আমাদের সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বহু সম্মানিত লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ। তাহার ফলে অনেকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বঙ্গ নারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্যকথা বলিতে কি, পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরাও সকলেই বুঝি খুব বিদুষী। এইসব নিমন্ত্রণে গিয়া সে ধারণা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল তবে বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরা যে খুবই পতিপ্রাণা ও পতির সেবাতে নিযুক্তা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। লর্ড কেল্‌ভিন নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন।

রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনের প্রবর্তক আদিগুরু Davy (ডেভি) ও Faraday (ফ্যারাডের)-র যন্ত্রপাতি সেখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হয় এবং যদি সেখানে কেহ কোন নূতন কিছু দেখাইতে চান তাহাও শুক্রবার দিন দেখানো হয়। আমরা আহারান্তে এইসব দেখিয়া বক্তৃতাগৃহে গেলাম। সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়

পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভায় রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে নটা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। একঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা-অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। Lord Raleigh (লর্ড র‍্যালে) বলিলেন যে, এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখন হয় নাই—দু-একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিষটা বাস্তব ; এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড় পিণ্ডবৎ ছিলাম। আজকালকার মেয়েদের মতন চালাক চতুর ছিলাম না, একটি কথাও বলিতে পারিতাম না কিন্তু এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনের কার্য-পদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদেব দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল। দেশে যাহা কিছু কাজ করিয়াছি তাহাও বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতারই ফল।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা উত্থাপিত হইলে আমরা সচরাচর আর্য ঋষিগণের ধর্মোন্নতি এবং আর্য মনীষীগণের দার্শনিক জ্ঞানের কথাই ভাবিয়া থাকি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ পরমার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয় ভারতের প্রাধান্যই সচরাচর আমাদের পূর্বপুরুষগণের গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্তমান কালে পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলেন তাহাতেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা পাটীগণিতের কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। এমন কোন সংখ্যাবাচক অঙ্কের দক্ষিণে শূন্য বসাইলে তাহার মান দশ গুণ বৃদ্ধি হয়—ইত্যাকার যে দশমিক পদ্ধতি, সভ্যজগৎ তজ্জন্য প্রাচীন হিন্দুগণেরই নিকট ঋণী। এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাটীগণিতের কোন উন্নতি হইতে পারিত না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা বীজগণিত সম্বন্ধীয় হিন্দুগ্রন্থ অনুবাদ করেন; এবং পাইসা নিবাসী লিউনার্ডো উক্ত বিজ্ঞান আধুনিক ইউরোপে প্রবর্তিত করেন। ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুগণ জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা ছিলেন। জ্যামিতির আবিষ্ক্রিয়াও প্রথমে ভারতবর্ষেই হয়। গ্রীকগণ এই বিষয় অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার টিব দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষেই এ বিদ্যার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ স্বাধীন-ভাবে জ্যোতিষেরও অনেক উন্নতি করেন। জড় বিজ্ঞানও তাহাদের অনুশীলনের বিষয় ছিল। তাঁহারা নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

স্বর্ণমাক্ষিক, সৌবীরাঞ্জন, হরিতাল, তুত্থং (তুঁতে ইতিভাষা) পুষ্পকাশীশ, কাশীশ, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, রসকর্পূর, রসপর্পটি, স্বর্ণ সিন্দুর, ও মকরধ্বজ।

হিন্দুগণ দ্রাবণ, বাষ্পীকরণ, ভস্মীকরণ, উর্দ্ধপাতন, তির্যক পাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সংসারকে মায়াময় ভাবিয়া কেবল আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তাঁহারা নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন একজন ভূমিশূন্য ব্যক্তির পূর্বপুরুষগণ

জমিদার ছিলেন বলিয়াই তাহার উদর পূর্তি হয় না, তেমনি ভারতের পূর্ব গৌরব স্মরণ করিলেই আমাদের সাময়িক দরিদ্রতা দূর হইতে পারে না। গৌরবান্বিত নামের উত্তরাধিকারী হইয়া আলস্যে উদ্যমহীন ভাবে কালযাপন করা অতি হেয় ; পূর্বপুরুষগণের যশ উজ্জ্বলতর করিতে না পারি, অন্ততঃ তাহার ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় যে জাতির স্ফূর্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও অনুদ্যমের উৎপত্তি হয়, জাতীয় প্রতিভার অবনতির তাহা একটি প্রধান কারণ। তাহার উপর আমাদের দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষা থাকিলেও উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাব আমাদিগকে আরও প্রতিভাবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় নানা বিষয়ে আবার ভারতের জাতীয় প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আজ আমরা যাহার কথা লিখিতে বসিয়াছি তিনি বিজ্ঞানবিষয়ে জাতীয় প্রতিভাকাশে ঊষার রক্তিম রেখার মত।

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রভূত ; কিন্তু তিনি যে আশার আলো আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়াছেন তাহা অমূল্য। তিনি জাতিসমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার পথ করিয়াছেন।

আমরা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কাগজে তদুপযুক্ত স্থান নাই, তদ্ভিন্ন সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বড় কঠিন। তাঁহার কার্যের, চরিত্রের ঠিক বিচারক এবং গুণগ্রাহী আমরা হইতে পারি না। যেমন চিত্র বিশেষের সৌন্দর্য অনুধাবন করিতে হইলে, উহা হইতে কিছু দূরে যাইতে হয়, তেমনি কীর্তিমানের কীর্তি ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক স্থলেই সময়ের দূরত্বের প্রয়োজন হয়।

আর এক কথা—

> History is half dream—ay even
> The man's life in the letters of the man.

সুতরাং প্রকৃত জীবনচরিত লেখা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুর জীবনের কয়েকটি স্থূলস্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কিন্তু একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি। তাঁহার ভগিনীগণ সকলেই সুশিক্ষিতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাসমাপনার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং তথায় সুবিখ্যাত ক্যাবেণ্ডিষ গবেষণাগারে বিজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের বি, এ এবং লণ্ডনের বি, এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগত মহাত্মা ফসেট্ সাহেবের প্রীতিলাভে সমর্থ হন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, তখন হইতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে বিলক্ষণ নিপুণ হস্ত ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনে তিনি বরাবরই সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর একটি দোষ এই যে, ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোন সুযোগ নাই। এই দোষ দূর করিবার জন্য বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ আছে।

তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসায় যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি বৌবাজার স্ট্রীটে থাকিতেন। সেখানে আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার্য দ্রব্যের আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানাবিষয়ক বন্ধুভাবে অমায়িকতার সহিত কথোপকথন করেন এবং রাস্কিন প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখা কিছু কিছু পড়িয়া শুনান। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বোধ হয়, নিমন্ত্রিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মিষ্টান্নের গুণ গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের অধ্যাপক যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার মর্ম আমরা কতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। আমার দুর্ভাগ্য এই যে তাঁহার বিজ্ঞানোৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই।

বসু মহাশয় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আগমন করেন, তখন উহাতে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাদি সামান্য রূপই ছিল। ইহারই যত্নে ক্রমে ক্রমে অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্র ক্রীত হওয়ায় এখন তথায় পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা সম্ভবপর

হইয়াছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জগদীশবাবু তাড়িত বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর মে মাসে "On the Polarisation of the Electric Ray" সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ বঙ্গদেশীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতে শীঘ্রই এই সকল গবেষণার প্রতি পণ্ডিতবর্গের নজর পড়ে। বর্তমান যুগের প্রধান তাড়িততত্ত্বজ্ঞ লর্ড কেলবিন আপনাকে literally filled with wonder and admiration for so much success in this difficult and novel experimental problems বলিয়া প্রকাশ করেন। লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্র বলেন :—

The originality of the achievements is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his instruments as he went along. His paper forms the outcome of the two fold line of labour—construction and research.

বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেলি কর্তৃক রয়্যাল সোসাইটিতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত সমিতির কার্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয় ছিল "The Determination of the Indices of Refraction for the Electric Ray." এই সকল গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রয়্যাল সোসাইটি পার্লামেণ্ট প্রদত্ত একটি ফণ্ড হইতে বসু মহাশয়কে তাঁহার কার্য সৌকর্যার্থ কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এই সকল গবেষণার সাহায্যার্থ একটি গবেষণা ফণ্ড স্থাপিত করিয়া বসু মহাশয়কে তাহার অধ্যক্ষ করেন। তৎপরে ভারত গভর্ণমেণ্টের সুপারিশে সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনার্থ জগদীশ বসুকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া জগদীশ বসু ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের" গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইউরোপের প্রধান প্রধান পদার্থবিদ্‌গণ তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধটি এরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন যে

অধিবেশন স্থগিত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহারা তাঁহাকে পাঠ করিয়া যাইতে নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক-বসু তাঁহার যন্ত্রের ক্রিয়ার যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লর্ড কেলবিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঘন ঘন করতালি দিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গ্লাসগো নগরে লর্ড কেলবিন অতিশয় হৃদ্যতা ও আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আদরের সহিত গৃহীত হন। বিলাতে থাকিতে থাকিতে তিনি আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি এতদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠ করেন। প্রবন্ধটির বিষয় "The selective conductivity exhibited by certain Polarizing substances."

ইহার পর তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে শুক্র বাসরিক সান্ধ্য বক্তৃতা করিতে আহূত হন। যেখানে ডেবি, ফারাডে, এবং টিণ্ড্যাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেখানে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক পদার্থবিদ্যায় অতি দুরূহ একটি বিষয়ে সমবেত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন ইহাকে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে।

সোসাইটি অব আর্টস্ নামক সমিতির এক অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত করেন:—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয়ের সংখ্যা হ্রাস। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উচ্চতর বিষয়ের অনুশীলনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণের জন্য বৃত্তি স্থাপন, এবং সরকারী নানাবিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতবাসীগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তির প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়াগুলি উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীর রাসায়নিক গবেষণারও উল্লেখ করেন।

উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন:—

I have not yet said anything of the intellectual hunger that has been created by spread of education, a hunger which is as imperative as that of the physical body. The spectator in a recent article, has well remarked that an educated man

in my country wants something absorbing to think about. His intellect is at present left to consume itself, there being no vent for his useless energies. If it could be done he would betake himself "ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature, which can never end yet is always yielding results, upon which yet deeper inquiries can be based." We have been called a nation of dreamers. There is a necessity for dreamers to think out the great problems of life and make the world richer by their thoughts. But there is room for workers, too, toilers who by incessant work would increase the bounds of human knowledge. We want to have our share in this work. Our ancestors did at one time contribute to enrich the stock of the world's knowledge, but that is so long past, that it is almost forgotten now. It would perhaps not be an unworthy work for England to help us to take our place again among the intellectual nations of the world."

বিলাতী প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়। লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলবিন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহ স্থাপনার্থ এক আবেদন করেন। সেক্রেটারী অব স্টেটের সহিত অধ্যাপক বসুর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি সেক্রেটারী মহোদয়কে বলেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার বিস্তর উন্নতি হইতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাশ লোক জীবনধারণার্থ কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে।

কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; অথচ বৃষ্টির পরিমাণ অনিশ্চিত। অপরদিকে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করিলে কোন কার্য না পাইলে আলস্যে কালযাপন করে। নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি হইলে ইহারাও কাজ পাইবে এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীকেও কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

জার্মানীতে অধ্যাপক বসুর বিলক্ষণ আদর-অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কীল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উহার সদস্যগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। বার্লিন নগরে তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক শ্রোতার সমক্ষে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি হল্ ও হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ফ্রান্সেও তিনি

অনেক বৈজ্ঞানিক পরিষদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হ'ন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির বৃত্তান্ত ফ্রান্সের প্রধান বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন এবং তৎকৃত কার্যের সমুচিত প্রশংসা করেন।

বসু মহাশয় যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অনেক দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে পারিবে। ফরাসীদেশে এবং আমেরিকায় মিষিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ যন্ত্র বিবিধ নূতন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্যও যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে এ সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ Electrician পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। Electrical Engineer-ও এই যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

It is worth remarking that no secret was at any time made as to its construction, so that it has been open to all the world to adopt it for practical and possibly money making purposes.

ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউসনে জগদীশবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার হেনরি রস্কো বলেন :—

I am sure I express the feelings of all present when I say that we have been listening to one of the most remarkable and interesting teachers that we had ever heard ......I am sure you cannot have listened to what he has said without feeling that the work which he has done has been of the highest order and it shows that Eastern people are equally capable of making great scientific discoveries and of becoming great experimentalists as those who live in the West. Really, if our rulers understood the trend of thoughts and actions in the future they would be rather more willing to place funds at the disposal of men like Dr. Bose for the purpose of rendering service to Science and therefore rendering service to their country.

লর্ড রে বলেন :—

I am quite sure that we shall envy the students of the Presidency College at Calcutta in having a professor who

can explain with such extraordinary lucidity of the most complicated problems of physical science.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে ডি.এস্‌সি উপাধি দিয়াছেন।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত Spectator পত্রে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হয়। আমরা তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"There is, however, to our thinking something of rare interest in the spectacle then presented of a Bengalee of the purest descent possibly lecturing in London to an audience of appreciative European Savants upon one of the most recondite branches of the most modern of the Physical Sciences. It suggests at last the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by acute observation and patient experiment to wring from nature some of her most jealously guarded secrets.

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিলাতের Spectator ভারতবাসীদিগকে এতকাল অসূয়ার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। উক্ত পত্রের পূর্বমতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবাসীর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে এখন লিখিয়াছেন :—

"He has justly burning imagination which could extort truth out of a man of apparently disconnected facts a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers and a power of persistence—which is something a little different from patience—such as hardly belonged to any European. We do not know Professor Bose, but if he is like the thoughtful among his countrymen, as of course he must be, we venture to say, that if he caught with his scientific imagination a glimpse of a wonder working 'ray' as yet unknown to man but always penetrating either, and believed that experiment would reveal its properties and potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and dying hand on his

task to some successor, be it son or be it disciple. Just think what kind of addition to the means of investigations would be made by the arrival within the sphere of inquiry of men with the Sunnyasee mind, the mind which utterly controls the body and can meditate or inquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment telling it to be obscured by any terrestrial temptation. We can see no reason whatever why such a mind, turning from absorption in insoluble problems should not betake itself ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature, upon which yet deeper inquiry can be based. If that happened—and Professor Bose is at all events a living evidence that it can happen, that we are not imagining an impossibility—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind."

জগদীশবাবু বালক বালিকাগণের শিক্ষাকার্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য "মুকুল" নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি এক পত্রে "মুকুলের" উন্নতি কল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে ফসেট্ পরিবারে তিনি যে আদর ও প্রীতি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। তাহার পর আমি যখন "দাসী"র সম্পাদক ছিলাম তৎকালে উক্ত পত্রিকায় তিনি "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" একটি ও 'কলুঙ্গীর যুদ্ধ" সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'সাহিত্য' সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন:—'"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধের একটি স্থান এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই:—

"সেই দুইদিন বহু বন ও গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ

পর্যন্ত আসিতেছিল। কল্লোলিনীর মৃদুগীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল। নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে; যেন ক্রিয়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি একবার আলমোরা হইতে যে তুষার নদী দেখিতে যান ইহা তাহারই বর্ণনা। ইহার পর তিনি "সাহিত্যে" "আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ" শীর্ষক একটি এবং 'মুকুলে' "গাছেরা কি বলে" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। সকলগুলিরই ভাষা মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নয়। কি সৌন্দর্য রচনা, কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার উভয়েই কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছু গঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না। জগদীশ বসুর মুখচ্ছবিও কবিরই মত। শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের মত নয়। তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগের কথা বলিলাম। ইহা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না যে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহেন; কারণ, যাঁহারা কখনও জাহাজে উঠেন নাই, এরূপ অনেক ইংরাজী শিক্ষাভিমানী এখনও বাঙ্গলা লিখন, পঠন এবং উক্ত ভাষায় পত্রালাপ, এমন কি কথোপকথন পর্যন্ত লজ্জাকর, অত্যন্ত সঙ্কোচের কারণ, মনে করেন। অন্যান্য বিষয়েও জগদীশ বসুর সাহেবি-আনা কম; কিন্তু ইংরাজসুলভ সদ্‌গুণের অভাব নাই।

জগদীশবাবু গৃহে ধুতি পরেন: কলেজে ইংরাজের পোষাক পরিয়া আসেন না; হ্যাট পরেন না। হ্যাটটি হজমীগুলি বিশেষ। ইহা দ্বারা বিশেষতঃ রেলের গাড়ীতে, জাতি, জন্ম, বর্ণ, শিক্ষা ও পদগত অনেক 'খুঁত' ঢাকিয়া যায়। শুনিয়াছি কোন কোন ব্যবসায়ে ও চাকুরীতে ইহা না পরিলে চলে না। অতএব হ্যাটের অগৌরব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল জগদীশবাবুর পোষাক বিষয়ক রুচির কথা বলিতেছি।

জগদীশবাবু সৌন্দর্য্যানুরাগী। এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। তাঁহার বাড়ীতে আমি একবার টেনিসনের 'নির্ঝরিণী' কবিতার বর্ণনানুযায়ী

কতকগুলি চিত্র দেখিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে সেগুলি তিনি কাশ্মীর ভ্রমণকালে সৌসাদৃশ্য হইতে ফটোগ্রাফ করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার বন্ধন তিনি সর্বদাই স্বীকার করেন। অপর লোকের সহিত ব্যবহারেও তিনি অমায়িক ও নম্র প্রকৃতি। আমি তাঁহাকে 'প্রদীপে' লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মর্মে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখী হইতাম কিন্তু নানাকার্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে কার্যে বৃত হইয়াছি, তাহার কূল-কিনারা দেখিতে পাই না—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২২

বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ বিদেশের বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য বৎসরাধিককাল য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ হইল তিনি নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবিষ্কারের বিবরণ প্রচারের জন্য ইহাই তাঁহার প্রথম বিদেশ যাত্রা নয়, আরো তিনবার তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিদেশে বহির্গত হইতে হইয়াছিল।

নির্জীব ধাতুপিণ্ড আঘাতে উত্তেজনা পাইলে সজীব প্রাণীর ন্যায় সুখ দুঃখ প্রকাশ করার মত সাড়া দেয়, ইহাই প্রচার করা বসু মহাশয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিষয় ছিল। ইহা পনেরো ষোল বৎসর পুর্বেকার কথা। জগদীশ চন্দ্র ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায় নীরবে যে সাধনা করিতেছেন তাহার ইতিহাস যাহাদের জানা আছে, তাঁহাদের কাছে ষোল বৎসর পূর্বেকার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞান পরিষদ তখন তাঁহার পরীক্ষাগুলি দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি থাপ খায় না। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকরা ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংবাদপত্রে ও বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে তখন জগদীশচন্দ্রের কথাই প্রকাশ হইত এবং তিনি এক পৃথিবীব্যাপী বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মাদক দ্রব্য প্রয়োগে প্রাণী উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে এবং বিষে মরিয়া যায়, ইহা আমাদের জানা কথা। বিদ্যুতের সাহায্যে প্রাণীর এই সকল অবস্থার কথা শারীরবিদগণ প্রাণীদের দিয়াই লিখাইয়া লইতে পারেন কিন্তু মাদকদ্রব্য প্রয়োগ করিলে যে ধাতুপিণ্ডও উত্তেজনা প্রকাশ করে এবং বিষে জর্জরিত হইয়া মরিয়া যায়,—ইহা কাহারো জানা ছিল না। জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার ফলে ইহা জানিয়াই সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে জগদীশচন্দ্র আরো দুইবার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয় তাঁহার অনেক আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইয়াছিল। উদ্ভিদের যে সকল জীবন ক্রিয়ার ব্যাখ্যান আধুনিক বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও দিতে পারেন নাই, বসু মহাশয়

সেইগুলিরই অতি সহজ ব্যাখ্যান দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বক্তৃতা করিয়া ব্যাখ্যান দেন নাই, নিজের পরিকল্পিত অতি সুন্দর সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক উক্তির প্রমাণ দেখাইয়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাতে উদ্ভিদতত্ত্বের অনেক রহস্যের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

এবারেও উদ্ভিদের জীবন ক্রিয়ার আরো নূতন নূতন তত্ত্বপ্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রাণীজীবনের যে সকল কার্য কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া জীবতত্ত্ববিদগণ এতকাল মানিয়া আসিতেছিলেন তাহা উদ্ভিদের জীবনেও দেখা যায়, ইহাও প্রমাণিত করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভিয়েনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সিকাগো, কলম্বিয়া এবং তোকিয়ো প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদ সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া সহজে কেহই নূতনকে গ্রহণ করিতে চায় না। যাহারা বিজ্ঞানের সত্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদেরও মধ্যে এই প্রকারের গোঁড়ামি বিরল নয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি উদ্ভিদতত্ত্ব ও শারীর তত্ত্বের প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরোধী ; কাজেই যে সকল প্রবীন বৈজ্ঞানিক প্রাচীন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নূতনের দিকে টানিয়া আনা সহজ কাজ ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এবারে এই দুঃসাধ্য সাধনেও কৃতকার্য হইয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে শত শত পরীক্ষা দেখাইয়া তিনি যে সকল সত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রবীন বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। জড় ও জীবের দুই বৃহৎ রাজ্যের মাঝামাঝি যে স্থানটি চির-রহস্যময় ছিল আমাদের স্বদেশবাসী জগদীশচন্দ্রই যে তাহাতে নূতন আলোকপাত করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের সকল বৈজ্ঞানিকই তাহা এখন স্বীকার করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মভূমি য়ুরোপকে এখানে ভারতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন বিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বলিতেছেন, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে এ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছেন, কাজেই তাহার সুন্দর পূর্ণ মূর্তিখানি কাহারও নজরে পড়ে নাই। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রই প্রকৃতিকে দৃষ্টির সীমার মধ্যে আনিয়া তাহার পূর্ণমূর্তি দেখাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাসমিতিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখনো আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি ম্যাকোলিয়োর মাগাজিন (Mc clure magazine) নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে বসু মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা পাঠকের নিকটে তাহারি মর্ম উপস্থিত করিতেছি। প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক জগদীশচন্দ্রের নূতন ও পুরাতন আবিষ্কারের অনেক কথাই অবগত আছেন। লেখক সেইসকল কথাকেই সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ইংরেজী প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

উপাধি গ্রহণ করিয়া জগদীশচন্দ্র যখন অক্সফোর্ড বিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন জড়বিজ্ঞানের অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তারহীন টেলিগ্রাফ তখন উদ্ভাবিত হয় নাই। ঈথরের তরঙ্গই যে বিদ্যুৎ তাপ এবং আলোক উৎপাদন করে, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েল সাহেব তাহা কাগজ কলমে প্রমাণিত করিয়া তখন পরলোকগত। কেবল জার্মান পণ্ডিত হার্জ সাহেবই সেই সময়ে ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া পরীক্ষা করিতে ছিলেন। হার্জ সাহেবের এই পরীক্ষাগুলি জ্ঞানপিপাসু জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

হার্জ সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুতের তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন করা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পরিচয় আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই ইহার পরিচয় লইতে হইলে কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব এই কথা শুনিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাই তখন কোহেয়ার (Coherer) নামে খ্যাত হইয়াছে। কাচের নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণ যন্ত্রটির প্রধান উপাদান। বিদ্যুতের অদৃশ্য তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন হইয়া ধাতুচূর্ণে আসিয়া ঠেকিলে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহণ শক্তি কমিয়া আসিত এবং ইহা দেখিয়াই অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যাইত। কিন্তু যন্ত্রটিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার পরে ধাতুচূর্ণগুলিকে ঝাঁকাইয়া না দিলে ফলিত না। যে ধাতুচূর্ণে একবার তরঙ্গের স্পর্শ লাগিয়াছে ঐ প্রকারে ঝাঁকাইয়া না দিলে তাহা আর বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাড়া দিত না। যাহা হউক, লজ্ সাহেবের এই যন্ত্রে বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ তরঙ্গের পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং এই অদৃশ্য তরঙ্গের চালনা করিয়া সংবাদ আদান

প্রদানের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণের পরিচালন শক্তি কেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পর্শে পরিবর্তিত হয় এবং কেনই বা তাহাতে ঝাঁকুনি না দিলে কাজ চলে না এসব প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থাকিয়া গেল। আমাদের জগদীশচন্দ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম গবেষণা।

কোন্ সূত্রে কোন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার হিসাবপত্র করিয়া তত্ত্বান্বেষীরা চলেন না। পূর্বোক্ত যে বিষয়টি লইয়া জগদীশচন্দ্র প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই যে জীবের জীবত্বের ও জড়ের জড়ত্বের মূল কথা বলিয়া দিবে, তাহা তিনিও সেই সময়ে ক্ষণকালের জন্য মনে করিতে পারেন নাই। যাহা হউক বিদ্যুৎ তরঙ্গের স্পর্শে লৌহচূর্ণ কেন বিদ্যুৎ পরিচালনার ধর্ম হারায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন পুনঃপুনঃ সঞ্চালনে অসাড় হইয়া যায়, বিদ্যুৎ তরঙ্গের বারবার আঘাতে লৌহচূর্ণও সেই প্রকারে অসাড় হইয়া পড়ে। তাই তাহার ভিতর দিয়া তখন বিদ্যুৎ পরিচালনা হয় না। আবার কাজ পাইতে হইলে, সেই অসাড় ধাতুচূর্ণকে ঝাঁকুনি দিয়া উত্তেজিত করিতে হয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের এই আবিষ্কারে নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানা জড় পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ আঘাত উত্তেজনা দিলে কি ফল হয়, তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাণী দেহের যে সকল ক্রিয়া চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়া বা স্পর্শ করিয়া বুঝা যায় না, প্রাণীতত্ত্ববিদগণ তাহা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা বুঝিতে পারেন। জগদীশচন্দ্র ঐ প্রকারে বিদ্যুতের সাহায্য লইয়া জড়ের নানা অবস্থা পরীক্ষা করিতে সুরু করিয়াছিলেন। সজীব প্রাণীর পেশী বা স্নায়ু উত্তেজিত করিলে উত্তেজনা প্রাপ্ত অংশে অতি মৃদু বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়; খুব ভাল তড়িৎবীক্ষণযন্ত্রে সেই বিদ্যুৎ ধরা পড়ে। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহে অবিরাম আঘাত দিলেও তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে না। ধাতু লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, সজীব প্রাণীর ন্যায় ধাতুও আঘাতের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; তাহারও জীবনমরণ, স্ফূর্তি ও ক্লান্তি আছে। কেবল তাহাই নয়; প্রাণীর পেশী যেমন ঠাণ্ডা পাইলে নিস্তেজ হয়, বিষে মৃতপ্রায় হয় এবং ঔষধে পুনর্জীবিত হয়, ধাতুপিণ্ডেও ঐ সকল প্রক্রিয়ায় অবিকল একই ফল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সজীব মাংসপেশীতে চিমটি কাটিলে তাহা বেদনায় উত্তেজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিদ্যুতের

উৎপত্তি হয়। ধাতুপিণ্ডে চিমটি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক সেই প্রকার বেদনা জ্ঞাপক বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়াছিলেন। মাংসপেশীতে পুনঃপুনঃ আঘাত দিলে তাহা অসাড় হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ দিলে তাহাতেই সাড়া দিবার শক্তি আবার ফিরিয়া আসে। অবিরাম আঘাত দিয়া জগদীশচন্দ্র ধাতুপিণ্ডেও ঠিক ঐ প্রকার অসাড়তা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া তাহাকেই আবার সসাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আঘাতে সাড়া দেওয়াই জীবের জীবত্ব বলিয়া যে একটি সংস্কার স্মরণাতীত কাল হইতে বদ্ধমূল ছিল, বসু মহাশয়ের আবিষ্কারে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিলেন, অজৈব পদার্থ মাত্রই মৃত নয়।

এই আবিষ্কারের বিবরণ রয়াল সোসাইটি প্রভৃতি বিজ্ঞান সভায় প্রচারিত হইলে বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রকে কি প্রকারে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বেই তাহার আভাষ দিয়াছি। আর কোন গবেষণায় হাত না দিয়া তিনি যদি এইখানে সকল গবেষণা হইতে বিরত হইতেন তাহা হইলে পূর্বোক্ত আবিষ্কারটিই জগদীশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। কিন্তু সম্মানলাভ তাঁহার গবেষণার লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতির কার্যের মূল রহস্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র সৃষ্টির সহিত পরিচয় লাভ করাই তাঁহার জীবনের সাধনা হইয়াছিল। কাজেই এত সম্মান, এত সাধুবাদ তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ধাতুর সহিত সাধারণ সজীব বস্তুর যখন এত নিকট সম্বন্ধ, তখন সাবধানে পরীক্ষা করিতে পারিলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের কার্যে নিশ্চয়ই অনেক মিল দেখা যাইবে।

উদ্ভিদের জীবনের কার্য পরীক্ষা করিবার জন্য এ পর্যন্ত জীবতত্ত্ববিদগণ অনেক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল জগদীশচন্দ্রের নিকট এত স্থূল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে তিনি নিজেই মনের মত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে অনেক যন্ত্র প্রস্তুত হইল। এগুলি এত কার্যোপযোগী হইল যে শীত গ্রীষ্মে বা আঘাতের উত্তেজনায় দৈহিক অবস্থার যে অতি সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহাও উদ্ভিদগণ যন্ত্রের লেখনীর সাহায্যে যন্ত্রসংলগ্ন লিপিফলকে লিখিয়া জানাইতে লাগিল। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, কেবল জীবন মৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থূল ব্যাপারেই যে প্রাণী ও উদ্ভিদের একতা আছে তাহা নয়; প্রাণীর জীবনের কার্যে যে সকল খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখা যায়, সেগুলি উদ্ভিদেও ধরা পড়ে।

চিমটি কাটিলে বা আঘাত দিলে প্রাণীর দেহে বেদনার সঞ্চার হয় এবং তাহার লক্ষণ দেহের আকুঞ্চনে বা বিদ্যুৎ প্রবাহে প্রকাশ পায়। তাহা ফুলকপির ডাঁটায় চিমটি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই প্রকার বেদনা-জ্ঞাপক লক্ষণ তাঁহার যন্ত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাছাড়া বিষ, মাদকদ্রব্য, অবসাদক বা উত্তেজক বস্তু প্রাণীদেহে যে প্রকার ক্রিয়া করে, উদ্ভিদদেহেও যে অবিকল তাহাই করে জগদীশচন্দ্র ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। পরীক্ষাকালে উদ্ভিদগণ যন্ত্রের লেখনী দিয়া দৈহিক অবস্থার কথা নিজেরাই লিখিয়া দেখাইয়াছিল।

শ্রমসাধ্য কাজ বারবার করিতে থাকিলে খুব বলশালী প্রাণীও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামে অবসাদ দূর হইলে, আবার সে শ্রম করিতে পারে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদকেও ঐ প্রকারে পরিশ্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া তাহাকে কার্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে ঘোড়া গাড়ী টানিতে গিয়া বেশী লাফালাফি করে, সে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হয়; কাজেই তাহার বিশ্রামেরও শীঘ্র প্রয়োজন হয়। লজ্জাবতী গাছে বসু মহাশয় ঐ প্রকার উত্তেজনাশীল প্রাণীর সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সামান্য উত্তেজনায় লজ্জাবতী অধিক সাড়া দিয়া শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অন্ততঃ পনেরো মিনিটকাল বিশ্রামের অবকাশ না দিলে সে পূর্বের স্ফূর্তি ফিরিয়া পায় না।

দেহে আঘাত দিলে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীরা বেদনা বুঝিতে পারে না। আঘাত-প্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে এক একটু সময়ের ব্যবধান থাকে। উদ্ভিদেও আঘাত-প্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে যে একটু অবকাশ আছে তাহাও জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। এমন সূক্ষ্ম সময় পরিমাপক যন্ত্র এ পর্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিকই উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

মদ খাইয়া মানুষ যখন মাতাল হয়, তখন তাহার চালচলন কি প্রকার অদ্ভুত হইয়া দাঁড়ায় তাহা কখন কখন পথে ঘাটে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র কিছুকাল আলকোহল বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া লজ্জাবতী লতাকে উন্মত্ত করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে একে একে মাতালের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। গাছের হাত পা নাই, বাকশক্তিও নাই; কাজেই লজ্জাবতী ঐ অবস্থায় মাতালের মত টলিতে পারে নাই বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাসিকান্না

দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু যন্ত্রে সে নিজে যে সকল সাড়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই মাতালের সকল উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠাণ্ডা এবং নির্মল বাতাসের সংস্পর্শে মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়। আলকোহলের বাষ্পপ্রয়োগ বন্ধ করিয়া লজ্জাবতীকে নির্মল বাতাসে রাখা হইয়াছিল; ইহাতে সে কিছুকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবল মাদকদ্রব্য নয়, যে দ্রব্য প্রাণীদেহে যে ক্রিয়াটি দেখায় উদ্ভিদদেহে প্রয়োগ করায় বসু মহাশয় অবিকল সেই ক্রিয়াই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত জীবতত্ত্ববিদগণ প্রাণী ও উদ্ভিদকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় জীব বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের জীবনের কার্যের মধ্যে যে কোন ঐক্য আছে তাহা ইহাদের মধ্যে কেহই স্বীকার করিতেন না। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের এই সকল আবিষ্কারে এখন পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্যে কোনো পার্থক্যই নাই; বিধাতা উভয়কেই একই গুণবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সেই আদিম গুণগুলিই বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের মোহ উৎপাদন করিতেছে।

এগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের কথা। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যে কতটা লাগিবে, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই হিসাবেও আবিষ্কারগুলির মূল্য কম নয়। চিকিৎসার জন্য ঔষধ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কাজ। কোন পদার্থের রোগ নাশ করিবার শক্তি জানা গেলেও, তাহা মানুষের উপরে হঠাৎ প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই অনেক নিরীহ প্রাণীর উপর দিয়া নূতন ঔষধাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হয়। মানুষের সুবিধার জন্য এই প্রকারে আজকাল যে কত প্রাণীহত্যা করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন উদ্ভিদের উপরে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের গুণাগুণ বিচার করা চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

জার্মানীর প্রধান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পেফার (Pfeffer) এবং হাবেরলাণ্ড (Haberlandt) সাহেব নানা পরীক্ষায় লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদেও স্নায়ুমণ্ডলীর অস্তিত্ব ধরিতে পারেন নাই। ইহারা লজ্জাবতীকে ক্লোরোফরমের বাষ্পে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার ডাঁটা পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি লজ্জাবতী সাড়া দিতে ছাড়ে নাই। ইহা দেখিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে লজ্জাবতীর দেহে স্নায়ুমণ্ডলী নাই; থাকিলে তাহার কার্য ক্লোরোফরমের স্পর্শে ও তাপে

লোপ পাইয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবতীর সাড়া দেওয়া বন্ধ হইত। আগুনে পোড়া শাখার ভিতর দিয়া উত্তেজনায় চলা ফেরার কারণ দেখাইতে গিয়া ইহারা বলিয়াছিলেন, জলপূর্ণ রবারের নলের একপ্রান্তে চাপ দিলে তাহাতে যেমন সেই চাপ নলের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছায়, লজ্জাবতীর দেহের উত্তেজনা ঠিক তেমনি করিয়া তাহার ভিতরকার জলের সাহায্যে দগ্ধ শাখার ভিতর দিয়াও চলে।

পেফার ও হাবেরল্যাণ্ডের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া জগদীশচন্দ্র যে সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক। তিনি একটি লজ্জাবতী গাছকে চারা অবস্থা হইতে সাবধানে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহাতে সেটি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া পুষ্টাঙ্গ হয় তাহার জন্য যখন যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তখনি তাহা করা হইত এবং যাহাতে উহার পাতায় বা ডালে কোনো প্রকার আঘাত না লাগে তাহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা হইত। হাত-পা বাঁধিয়া যদি কোন লোককে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে লোকটির দেহ বেশ পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার হাত পা আড়ষ্ট হইয়া যায়। সযত্নে পালিত লজ্জাবতী গাছটির অবস্থাও কতকটা সেই রকমই হইয়াছিল; দেখিলে গাছটিকে খুবই সুস্থ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু মৃদু আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারিত না। ইহা দেখাইয়া তিনি লজ্জাবতীর স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। জলই যদি উত্তেজনার বাহক হইত তবে এই পরীক্ষায় গাছে সাড়ার অভাব হইত না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, দেহস্থ জলের চাপ উত্তেজনার বাহক নয়। লজ্জাবতীর দেহে প্রাণীদেহের ন্যায় স্নায়ুজাল বিস্তৃত আছে, তাহাই অনভ্যাসে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই লজ্জাবতী সাড়া দেয় নাই।

ব্যবহারের অভাবে স্নায়ুমণ্ডলী বিফল হইলে যাহার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে জোর করিয়া কিছুদিন চলাফেরা করাইলে স্নায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে; তখন সে সুস্থ ব্যক্তিরই ন্যায় হাত-পা নাড়িতে পারে। পূর্বোক্ত অসাড় লজ্জাবতীর দেহে উপর্যুপরি আঘাত দিয়া এবং সর্বাঙ্গে সেঁক দিয়া জগদীশচন্দ্র তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় সে সুস্থ গাছের মতই সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

স্নায়বিক শক্তি সকল প্রাণীর সমান নয়। মানুষের মধ্যেই ইহার অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন লোক আছেন, যাঁহারা স্লেটের উপরে পেন্সিল

ঘষার শব্দ সহ্য করিতে পারেন না। বালি দিয়া বাসন মাজার সময়ে যে শব্দ হয় তাহাও অনেকের স্নায়ুমণ্ডলীকে পীড়া দেয়। উদ্ভিদ জাতির মধ্যে জগদীশচন্দ্র স্নায়বিক শক্তির এই বৈচিত্র্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কতকগুলি গাছ খুব উত্তেজনার মধ্যেও তাহাদের স্নায়ুকে সবল রাখিতে পারে; আবার কতকগুলি দুর্বল মানুষের ন্যায় অল্প উত্তেজনাতেই অধীর হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই ঐক্য সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ বৃক্ষকে স্নায়ুবর্জিত মনে করিয়া যে সত্যই ভুল করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পণ্ডিতমণ্ডলী তাহা স্বীকার করিতেছেন।

গাছের ডাল পোড়াইলে এবং তাহার গায়ে ক্লোরোফর্মের বাষ্প লাগাইলেও শাখা দিয়া যে উত্তেজনার চলাচল লক্ষ্য করা হইয়াছিল তাহা স্নায়বিক উত্তেজনারই ফল। উদ্ভিদের স্নায়ুজাল দেহের গভীর প্রদেশে বিস্তৃত থাকে, তাই বাহিরে প্রযুক্ত তাপাদি সহসা ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

স্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে একটু সময় লয়। মানবদেহের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রতি সেকেণ্ডে একশত দশ ফুট করিয়া চলে। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ু এমন অপূর্ণ যে কোন উত্তেজনাকে তাহা সেকেণ্ডে দুই ইঞ্চির অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে না। উদ্ভিদের স্নায়ু থাকিলে তাহার উত্তেজনা-পরিবহণের নির্দিষ্ট বেগ থাকারও সম্ভাবনা। জগদীশচন্দ্র নানা জাতীয় উদ্ভিদের স্নায়বিক বেগও আবিষ্কার করিয়াছেন। সতেজ লজ্জাবতী লতার স্নায়ু সেকেণ্ডে চৌদ্দ ইঞ্চি বেগে উত্তেজনা বহন করিতে পারে। গাছ যখন পরিশ্রান্ত হইয়া দুর্বল থাকে তখন এই বেগের পরিমাণ কমিয়া আসে, বিশ্রাম লাভ করিলে সেই বেগই বৃদ্ধি পায়। অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর তুলনায় লজ্জাবতীর স্নায়ু অধিকতর সবল ও কার্যক্ষম।

আমাদের ঘরকন্নার দিক দিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত আবিষ্কার হইতে অনেক উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী কি প্রকারে বিকল হইয়া পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি করে, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই। কাজেই এই সকল ব্যাধির চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প। তার উপরে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী এত জটিল যে, সেই জটিলতা ভেদ করিয়া স্নায়বিক বিকৃতির কারণ নির্ণয় করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উদ্ভিদের স্নায়ুজাল একেবারে জটিলতা বর্জিত। সুতরাং উদ্ভিদের স্নায়ু কি

প্রকারে বিকল হয় এবং সেই বিকলতাকে কি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দূর করা যায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। মানবদেহের স্নায়বিক পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী গাছের চিকিৎসার দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া খুবই আশা হইতেছে।

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড একটি অদ্ভুত যন্ত্র। ভ্রূণ অবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার কার্যের বিরাম নাই। ইহাকে চালাইবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইহা তালে তালে আপনিই চলিয়া প্রাণীর সর্বাঙ্গে নিয়ত রক্তের প্রবাহ বহাইতে থাকে। শারীর বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও হৃদযন্ত্রের অনেক ব্যাপার আজও রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল রহস্যের মীমাংসা করিতে গেলে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের জটিল যন্ত্রকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে চলে না; সরল যন্ত্রের কাজ বুঝিয়া ক্রমে জটিলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই শুভফল পাওয়া যায়।

প্রাণীর হৃদপিণ্ডের ন্যায় কোনো যন্ত্র যে উদ্ভিদদেহে আছে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা তাহা জানিতেন না। আচার্য জগদীশচন্দ্র "বনচাঁড়াল" গাছে হৃদপিণ্ডের অনুরূপ একটি অংশ আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাহা যে হৃদযন্ত্রের মতই তালে তালে চলে তাহা দেখাইয়াছেন। বনচাঁড়ালের পাতার উঠা-নামার কথা উদ্ভিদবিদগণ জানিতেন। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে কেন এই গাছের পাতা আপনাআপনি নড়াচড়া করে তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। জগদীশচন্দ্র ইহাকে তাঁহার স্বহস্তনির্মিত যন্ত্রে ফেলিয়া এবং তাহার হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া নিজের বৃত্তান্ত নিজেকে দিয়াই লিখাইয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বনচাঁড়ালের পাতার নৃত্য এবং প্রাণীব হৃদপিণ্ডের স্পন্দন একই ব্যাপার।

হৃদযন্ত্রের উপর ঈথর নামক রাসায়নিক দ্রব্যটির অনেক কাজ দেখা যায়। অল্প ঈথরে যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়; অধিক প্রয়োগ করিলে অবসাদ আসে এবং শেষে ক্রিয়া লোপ পাইয়া যায়। সুস্থ বনচাঁড়ালকে কাচের আবরণের মধ্যে রাখিয়া জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প ঈথর বাষ্প পাত্রে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র উহার পাতা জোরে জোরে উঠানামা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে সে রকম জোরে পাতা নাড়িতে থারে নাই। অধিক ঈথর প্রয়োগে যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, গাছটির পাতার নৃত্য সেই রকমে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

প্রাণীর হৃদযন্ত্রে ক্লোরোফরমের যে সকল কাজ দেখা যায়—বনচাঁড়ালে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই সকল দেখিতে পাইয়াছেন। বেশী ক্লোরোফর্ম দিবামাত্র পাতার স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; তারপরে আধঘণ্টাকাল নানা প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করায়, তাহাতে মৃদু স্পন্দন সুরু হইয়াছিল।

প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদযন্ত্র আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসায় যে জীববিজ্ঞানের খুব গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে একথা আমরা মনে করি না। উদ্ভিদের দেহে হৃদযন্ত্রের ন্যায় কোন অংশে স্বতঃ স্পন্দন ধরা পড়ায় প্রাণীর স্বতঃস্পন্দনের যে ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড কেন আপনা হইতে স্পন্দিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে প্রাণীবিদগণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যায়। খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে তাঁহারা বলেন দেহের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যন্ত্র স্বতঃস্পন্দন দেখায়। সেই সঞ্চিত শক্তিই "জীবনী শক্তি"। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যানকে কখনই সৎ ব্যাখ্যান বলা যায় না। জগদীশচন্দ্র ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলেন, বাহিরের শক্তি দিয়া যে স্পন্দনকে রুদ্ধ করা যায় এবং চালানো যায়, তাহার মূলে ভিতরকার শক্তির কাজ হইতে পারে না। তাঁহার মতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন বাহিরের শক্তিরই কার্য। বাহিরে শক্তির অভাব নাই,—জল বাতাস আলোক বিদ্যুৎ সকলি শক্তিময়। ঈথর এবং ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি দ্রব্যের শক্তি যেমন বাহির হইতে আসিয়া দেহের উপরে কার্য দেখায়, সেই প্রকার জলবায়ু ও তাপালোক প্রভৃতির শক্তিও নিয়ত দেহের উপরে পড়িয়া স্বতঃস্পন্দন সুরু করে। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তটি মোটামুটি এই যে, জীবন ধারণের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন উদ্ভিদগণ তাহার চেয়ে অনেক অধিক শক্তি বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখিতে চায় কিন্তু এই প্রকার শক্তিকে সংযত করিয়া রাখার ব্যবস্থা তাহাদের দেহে নাই। কাজেই অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভিদের পাতার উঠানামা প্রভৃতি স্বতঃস্পন্দনে দেখাইয়া ব্যয় করে।

উদ্ভিদ কি প্রকারে বৃদ্ধি পায়, ইহাও বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। পুঁথিপত্রে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে মনের খটকা মিটে না। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধিরও ব্যাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের নিজের পরিকল্পিত "ক্রেস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্রটি অতি আশ্চর্যজনক। ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধন

করিয়াছেন। কোনো গাছ প্রতিদিন কতখানি করিয়া বাড়িল, তাহা সপ্তাহ বা মাসের গড় হিসাব করিয়া আমরা বলিতে পারি। বলা বাহুল্য এই প্রকার হিসাব কখনই সূক্ষ্ম হয় না, একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। পূর্বোক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতখানি করিয়া বাড়িতেছে তাহা হাজার লোককে একসঙ্গে দেখানো চলে। সেটি কি প্রকার আশ্চর্যজনক একবার ভাবিয়া দেখুন। কোন্ সার কোন গাছের বৃদ্ধির অনুকূল স্থির করিতে হইলে কৃষিতত্ত্ববিদকে মাসের পর মাস পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বসু মহাশয়ের এই যন্ত্রটির সাহায্যে তাহা কয়েক সেকেণ্ডে স্থির হইয়া যায়।

বৃদ্ধি রোধ হইলে জীবদেহে ক্ষয়ের সুরু হয় এবং ক্ষয়ের পরিমাণ অধিক হইলে মৃত্যু দেখা দেয়। ইহাই মৃত্যুর নিয়ম। প্রাণীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। মৃত্যুর পূর্বে তাহার সর্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায় এবং তারপরে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র নিশ্চল হইয়া আসে। ইহাই প্রাণীর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু উদ্ভিদকে এমন ধীরে ধীরে আসিয়া আক্রমণ করে যে ঠিক কোন্ সময়ে তাহার মৃত্যু হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। পাতা বা ডালের অবস্থা দেখিয়া মৃত্যু ধরা যায় না। মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পর্যন্ত শাখা পল্লবকে তাজা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের মৃত্যু লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাতে প্রাণীর মৃত্যু জ্ঞাপক প্রত্যেক লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। প্রথমে লজ্জাবতী লতাকে লইয়াই পরীক্ষা চলিয়াছিল। লজ্জাবতীর পাতা যন্ত্রের লেখনীর সহিত সূক্ষ্ম সূতা দিয়া বাঁধা ছিল। পাতা হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া নামিয়া লেখনীর সাহায্যে নিজের অবস্থার কথা নিজেই ঢেউ খেলানো রেখা টানিয়া ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ধারে লজ্জাবতীর গায়ে তাপ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঠাণ্ডায় গাছে ভাল সাড়া পাওয়া যায় না; কাজেই যখন একটু একটু করিয়া তাপ বাড়ানো হইয়াছিল, তখন লজ্জাবতী বেশ জোরে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনো সে আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারে নাই। তাপের পরিমাণ ত্রিশ ডিগ্রী হইতে ক্রমে চল্লিশ এবং তারপরে পঞ্চাশ ও পঞ্চান্ন হইয়া দাঁড়াইলে যন্ত্রের লিপিফলকে সাড়ার পরিমাণ কমিয়া আসিতে লাগিল। বোধ হয় এই সময়েই লজ্জাবতী বুঝিয়াছিল, অবস্থা ভাল নয়। তারপরে উষ্ণতার পরিমাণ সেন্টিগ্রেডের ষাট ডিগ্রী হইবামাত্র সেই তাপক্লিষ্ট লজ্জাবতী হঠাৎ একটা প্রবল সাড়া দিয়া নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পরীক্ষা দেখিলে মৃতপ্রায় লজ্জাবতীর শেষ প্রবল সাড়াটিকে মৃত্যুর আক্ষেপ (Spasm) ব্যতীত আর কোন কিছুই বলা যায় কি ? একবার নয়, বারবার পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক ষাট ডিগ্রী উষ্ণতায় সুস্থ উদ্ভিদ মাত্রকেই মরিতে দেখিয়াছেন। তাজা পাতা পোড়াইতে গেলে তাহা আকুঞ্চিত হইয়া নিজেই নড়াচড়া করে। কেবল তাপই আকুঞ্চনের একমাত্র কারণ নয়, পাতার মৃত্যু যন্ত্রণার আক্ষেপও ইহার অন্যতম কারণ। উদ্ভিদের এই প্রকার করুণা উদ্দীপক মৃত্যুর বিষয় যে শীঘ্র আবিষ্কৃত হইবে, কোনও বৈজ্ঞানিক কিছুদিন পূর্বেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

একই বোঁটায় অনেক সময়ে বিচিত্র রকমের ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল ফুলের বর্ণ দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়। পাতাবাহার গাছে দিনে দিনে কত বিচিত্র রঙের ছিটে ফোটা প্রকাশ পায়। আচার্য বসু মহাশয় এগুলির উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলেন, তাহাও বিস্ময়কর। তাঁহার মতে পুষ্পপত্রের ঐ বর্ণ-বৈচিত্র্য তাহাদের মৃত্যু-লক্ষণ। পাতা ও ফুলের দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান যখন প্রাণহীন হয়, তখনই সেই সকল স্থানে বিচিত্রবর্ণ প্রকাশ পায়। উদ্ভিদের যে সৌন্দর্যকে আমরা এত আদর করি, তাহা মৃত্যুর বিবর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সহ্য গুণ সকলের সমান নয়। যুবক ও সবল ব্যক্তি যে পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আরোগ্য লাভ করে তাহাতেই বালক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। প্রাণীর এই ধর্মটিও জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সদ্য অঙ্কুরিত গাছে তাপ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর জন্য তাপের পরিমাণ ষাট ডিগ্রী পর্যন্ত বাড়াইতে হয় নাই। অল্প তাপেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—এ যেন দুর্বল শিশুর মৃত্যু। সবল ও সুস্থ গাছকে তিনি বিদ্যুতের প্রবাহ দ্বারা প্রথমে দুর্বল করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহাতে তাপ দিয়াছিলেন। দুর্বল গাছ সাঁইত্রিশ ডিগ্রী উষ্ণতায় মরিয়া গিয়াছিল। তারপরে তুঁতের জল দিয়া একটি গাছকে অসুস্থ করাইয়া তাহাতে তাপ দেওয়া হইয়াছিল ; বিয়াল্লিশ ডিগ্রীতেই সে মৃত্যু লক্ষণ দেখাইয়াছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার কথা আলোচনা করিলে, জগদীশচন্দ্রের চিন্তার ধারা কোন্ পথে চলিয়া গবেষণাকে সার্থক করিয়াছে, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। জগৎ যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহা অণু পরমাণু যে একই মহাপ্রাণে প্রাণবান হইয়া আছে, তাহা

জগদীশচন্দ্র এই ভারতের অতি প্রাচীন ঋষিবাক্য হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই তিনি সজীব-নির্জীব ও প্রাণী উদ্ভিদের বাহ্য অনৈক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া অন্তরের কথা জানিবার জন্য সকলেরই কাছে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। কেহ কোন কথা গোপন করে নাই; সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিল—"আমরা সবাই এক"। এখনকার বৈজ্ঞানিক জাতিভেদের দিনে সত্যের সন্ধানে জড় প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্বারস্থ হইয়া জগদীশচন্দ্র যে সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত পুরস্কারই তিনি লাভ করিয়াছেন।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে মৌনজীবন প্রসারিত, তাহার অব্যক্ত ক্রন্দন আচার্য জগদীশচন্দ্র জগৎসম্মুখে সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন। [‘অব্যক্ত’ আচার্য শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু, এফ্‌ আর, এস প্রণীত।]

বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক। তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধকের সাধনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে পুরা হইতেছে। বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর তোলা হইতেছে। দৃশ্য জগৎ বিচিত্র এবং বহুরূপী। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর চির মৌনী অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে তো কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ভারতবর্ষে উঠিলেন এক সাধক, যিনি তাঁহার চিন্তাকে কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়া আবার পর মুহূর্তে তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়া প্রকৃতির এই বৈষম্যের মধ্যে একতার সন্ধানে ছুটিলেন, এবং জড় উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে এক সেতু বাঁধিয়া দিলেন। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বে যে মহান্‌ সুমধুর ছন্দের সন্ধান আছে, ভারতের কবি জগদীশচন্দ্র সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তবে কবি হইয়াও তিনি বৈজ্ঞানিক। তাই কবি যেখানে শুধু ‘যেন’ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, সেখানে কবি ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিলেন “এস, দেখ, এই সেই।” ভারতীয় সাধক নানা পথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাকে এক কেন্দ্রে মিলিত করিয়া বিজ্ঞানের এই চতুর্বেণী সঙ্গমরূপ মহাতীর্থ স্থাপিত করিলেন।

জার্মান অধ্যাপক হার্টস্‌ সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঢেউ উৎপাদন করেন। আকাশের স্পন্দনেই যখন আলোর উৎপত্তি তখন হার্টস্‌-উৎপাদিত সেই অদৃশ্য আলোক ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই হওয়া উচিত। কিন্তু হার্ট্‌সের ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সেই ঢেউ ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন হইল। আচার্য জগদীশ

চন্দ্র এক কল নির্মাণ করিলেন, যাহা হইতে অদৃশ্য আকাশোর্মির দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকের কাছাকাছি গিয়া পৌছিল। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়; একদিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলোক বাহির হয় এবং অপর দিকে সেই অদৃশ্য আলোক দেখিবার জন্য একটি কৃত্রিম চক্ষু। এই যন্ত্র দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই, যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতাহেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি। অদৃশ্য আলোক ইট্‌পাটকেল, ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৪ সালের শেষ ভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপে বিনা তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বাঙ্গলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম মেকেঞ্জি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্মি তাহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ স্তূপ উড়াইয়া দিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে মার্কনী তারহীন সংবাদ করিবার পেটেণ্ট গ্রহণ করিলেন। পূর্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের তার দিয়া সংবাদ প্রেরিত হইত। আজ মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ তরঙ্গের সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে।

"দৃশ্যের পরিমাণ কতই ক্ষুদ্র, কিন্তু অদৃশ্য যে সীমাহীন, তবে ত আমরা সেই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা। কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দীপশলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নাই। আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস। যে বিশ্বাস বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান সাম্রাজ্য এরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ। মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়ের বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং বিশ্বজগৎ একদিন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য দেখিলেন যে, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হয়। কিন্তু উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়।

দেখিলেন দিবারম্ভেই পরীক্ষণ শ্রেয়ঃ—কারণ সেদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। তখন এ প্রশ্ন তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না যে, কলের এ ক্লান্তি কেন হয়! অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল; সে সব ছাড়িয়া দিয়া ঐ নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য, জড়েও তাহার ক্রিয়া পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন।

জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের হস্তে এই সব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য আচার্য ফিরিয়া আসিবেন মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সর্ব্ব প্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন সেণ্ডারসন বলিলেন, জীবন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিষ্ফল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চা হইয়াছে; আপনি পদার্থ বিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন; আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন। আচার্য উত্তর করিলেন "নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার; আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম; আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল, তাহাই সত্য; ইচ্ছাতেই হউক, অনিচ্ছাতেই হউক তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" তৎপরে বহু বৎসর ব্যাপি সাধনার দ্বারা নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রে বহুবিধ পরীক্ষায় বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিলেন। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিলেন। এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রার মুহূর্তের পরিবর্তন নিরূপণ করিলেন। মনুষ্য স্পর্শেও বৃক্ষ যে সঙ্কুচিত হয়, তাহা দেখাইলেন। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও সেই সমুদয়ের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণ করিলেন। উদ্ভিদ্ পেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে মানব হৃদয়ের স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইলেন। বৃক্ষ শরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিলেন। প্রমাণ করিলেন, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদ স্নায়ুর আবেগ, উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত এই সকল সাক্ষ্যে বিশ বৎসর পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত

হইয়াছিল, আজ তাহা সর্বত্র আদরে গৃহীত হইয়াছে; বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাহারাই পরম মিত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতীয় সাধক পৃথিবীর নিকট হইতে জয়মাল্য আহরণ করিলেন। আমরা অনেকেই কেবলমাত্র পূর্বপুরুষগণের গৌরব ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট থাকি।

"সত্য বটে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অমর তত্ত্বসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন এবং দুই চারিজন বিদেশীও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হে বেদ উপনিষদ রচয়িতার বংশধর, আজ তোমার স্থান কোথায়? হায় আলনস্কর! তোমার দিবাস্বপ্ন কি কোনও দিন ভাঙ্গিবে না? তোমার পণ্যদ্রব্য শুধু গিলটি ও কাচ। স্বর্ণ ও হীরক বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে করিয়াছিলে এবং অলীক ধনে আপনাকে ধনী মনে করিয়া ভাগ্য লক্ষ্মীকে পদাঘাত করিলে! দর্শকগণের উপহাস এত অল্পদিনেই ভুলিয়াছ? তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনী ছিলেন। তাহারা পুষ্পকরথে বিমানে বিহার করিতেন! মূঢ়! তবে কি করিয়া সেই সম্পদ হারাইলে? চাহিয়া দেখ দূরে যে ধবল পর্বত দেখিতেছ, নর কঙ্কালে নির্মিত। তুমি যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিস্তূপ, দেখ কাহারা সেই অস্থি নির্মিত সোপান বাহিয়া গিরিশৃঙ্গে উঠিয়াছে এবং শূন্যে ঝাঁপ দিয়া নীলাকাশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। উড্ডীয়মান শ্যেন পক্ষীশ্রেণী বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হইল। অবাক হইয়া তুমি ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছ। অকস্মাৎ মেঘরাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত বহ্নিশেল তোমার চতুর্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও নিস্তার নাই। বিষবাহক বাষ্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহির হইতে হইবে।"

আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষ নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছে, বহু বৎসর পূর্বে আচার্য তাহার পরীক্ষাগার হইতে সেই সত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে ছিন্ন-শাখ বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কয়েকদিন পরে বাঁচিয়া উঠে। আর বিচ্যুতপত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেন তবে এই বিভিন্নতা?

"ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাঁহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

"বৃক্ষের ভিতরে ও আর একটি শক্তি নিহিত আছে। যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণ জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে।

"আরও একটি শক্তি তাহার চির সম্বল রহিয়াছে। সে যেঁ বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এইজন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তাহার শির উর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখাপ্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? যে ধৈর্য, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, যে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর অন্নে প্রতিপালিত হয়, সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়। সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে। ধ্বংস তাহার পরিণাম।"

স্নায়ুমূলে উত্তেজনা প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য দেখিলেন, যে, বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়।

"কিন্তু বাহিরের শক্তির দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও তাহা সংঘটিত হয়। তবে মানুষ ত কেবল অদৃষ্টের দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে। যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহিরের ভেতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদ্ঘাটিত হয়। কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে।

ভিতরের শক্তি তো স্বেচ্ছা। তবে জীবনের কোন্‌স্তরে সেই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় এই শক্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভেতরে প্রবেশ করিয়া শরীর লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহ, মায়া, মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেম দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দিনে ও বাহিরে আঘাতের ফলে ভেতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই

বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে তোমার নির্দেশে জ্ঞান সন্ধানার্থ জীবনপাত করিয়াছে। মানবের কল্যাণহেতু রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখদারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্য মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্যে ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে।”

বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রকাশে বঙ্গভাষা কতই না দীন। কিন্তু মনীষীর কাছে তাহার এ দৈন্য কোনরূপ অন্তরায় হইল না এবং অব্যক্তে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক মহান মিলন সংঘটিত হইল।